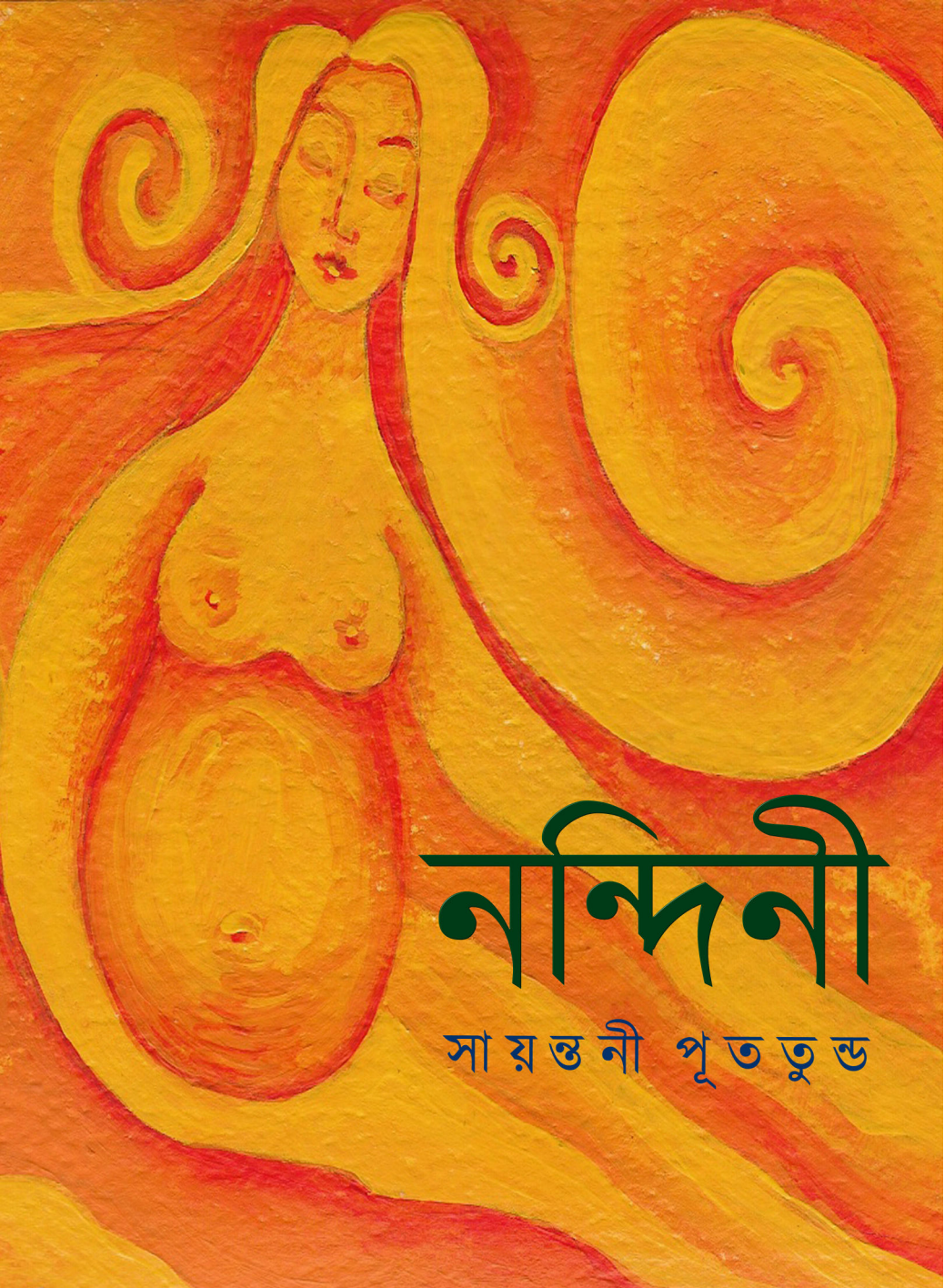

নন্দিনী

সায়ন্তনী পূততুন্ড

KUNAL 13.

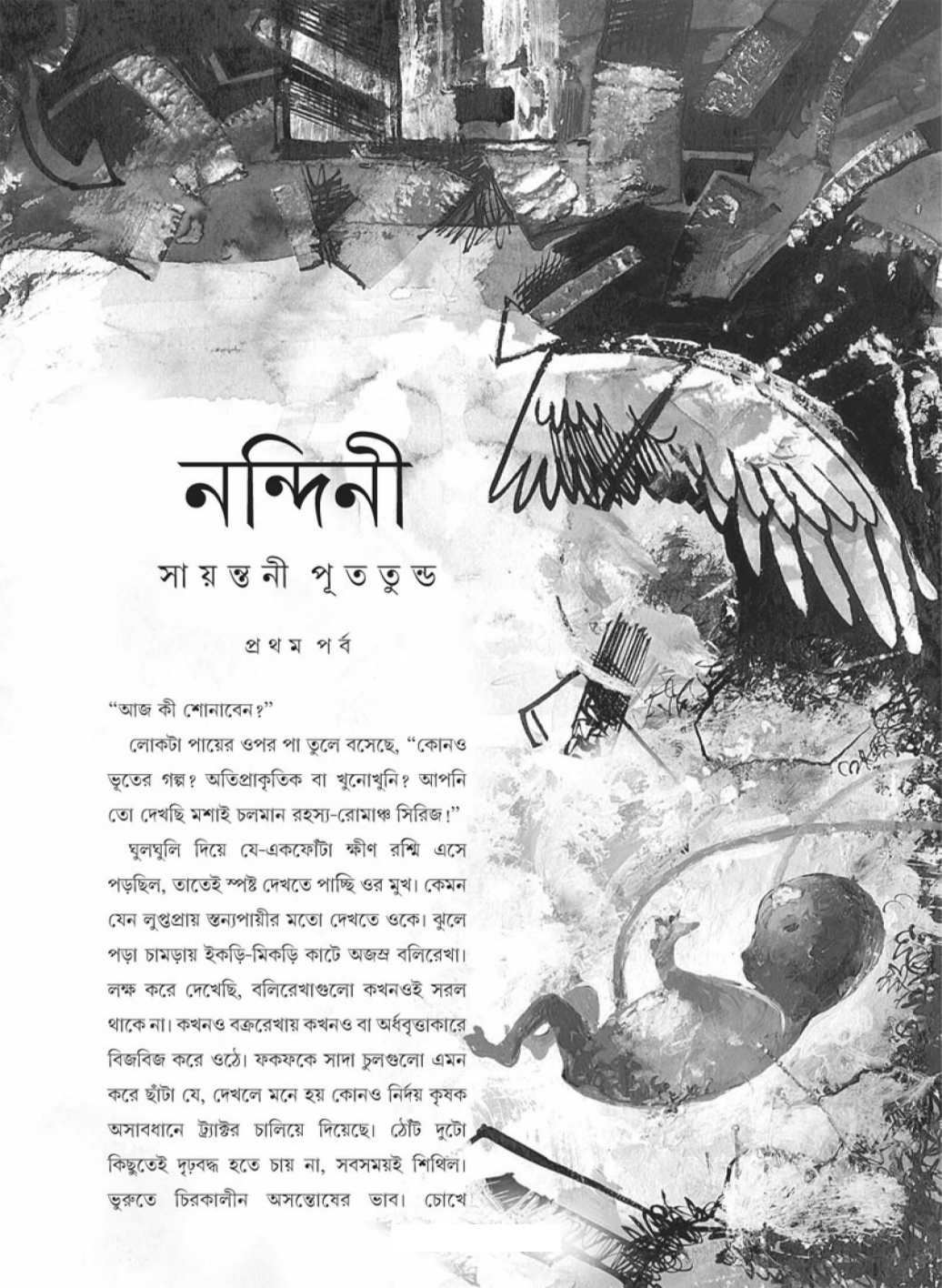

নন্দিনী

সায়ন্তনী পূততুন্ড

প্রথম পর্ব

"আজ কী শোনাবেন?"

লোকটা পায়ের ওপর পা তুলে বসেছে, "কোনও ভূতের গল্প? অতিপ্রাকৃতিক বা খুনোখুনি? আপনি তো দেখছি মশাই চলমান রহস্য-রোমাঞ্চ সিরিজ!"

ঘুলঘুলি দিয়ে যে-একফোঁটা ক্ষীণ রশ্মি এসে পড়ছিল, তাতেই স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি ওর মুখ। কেমন যেন লুপ্তপ্রায় স্তন্যপায়ীর মতো দেখতে ওকে। ঝুলে পড়া চামড়ায় ইকড়ি-মিকড়ি কাটে অজস্র বলিরেখা। লক্ষ করে দেখেছি, বলিরেখাগুলো কখনওই সরল থাকে না। কখনও বক্ররেখায় কখনও বা অর্ধবৃত্তাকারে বিজবিজ করে ওঠে। ফকফকে সাদা চুলগুলো এমন করে ছাঁটা যে, দেখলে মনে হয় কোনও নির্দয় কৃষক অসাবধানে ট্র্যাক্টর চালিয়ে দিয়েছে। ঠোঁট দুটো কিছুতেই দৃঢ়বদ্ধ হতে চায় না, সবসময়ই শিথিল। ভুরুতে চিরকালীন অসন্তোষের ভাব। চোখে

দুটো ভাবই ফোটে। বিতৃষ্ণা আর ভয়!

মাঝে মাঝে আমার মনে হয় এ ধরনের মানুষেরাই মূলত গ্লোবাল ওয়ার্মিংয়ের জন্য দায়ী। এদের বাইরেটা ঠান্ডা, শান্ত হলেও বুকের ভেতরে জাগ্রত ভিসুভিয়স। রাগ, ক্ষোভের উষ্ণ প্রস্রবণকে দাবিয়ে রেখে চতুর্দিকের উষ্ণতা বাড়িয়ে দিয়েছে। সে উষ্ণতার আঁচ কয়েক হাত দূরে বসে আমিও টের পাচ্ছি।

"আজ কোনও ভূতের গল্প নয়। নয় কোনও অতিপ্রাকৃতিক কাহিনি। কোনও গায়ে কাঁটা দেওয়া রহস্য-রোমাঞ্চের গল্প বলতে আমি আসিনি। শুধু বলব নন্দিনীর কথা। নন্দিনী কে, সেটা আপাতত উহ্যই থাক। এইটুকু বলতে পারি—সে এক নারী।"

"এ আবার কী কথা!" লোকটা রীতিমতো খ্যাঁকখ্যাঁক করে হাসল। "ভারী আশ্চর্যের কথা বললেন তো! নন্দিনী একজন নারী! আমি তো ভাবছিলাম ওই নামের কোনও পুরুষের গল্প বলবেন। নামের ব্যাপার তো বলা যায় না! হয়তো ছেলেটির মা আদর করে তার নাম রেখেছে নন্দিনীকুমার বসু। আর সেখান থেকে হয়ে গেল নন্দিনী বসু।"

লোকটার ফিচেল হাসিটা আমার ধৈর্যে চিড় ধরায়। ওকে বেশিক্ষণ সহ্য করাই এক ধরনের নরকযন্ত্রণা! মাঝে মধ্যেই ইচ্ছে করে 'ধুত্তোর' বলে কেটে পড়ি। কিন্তু উপায় নেই। সহ্য করতেই হবে।

বিরক্ত হয়ে চুপ করে থাকি। লোকটা এবার আমায় ব্যঙ্গ করবে। জানা কথা। প্রতি রোববারই করে। আমার রাগ হয় না। কী করবে বেচারা? ওইটুকুই তো ক্ষমতা! অনেক দিন আগে চটি দিয়ে একটা আরশোলা মেরেছিলাম। তারপর থেকে সে আমার জুতোর সুকতলায় বহুদিন ফসিল হয়ে ছিল। যখনই চটিটা উল্টে যেত, তখনই দেখতাম মৃত আরশোলাটা ব্যঙ্গ করছে—"ছ্যা...ছ্যা...লেখক! এত দিন ধরে একটাই হাওয়াই চটি ঘষটে চলেছ দেখছি! সুকতলাটা তো গেছে। আমি কোনওমতে টিকে আছি— যেমন টিকে ছিলাম ডাইনোসোরের আমল থেকে। নেহাত একটা নিরীহ হাওয়াই চটির বাড়ি না খেলে হয়তো আরও একটু টিকতাম। তাতে অবিশ্যি ক্ষতি হয়নি। তোমার জুতোর সুকতলার থেকে আমি এখনও টেকসই! মানো, কি না মানো...!"

প্রকাশকদের কৃপায় বর্তমানে একজোড়া বুটজুতোর মালিক হয়েছি। তক্কে তক্কে ছিলাম, আরও একটা আরশোলাকে বুটের তলায় 'বুটসই' করব। দেখব, সে বুটের চেয়েও টেকসই কি না! সুযোগও পেয়েছিলাম। কিন্তু যেই আরশোলাটাকে মারার জন্য বুটটা নির্মমভাবে তুলে ধরেছি, তখনই হঠাৎ আরশোলাটা অবিকল এই লোকটার মতো দৃষ্টিতে তাকাল আমার দিকে।

হতভাগা বেঁচে গেল!

"সরি, মাইন্ড করবেন না।" লোকটা হাসতে হাসতেই বলে, "বুঝতেই পারছি— বেশ একটা সিরিয়াস সাস-বহু গোছের গপ্পো হতে চলেছে। এক নারীর নির্যাতিতা হওয়ার গল্প! মিনমিনে শ্বশুর, চরিত্রহীন বা মেরুদণ্ডহীন বর, সতী-সাধ্বী বউ, এবং জাঁদরেল অত্যাচারী শাশুড়ির কাহিনি। সঙ্গে কুচুটে জা বা ননদ ভ্যাম্প!"

"ধরেছেন ঠিকই।"

"তাই যদি হয়, তবে আপনার গল্প শুনব কেন? ডেলি সোপ কী দোষ করেছে? গল্প শুনব না। রোজ নিয়ম করে ডেলি সোপ দেখব," লোকটা আড়মোড়া ভেঙে বলল, "সেটা আরও বেশি রোমহর্ষক। শুনেছি সেখানে নায়িকা রোজ কয়েক কিউসেক করে কাঁদে। ঠাকুমা-ঠাকুরদারা কিছুতেই মরে না। লোকে মরে শ্মশানে যায় না, বরং ফিরে আসে। হয় এক জন্মেই ফিরে আসে, নয়তো পুনর্জন্মে। এত কিছু এন্টারটেনমেন্ট ছেড়ে আমাকে আপনার গপ্পোই শুনতে হবে কেন?"

এই প্রশ্নটা প্রত্যেক রবিবারই করে লোকটা। ওর স্মৃতিশক্তি বড়ই দুর্বল! রোজই এর উত্তরটা দিই। তবু মনে রাখতে পারে না। বাধ্য হয়েই বললাম, "দেখতেই পারেন। কিন্তু তাতে একটা টেকনিক্যাল প্রবলেম আছে।"

"কী?"

"মাসখানেক আগে আপনার ঘরে একটি মাত্রই টিভি ছিল। আপনি সেটা নিজেই রেগে গিয়ে ভেঙে ফেলেছেন।"

"ভেঙে ফেলেছি!" লোকটার চোখে এবার ব্যথা আর বিস্ময় ভেসে উঠেছে— "কিন্তু কেন?"

"কারণ অজানা।"

সে এবার কিছুক্ষণ ভুরু কুঁচকে কী যেন ভাবে। তারপর অদ্ভুত জেদের সঙ্গে বলে, "তবু আমি আপনার বস্তাপচা গল্প শুনব কেন? এ সমস্তই তো আমার জানা। নন্দিনী বলে একটা মেয়ে ছিল। তার শ্বশুরবাড়িতে একটা মিনমিনে বর ছিল। জাঁদরেল শাশুড়ি ছিল। এ গল্প তো আমিও বলতে পারি।"

"নাঃ, এই গল্পটা পারবেন না।" আমি হাসলাম— "কারণ ডেলি সোপে কিংবা আপনার গল্পে শ্মশান থাকবে না। আপনার গল্পে নন্দিনী নামের অত্যাচারিতা একটি মেয়ে থাকবে। কিন্তু আমার গল্পে নন্দিনী নামের মেয়েটা সশরীরে থাকবে না।"

"মানে? তার মানে নন্দিনী অশরীরী? মানে ভূত!"

এবার হাসার পালা আমার। তবু হাসি চেপে বলি—

"না। নন্দিনী মানে প্রতিবাদ।"

"বুঝেছি"। লোকটা স্মিত হাসল, "রাইট উঠে গেছে— তাই কবিগুরুকেও ছাড়বেন না। 'রক্তকরবী' ঝাড়বেন তো? বলুন, শুনি।"

আমিও হাসলাম। "আপনি ভুল করছেন। রক্তকরবীতে শ্মশান বা গোরস্থান ছিল না..."

এক

রোজ কিছুক্ষণের জন্য শ্মশানে এসে বসে থাকাটা প্রদীপের অভ্যাস। অনেকেই বলেন, শ্মশানে নাকি একরকমের শান্তি পাওয়া যায়। শান্তি কি অশান্তি তা ও জানে না। কিন্তু বাস্তব জগৎটা খুব ভাল বোঝা যায়! কবিরা বলেন, এ পৃথিবীতে শোকের আয়ু নাকি মাত্র তিনদিন। প্রদীপ জানে কবি মানুষেরা আবেগপ্রবণ হন। তাই সত্যিটা জেনেও সময়সীমা একটু বাড়িয়ে দিয়েছেন। এমনিতেই খাঁটি শোকের সংখ্যা খুব কম। গরিব মানুষের ঘরে কর্তা মারা গেলে শোক, না, লোকটার জন্য নয়, সংসারের একমাত্র কামানেওয়ালা লোকটা চলে গেল বলে। গিন্নি মারা গেলে— সংসারের একমাত্র বিনা পয়সার ঝিটা কেটে পড়ল বলে দুঃখ। বয়স্ক মানুষ গেলে তো আপদ গেছে!

সিগারেটে একটা টান মেরে আপনমনেই হাসল প্রদীপ। এই মুহূর্তে গোটা পনেরো গতাসু মানুষ তিন নম্বর চুল্লির সামনে লাইন দিয়ে আছেন। তার মধ্যে কেউ ঝকঝকে চকচকে পালিশবাবু। কেউ বা হাড় জিরজিরে শুকনো, খসে পড়া পাতার মতো। কারও গা থেকে স্কচের গন্ধ শত এসেন্সেও মুছে দেওয়া যায়নি। কারওর গায়ে তখনও ম" ম" করছে নস্যির গন্ধ, কেউ বা আবার দেশি! কেউ শেষ শয্যায় ধুতি, কেউ লুঙ্গি। বিভিন্ন স্তর থেকে যেন পরিব্রাজকের মতো এসে পৌঁছেছে এখানে। তারপর? তারপর হ্যারি পটারের ফিল্মের মতো চুল্লিতে আগুন জ্বলে উঠলেই হুশ করে এক মুহূর্তে অন্য একটা অপরিচিত জায়গায় পৌঁছে যাওয়া। যে যত বড় মাতব্বরই হও— আসলে গন্তব্য এই একটাই। যাকে বলে ফিনিশিং লাইন। আর এই ফিনিশিং লাইনে পৌঁছবার জন্য সারাজীবন ধরে কত মারপিট, কত জোচ্চুরি, কত গাঁটকাটা! প্রতি বছর জন্মদিনের পার্টিতে স্কচ, ওয়াইনের ফোয়ারা! অগ্নিদেবের অবশ্য কিছুতেই অরুচি বা পক্ষপাত নেই। তিনি হাই সোসাইটির স্কচ থেকে শুরু করে বস্তির 'বাংলু', 'চুল্লু' খেয়েও হজম করতে পারেন। যম আর আগুনের কাছে সব এক।

কিন্তু মজার কথা হল, অন্তিম শয্যায় শুয়েও লোকগুলোর শান্তি নেই! প্রদীপ দেখতে পাচ্ছিল এক বিশালবপু বয়স্ক মানুষের দেহের পাশে একটি পেটমোটা ছেলে বারমুডা পরে পায়চারি করছে আর সেলফোনে চ্যাটর চ্যাটর করে চলেছে। বাবাকে পোড়াতে এসে শেয়ার মার্কেটের খবরাখবর নিয়ে চলেছে। আর উল্টো দিকের শীর্ণ অথচ সৌম্য ব্যক্তিটির আপনজনেরা বিরক্তমুখে বসে আছে। একটু আগেই তাদের হিষ্টি জেনেছে প্রদীপ। ভদ্রলোক গত পরশু মারা গেছেন। মেয়ে

দূরে থাকে বলে এক দিন পিস হাভেনে রাখতে হয়েছে মরদেহ। মেয়ে-জামাই কাল রাতে এসে পৌঁছেছে। আর আজ সকাল থেকেই শ্মশানে লম্বা লাইন! যেন দুনিয়ার সব মানুষ ঠিক করেছে— গতকাল রাতেই যে করেই হোক মরতে হবে!

জামাইয়ের বিরক্তিমাখা কথা শুনে মনে মনে হাসছিল প্রদীপ। বেচারি শ্বশুর। মরেও নন্দ ঘোষের কপাল নিয়ে গেল লোকটা। সকালে হয়তো বাবার মরামুখের দিকে তাকিয়ে খুব কেঁদেছিল মেয়েটা। এখনও চোখ লাল, নাকের পাটা লাল। কিন্তু তার সঙ্গে ভুরুতে বিরক্তির কুঞ্চন। স্বাভাবিক। কাল থেকে তার পেটে কিছু পড়েনি। জেট ল্যাগ কাটিয়ে ওঠার সময়ও পায়নি। তার মধ্যেই বাবার মৃতদেহ আনতে পিস হাভেনে দৌড়েছে। সমস্ত ফর্ম্যালিটি পূরণ করেছে। আর তারপর বডি ফুল দিয়ে সাজাও রে, আত্মীয়দের সান্ত্বনা দাও রে, মাকে সামলাও রে, নিজের মুখে কুটোটি কাটার উপায় নেই, অথচ শোকার্ত আত্মীয়-স্বজনদের জন্য চা-বিস্কুটের ব্যবস্থা করো রে। তারপর এই ভয়াবহ লাইন! কতক্ষণে অন্ত্যেষ্টি হবে কে জানে! ৪৫ মিনিট বা একঘণ্টা কমপক্ষে! তার পরেও কি কম ঝক্কি! জলে নাভি-ছাইভস্ম বিসর্জন দাও রে, স্নান করো রে, গঙ্গাজল ছিটাও রে, এই করো রে, সেই করো রে, শ্মশানযাত্রীদের বন্দোবস্ত... সব করে নিজের হাতে হবিষ্যি করো। তারও কম বাহানা নেই! পেটে দুটো ভাত পড়তে যে কতক্ষণ সময় লাগবে কে জানে! বাবার আনুষ্ঠানিক শ্রাদ্ধ তো পরে করবে, তার আগে এখন থেকেই মনে মনে লোকটার চোদ্দপুরুষের শ্রাদ্ধ করতে শুরু করে দিয়েছে হয়তো! মেয়েটা মুখে বলেনি। কিন্তু প্রদীপ স্পষ্ট শুনতে পেল সে ভাবছে— "যথেষ্ট হয়েছে বুড়ো। যাও তো। এবার চুল্লিতে গিয়ে ঢোকো। খিদের চোটে চোখে অন্ধকার দেখছি, আর তুমি চুল্লিতে ঢোকার নামই করছ না"!

জীবনের প্রয়োজনের তাড়নার কাছে মৃত্যু, শোক শব্দগুলো ভীষণ ফ্যাকাশে লাগে। প্রদীপ আপনমনেই মৃদু হাসে। তারপর লাইনের লোকগুলোর দিকে তাকায়। চাঁদিফাটা রোদের মধ্যে গায়ে ঘামের চ্যাটচেটে রস মেখে দাঁড়িয়ে আছে অমৃতসন্তানেরা! ঠিক এমনই লম্বা লাইন শ্মশানের বাইরে আরও একটা আছে। এই শ্মশানের ঠিক বাইরেই একটা পাঁঠার মাংসের দোকান সগর্বে অধিষ্ঠিত। প্রদীপ অনেকবার দেখেছে, লোকে সেখানে ভিড় জমিয়ে ঠ্যালাঠেলি করছে। আরও দেখেছে, বুড়ো দোকান মালিক জ্যান্ত নধর পাঁঠার চিক্কন দেহে হাত বুলিয়ে আদর করছে। পাঁঠা আদরটা মন দিয়ে উপভোগ করতে করতে মনোযোগ সহকারে কাঁঠাল পাতা খাচ্ছে। সে অনেকবার কল্পনা করেছে যে, ওদের ভেতরে ঠিক কী জাতীয় কথোপকথন হতে পারে। এরকম হতে পারে কি?

"শোনো, পাঁঠা!"

"অ্যাঁ-অ্যাঁ...অ্যাঁ-অ্যাঁ।"

"বেশ নধর হয়েছ দেখছি।"

"হ্যাঁ-হ্যাঁ...হ্যাঁ-হ্যাঁ..."

"কাঁঠাল পাতাগুলো কেমন? বেশ আঠালো, তাই না? খেতে ভাল লাগছে?"

"হ্যাঁ—হ্যাঁ।"

"দেখি তোমার ঠ্যাংটা কতটা পুরুষ্ট হয়েছে...।"

পাঁঠাটা যদি সর্বজ্ঞ হয় তবে সে এতক্ষণে মাতৃভাষা ছেড়ে স্পষ্ট বাংলা ভাষায় কথা বলবে, কিন্তু সে কথা মালিক ছাড়া আর কেউ বুঝতে পারবে না।

"কেন? আস্ত 'আমি'টা কি দোষ করলাম যে, আমার ঠ্যাং ধরে টানাটানি করছেন?"

বৃদ্ধ মালিক হাসবে—"অত 'আমি', 'আমি' কোরো না হে। ওটা মানুষের ভ্রান্তি মাত্র। পাঁঠাদের ওটা থাকতে নেই। তোমার ঠ্যাঙের কত দাম জান?"

"আমার নিজেরই দাম নেই, তো আবার ঠ্যাঙের দাম!"

"আছে...আছে... তোমারও দাম আছে। নগদ ছ'হাজার টাকায় কিনেছি তোমায়। আর ওই যে ভুঁড়িওয়ালা লোকটা সাতসকালেই ঘুম থেকে উঠে ভুঁড়ি দোলাতে দোলাতে এসে হাজির হয়েছে, সে শুধু তোমার ঠ্যাঙটার জন্য। তোমার রাং দিয়ে আজ ওর বাড়িতে বিরিয়ানি রান্না হবে।"

পাঁঠাটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে কাঁঠালপাতায় মন দেয়।

"সে কী! তোমার ভয় করছে না!"

"কীসের ভয়?"

"মৃত্যুভয়!"

পাঁঠাটা মৃদু হাসল— "নাঃ।"

"কেন?"

"স্বামী বিবেকানন্দ বলে এক ভদ্রলোক বলে গিয়েছেন, আমরা সকলেই জন্মক্ষণ থেকেই মা-র জন্য বলিপ্রদত্ত। যখন মায়ের পেটে ছিলাম তখন মা ভুল করে একটা খবরের কাগজ খেয়ে ফেলেছিল। সেই খবরের কাগজেই লেখা ছিল কথাটা। অতএব যখন হাঁড়িকাঠে যেতেই হবে, তখন আর চিন্তা করে লাভ কী? বরং যতক্ষণ সময় পাওয়া যায়, ততক্ষণ মনের সুখে কাঁঠালপাতা খেয়ে যাই।"

"বাঃ... তুমি তো দেখছি রীতিমতো শিক্ষিত পাঁঠা! তুমি বোঝ— মানুষে বোঝে না!"

মালিক পাঁঠার থুতনির নিচে আঙুল দিয়ে সুড়সুড়ি দেয়। পাঁঠাটা আরাম উপভোগ করতে থাকে।

ভাবতেই প্রদীপের হাসি পায়। সত্যিই কি 'আমি' বলে কিছু আলাদা আছে? সারাজীবন 'আমি', 'আমি' করে যাও। তারপরেই ফুটুস, এবং পটলোৎপাটন। পরিস্থিতিটা অনেকটা পাঁঠার মতোই। পিসে পিসে বিক্রি হও। মেয়ের আবদার, রাং তথা বাবার বাড়ির দোতলা। ছেলের দাবি গোটা ফ্ল্যাট। বউমার নজর শাশুড়ির গয়নায়! নাতি বিদেশে পড়তে যাবে, তাই ব্যাঙ্ক ব্যালান্সটা...! এসব কিছুর মধ্যে আস্ত 'আমি'টা নেহাত ফুলস্টপ হয়ে মূর্খের মতো দেওয়ালে ঝুলতে থাকে!

এক জোড়া রাজহাঁসের মতো দম্পতি অন্ত্যেষ্টির কাজ শেষ করে এদিকেই আসছিল। বউটির মুখ শুকনো। সে শোকার্ত, বিধ্বস্ত। ছেলেটি বিষণ্ণ ঠিকই, তবে একেবারে ঝোড়ো কাকের মতো অবস্থাও নয় তার। শোকপর্বের মধ্যেই আঙুল দিয়ে ঠিক করে নিচ্ছে টম ক্রুজ কাট চুল। মেয়েটির কাঁধের ওপর হাত রেখে তাকে সান্ত্বনা দেওয়ার ভঙ্গি করছে।

প্রদীপ লক্ষ করল, মেয়েটির সম্ভবত শরীর খারাপ লাগছে। সে কোনওমতে দাঁতে দাঁত চেপে নিজেকে সুস্থ রাখার চেষ্টা করছে। মুখে ফোঁটা ফোঁটা ঘাম জমেছে। ফর্সা মুখ লাল, নাকের পাটা ফুলছে। সর্বনাশ। বমি করবে না কি!

ভাবতে না ভাবতেই তার আশঙ্কা সত্যি হল। মেয়েটি কোনওমতে বোধহয় এতক্ষণ বমিটা চেপে রেখেছিল। আর পারল না। শ্মশানের গেটের বাইরে গিয়েই হড়হড় করে বমি করে ফেলল। কষ্টে তার চোখে জল এসে পড়ছে। ছেলেটি তার স্ত্রীকে কোনওমতে সামলাচ্ছে। প্রদীপ তাকে সাহায্য করতে এগিয়ে গেল। একটা জলের বোতল সব সময়ই তার ব্যাগে থাকে। যেদিন থেকে শ্মশানে যাতায়াত করছে সেদিন থেকেই বোতলটা কাজে লাগছে।

আজও কাজে লাগল। মেয়েটি অনেকটা বমি করার পর নেতিয়ে পড়েছে। জলের বোতলটা তার দিকে নিঃশব্দে এগিয়ে দিল প্রদীপ। চোখেমুখে জলের ঝাপটা দিয়ে, অনেকখানি জল খাওয়ার পর সে বোধহয় একটু সুস্থ বোধ করল। একটু অপ্রস্তুত চোখে চারপাশটা দেখছে মেয়েটি। জলের বোতলটা প্রদীপকে ফেরত দিয়ে দিতেই ছোট্ট একটা বকুনি দিল তার স্বামী— "তোমাকে বলেছিলাম না এই অবস্থায় শ্মশানে না আসতে! দেখলে তো! দেখলে তো! আমার একটা কথাও শোন না তুমি!"

মেয়েটি অপরাধীর মতো সজল দৃষ্টিতে তাকায় স্বামীর দিকে।

"বাড়ি ফিরেই যত তাড়াতাড়ি সম্ভব কিছু মুখে দেবে।" ছেলেটি গম্ভীর আদেশের সুরে বলে— "যাঁর যাওয়ার তিনি তো গেছেনই। শত চেষ্টাতেও ফিরবেন না। কিন্তু যে আসছে তার কথা তো ভাবতে হবে।"

ও হো! মেয়েটি অন্তঃসত্ত্বা! যদিও দৈহিক কোনও লক্ষণ তেমন প্রকটভাবে চোখে পড়ে না। কিন্তু কথাবার্তাতেই বোঝা যায় যে, সে মা হতে চলেছে।

সহৃদয় মৃদুকণ্ঠে জানতে চায় প্রদীপ, "কে গেলেন?"

ছেলেটি স্ত্রীর দিকে ইঙ্গিত করে— "ওর মা। হার্ট ফেলিওর।" তারপর দীর্ঘশ্বাস ফেলে একটু আক্ষেপের সুরে বলল, "ব্যাড লাক দাদা। আর কয়েকটা মাস থাকলেই নাতির সুখ পেয়ে যেতে পারতেন। খবরটা জেনে খুব খুশিও হয়েছিলেন। কিন্তু...।"

'নাতি' শব্দটা খট করে কানে বাজল প্রদীপের। সে মুখে কিছু বলল না। এই পরিবেশে বলা শোভনও নয়। কিন্তু মেয়েটির শুকনো অপ্রস্তুত মুখের দিকে তাকিয়ে আপনমনেই ভাবতে লাগল— "নাতি! লোকটা নাতি বলল কেন? নাতনিও তো হতে পারে। তবে নাতনি নয় কেন?"

তবে কি দু'হাজার সাল পেরিয়ে আসার পরও সুখ একমাত্র নাতিতেই? নাতনি কি সুখের নয়?

দুই

"কী ব্যাপার দুর্গা? আজ যে একেবারে ননস্টপ মিউজিক?"

কাজের মেয়ে দুর্গা একগাদা থালা বাসন ধুতে ধুতে হুঁ হুঁ করে একটা পরিচিত বাংলা ফিল্মের গান গাইছিল। স্নিগ্ধার কথা শুনে চটুল হাসল।

কিছু মেয়ে আছে, যারা বাস্তবে তেমন সাজেগোজে না। অথচ ভদ্রস্থ একটা শাড়ি পরলেই মনে হয়— আরে, খুব সেজেছে তো! দুর্গা তেমনই একজন। গোলগাল শ্যামলা মুখের মেয়েটি সর্বক্ষণই পান-সুপারি চিবোচ্ছে। পানের রসে ঠোঁট রাঙা করে রাখা তার স্বভাব। মাথার চুল সবসময়ই পরিপাটি। সব মিলিয়ে বেশ চটকদার।

দুর্গা একটু হেসে উত্তর দিল, "আজ বুড়োটাকে একহাত নিয়েছি গো।"

বুড়ো অর্থাৎ তার স্বামীদেবতা। দুর্গার সঙ্গে তার স্বামীর বয়েসের অনেকটাই ফারাক। তাই এ জাতীয় সম্বোধন।

স্নিগ্ধা অবাক। "সে কী! নিয়েছিস মানে?"

"মানে ঠেঙিয়েছি," সে তার স্বভাবসিদ্ধ বাতুলতায় বকরবকর করে যেতে থাকে, "এক পয়সা ঘরে আনার মুরোদ নেই। আমার পয়সায় বসে বসে খায়। তার রোয়াব যদি দেখো বউদি। কাল মেয়েটাকে ইস্কুলে ভর্তির জন্য পাঠিয়েছিলাম। হারামজাদা ভত্তি তো করেইনি, উল্টে ভত্তির টাকা দিয়ে জুয়ো খেলেছে, মদ গিলেছে! যেই কিছু বলতে গেছি, অমনি লাল চোখ দেখায়! বলে, মেয়েছেলের পড়ে কী হবে! জজ-ম্যাজেস্টর হবে? না পড়াশোনা করে ভাতারের ঘরে পয়সা কামাবে? শুনে এইসান রাগ হল, কী বলব! তুই হারামি ব্যাটাছেলে হয়ে কোন জজ-ম্যাজেস্টর হয়েছিস? সেই তো মাগির ঘাড়ে বসেই খাচ্ছিস! হাতের কাছে রুটিবেলার বেলুনটা ছিল। দিলাম কয়েক ঘা বসিয়ে।"

"তুই বরকে মেরে দিলি!" স্নিগ্ধার চোখ কপালে— "আর তোর বরও চুপচাপ মার খেল!"

"চুপচাপ মার খাবে না তো কি!" দুর্গা হাসে— "এক বোতল গিলে এসেছে তো! নড়তে-চড়তেই পারছে না। সেই সুযোগেই দিয়েছি একেবারে নাক ফাটিয়ে!" তারপর ফিক করে হেসে ফেলে বলে, "দামড়াটার কান্না যদি একবার দেখতে! নাকের রক্ত দেখেই হয়ে গেছে। কান্না দেখে মায়া হল। শেষে সেই ভাঙা নাককে জোড়া দেওয়ার বন্দোবস্ত করে, রক্ত-টক্ত পুঁছে, ব্যান্ডেজ করে, ডাক্তার দেখিয়ে তবেই কাজে বেরুলাম।"

রান্নার জোগাড়ের মেয়ে বেলাও এতক্ষণ স্নিগ্ধার সঙ্গে হাঁ করে দুর্গার কথা শুনছিল। এতক্ষণে মুখ খুলল, "কি আক্কুটে মাগি রে তুই! বরকে মারলি! মেয়েছেলে হয়ে বর ঠ্যাঙালি!"

"ঠ্যাঙালাম," নিস্পৃহ মুখে বলে দুর্গা, "সে হারামজাদা কি আমায় কম ঠ্যাঙায়?"

"সে বেটাছেলে। সে ঠ্যাঙাতেই পারে।" বেলার সহজ জীবনদর্শন— "তার গায়ে জোর আছে। তুই তার মাগ। সে ঠ্যাঙালে দোষ নেই।"

"মোলো যা!" দুর্গার ধৈর্যচ্যুতি হয়— "সে মারলে দোষ নেই, আর আমি মারলেই ধম্মের কথা! ক্যান রে? সে মরদ বলে? মরদ হলে মরদের জুগ্যি কাজ করুক। দু'বেলা দু'মুঠো খাওয়াক। তা না, আমি চার বাড়ি গতর খাটিয়ে যা পাই, আঁটকুড়ির বেটা সব জুয়ো খেলে, মদ খেয়ে ওড়ায়। বেবুশ্যের পেছনে রংবাজি করে। আবার ঘরে এসে মাগকে শাসায়। পারলে নুড়ো জ্বেলে দিই অমন সোয়ামির মুখে! ইস্ত্রির পয়সায় ভাত, মদ খেলে ঝাঁটার বাড়িও খেতে হবে। ব্যস।"

কী সুন্দর সরল দার্শনিক সমাধান। স্নিগ্ধা দীর্ঘশ্বাস ফেলে। তবু অন্তত দুর্গা অন্যরকম কিছু ভাবতে পেরেছে। ওদের মতো মেয়েরা তো দুঃস্বপ্নেও এমন কথা ভাবতে পারে না। বেলার গায়ে, মুখে তো মাঝেমধ্যেই কালশিটে, লাল দাগড়া দাগড়া মারের ছাপ দেখা যায়! ওর বরটাকেও দেখেছে স্নিগ্ধা। ছোটখাট পাঁচফুটিয়া লোক একটা। বেলার পাশে নিতান্তই লিলিপুট। বেলা যদি দৈবাৎ এক চড় হাঁকিয়ে দেয়, তবে লোকটাকে আর খুঁজে পাওয়া যাবে না! তবু বেলা চুপ করে মার খেয়ে যায়। কী করবে! সোয়ামি দেবতা! ভাত খাওয়াতে না পারুক, মার খাওয়ানোর অধিকার তার সম্পূর্ণ আছে।

স্নিগ্ধার আশ্চর্য লাগে! কী করে পারে এরা! এত সহ্যশক্তি কোথা থেকে আসে! যে-লোকটা প্রায় হাড় ভাজা ভাজা করে খাওয়ার উপক্রম করছে, তাকে স্বামী ভাবতে কষ্ট হয় না ওদের? এ কথা একবার বলেছিল। বেলা কোনও উত্তর দেয়নি। দুর্গা বলেছিল, "বলো কি বউদি! মেয়েছেলের তো ভাগ্যই সহ্যি করার! ব্যাটাছেলেদের গায়ে যতই জোর থাক, যতই হুত্তুম-হাড়িম করুক না কেন, আসল জায়গায় সব ফুটুস। দাও না ওদের পেটে বাচ্চা ধরতে। ন'মাস অবধি যাবে না, তার আগেই ড্যাক্‌রা মরবে! ও যন্তনা সহ্যি করতে একমাত্তর মেয়েছেলেরাই পারে। আর যে অত যন্তনা সহ্যি করে, তার সবই সহ্যি হয় গো।"

দুর্গার কথাগুলো মনে পড়তেই মুখে মিষ্টি একটা হাসি ভেসে উঠল স্নিগ্ধার। দুর্গা খুব যুক্তিপূর্ণ কথা বলে। শিক্ষিত ঘরে জন্মালে উকিল হতে পারত। কিন্তু হাসির কারণটা আসলে যুক্তির নয়। এ হাসি পূর্ণতার। এ হাসি মাতৃত্বের। আর কয়েক মাস পরেই সেই চির-আকাঙ্ক্ষিত যন্ত্রণা সহ্য করতে হবে তাকে। প্রাণান্তকর ব্যথাও যে বড় সুখের হতে পারে, তা এখন থেকেই টের পাচ্ছে সে। চুমুমুমুটা আস্তে আস্তে বেড়ে উঠছে গর্ভের নিশ্চিন্ত আশ্রয়ে। বমি বমি ভাব, মাথা ঘোরা, শারীরিক দুর্বলতায় প্রতিমুহূর্তে টের পাচ্ছে তার উপস্থিতি। কয়েক দিন পরেই দুষ্টুটা হাত-পা নাড়বে। লাথি মেরে বলবে, "মা...আমি আছি...।"

ঋতম যেদিন খবরটা পেল সেদিন থেকেই প্রায় ছেলেমানুষ হয়ে গেছে। স্নিগ্ধা প্রথমে কাউকেই খবরটা দেয়নি। দু'মাস পিরিয়ড মিস করার পর চুপিচুপি প্রেগা-টেস্ট কিটে পরীক্ষা করে দেখেছিল। রেজাল্ট যথারীতি পজিটিভ। আনন্দে সেদিন কী করবে ভেবে পায়নি ও। বাথরুমে দাঁড়িয়ে নিজেকে বার বার খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখেছিল। নিজেকে কেমন অন্যরকম লেগেছিল সেদিন। স্নিগ্ধা চিরকালই অপূর্ব সুন্দরী। কিন্তু না— সৌন্দর্যের চেয়েও বেশি কিছু দেখিয়েছিল তাকে আয়না। আয়না বলেছিল, "দ্যাখো, তুমি এই মুহূর্তে দুনিয়ার সবচেয়ে সুন্দরী নারী। হ্যাঁ... হেলেন অফ ট্রয়ের চেয়ে সুন্দরী। দ্যাখো, তোমার চোখে আর লাস্যের বিদ্যুৎ নেই। বরং মমতার লাবণ্যে ভরে আছে। এত দিনে তুমি সম্পূর্ণ নারী। তোমার সুছাঁদ বাদামি রঙের মুকুল দুটো আরও স্ফুরিত হয়ে উঠবে। সেই ছোট্ট মানুষটার পবিত্র ঠোঁটের স্পর্শের জন্য তুমি হয়ে উঠবে অমৃতক্ষরা! এর পর তোমার ক্ষীণ কটি ক্রমাগত স্ফীত হবে। যে-হিলহিলে কোমর নিয়ে ঋতম খেলা করত, তা আর থাকবে না। কিন্তু তা সত্ত্বেও তুমি দুনিয়ার সবচেয়ে সুন্দরী নারীই থাকবে। কেন নারী? কেন এত সুন্দর হতে পার তুমি? কারণ এই মুহূর্তে তুমি তো আর সাধারণ মানবী নও। এক শক্তির আধার। তোমার মধ্যে প্রস্তুতি নিচ্ছে নতুন প্রাণ। এখন তুমি ঈশ্বরী। তিলে তিলে সৃষ্টি করছ নতুন

বিশ্বের বাসিন্দাকে! হ্যাঁ, তুমিই ঈশ্বরী!"

একে আত্মরতি বলে কিনা কে জানে। কিন্তু সকালের কয়েক মিনিট স্নিগ্ধা সেই ঘোরেই বুঁদ হয়ে ছিল। তারপর ঘুমন্ত ঋতমকে ঠ্যালা মেরে ঘুম থেকে তুলে খবরটা দিয়েছিল সে।

"হো-য়া-ট!" আর পাঁচটা পুরুষের মতোই ঋতম হতভম্বের মতো তার দিকে তাকিয়েছিল। যেন বিশ্বাসই করতে পারছে না! ওর ভ্যাবাচ্যাকা খাওয়া মুখের দিকে তাকিয়ে ভারি মজা পায় স্নিগ্ধা। আস্তে আস্তে বলে— "ড্যাডি... এত দিন ধরে ঝামেলা পাকাচ্ছ। তার শাস্তি পাবে না? নাও, তোমার প্রোমোশনের সময় এসেছে। এবার মাঝরাতে উঠে ন্যাপি বদলানোর কাজ করতে হবে।"

"মা-ই-গ-ড!"

"ভগবানকে ডাকছ কেন? অপরাধটা কি তিনিই করেছেন?"

"না...না..." ঋতম লাফিয়ে উঠে স্নিগ্ধাকে জড়িয়ে ধরে— "আমি করেছি। আমি বাবা হব...আমি বাবা...।"

তারপর লাফঝাঁপ মেরে সে সারা বাড়ি মাথায় করেছিল। শাশুড়ি মা তখন পুজোয় ব্যস্ত ছিলেন। ঋতম সটান বাসি মুখে, বাসি কাপড়ে ঢুকে গেল ঠাকুরঘরে। অন্য কোনও দিন হলে ভদ্রমহিলা ছেলেকে একহাত নিতেন। কিন্তু সেদিন কিছুই বললেন না। বরং গোপালের বিগ্রহের দিকে তাকিয়ে স্মিত হাসলেন, "গোপাল আসছেন ঋতম। বউমার কোল আলো করে তিনিই আসছেন।"

কথাটা শুনে স্নিগ্ধা খুশি হয়নি। এ কী! গর্ভে ভ্রূণ আশ্রয় নিতে না নিতেই তার লিঙ্গ নির্ধারণ করে বসে আছেন কেন মহিলা! গোপালকেই আসতে হবে এমন কোনও মানে আছে? রাধিকাও তো আসতে পারেন। অথবা তাঁর সহচরীদের কেউ!

আরও আশ্চর্য হয়েছিল ঋতমের কাণ্ডকারখানা দেখে। অফিসফেরত সে একগাদা খেলনা নিয়ে হাজির! ব্যাট, ফুটবল, সাইকেল— সবই ছোটদের খেলার উপযুক্ত! স্নিগ্ধাকে জড়িয়ে ধরে তার পেটে মুখ গুঁজে বলেছিল—"তাড়াতাড়ি বেরিয়ে আয় ব্যাটা। তারপর বাপ-ছেলে মিলে খুব খেলব।"

"ছেলে!" স্নিগ্ধা হেসে উঠেছিল। "ছেলে কেন? মেয়েও তো হতে পারে।"

"উঁহু"। তার পেটে হাত বোলাতে বোলাতে বলে ঋতম, "ছেলেই হবে। আমাদের বংশের প্রথম সন্তান সব সময় ছেলেই হয়।"

"সে আবার কী!"

"আমাদের ফ্যামিলির নিয়মই এটা।" ঋতম তাদের পরিবারের ছোট্ট একটা ইতিহাস জানিয়েছিল। ওদের পূর্বপুরুষ কোন এক সাধুকে সন্তুষ্ট করে আশীর্বাদ পেয়েছিলেন। সাধুজি বলেছিলেন যে, তাদের জুয়েলারির ব্যবসা উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি করবে। বংশের মুখ উজ্জ্বল হবে। এবং প্রতিটি জেনারেশনের প্রথম সন্তানটি হবে সেই বংশের উত্তরাধিকারী। ব্যবসার কাণ্ডারি। অতএব প্রথম সন্তানটিকে পুরুষ হতেই হবে।

স্নিগ্ধা প্রথমে ব্যাপারটাকে গুরুত্বই দেয়নি। বরং উল্টে হেসে বলেছিল, "এই দু'হাজার সালেও তোমরা এসব অন্ধবিশ্বাস পুষে রাখ! কোন সাধুবাবা কবে কী বলে গেছে, তার ওপর নির্ভর করে 'ছেলে...ছেলে' করছ!"

"অন্ধবিশ্বাস নয়!" এই প্রথম ঋতম সিরিয়াস হয়েছিল। "এটা প্রথা। আমাদের বংশের চিরাচরিত প্রথা। আমার ঠাকুমার প্রথম সন্তান আমার বাবা। আমার মায়ের প্রথম সন্তান আমি। তেমনই...।"

"ধুস।" স্নিগ্ধা তার কথাকে পাত্তা না দিয়েই বলে, "আমার মেয়ে ভাল লাগে। আমার মেয়েই হবে। একটা টুকটুকে গুলুগুলু মেয়ে। তা ছাড়া মেয়েরা কি বিজনেস সামলাতে পারে না...?"

ঋতম এবার হঠাৎ রেগে যায়, "এসব বাজে কথা একদম বলবে না। আমাদের ফ্যামিলির মেয়েরা বাইরে বেরিয়ে কোনও কাজ করে না। তাছাড়া আমার ছেলেই চাই— ব্যস।"

"মানে?" ঋতমের এই রূপ পরিবর্তন দেখে বিস্মিত ও ব্যথিত দুই-ই হয়েছিল স্নিগ্ধা। প্রথমে কিছুক্ষণ কী বলবে বুঝে উঠতে পারেনি। তারপর অতিকষ্টে বলে, "এটা কি কোনও টয় শপ? না কুমোরটুলি যে, অর্ডার করলেই ছেলে বেরিয়ে আসবে!"

স্নিগ্ধা দেখেছিল, ঋতমের মুখটা অদ্ভুত রকমের শক্ত হয়ে গেছে। "হ্যাঁ, অর্ডার করছি। এবং এটা শুধু আমার অর্ডার নয়। আমাদের পুরো পরিবারের এটাই অর্ডার। এ পরিবারে কখনও প্রথম সন্তান ছেলে ছাড়া অন্য কিছু হয়নি। হবেও না।"

"আর যদি হয়?" স্নিগ্ধা চ্যালেঞ্জের ভঙ্গিতে উঠে দাঁড়িয়েছিল।

"হবে না। আর অন্য কিছু হওয়ার কথা ভুলেও ভাববে না তুমি।"

ওর কথাগুলো কেমন যেন শাসানির মতো মনে হয়েছিল স্নিগ্ধার। বুকের ভেতরে অদ্ভুত একটা ভয় বোঝার মতো চেপে বসেছিল। এ কী! রীতিমতো বনেদি, শিক্ষিত পরিবারের সন্তানের এ কীরকম অশিক্ষিতের মতো কথা! কয়েক মুহূর্তের জন্য যেন নিঃশ্বাস নিতেও ভুলে গিয়েছিল সে। এখনও এমন হয়। ওদিকে টিভি খুললেই সেলেব্রিটিরা হাসি হাসি মুখে বলছেন, "ছেলে-মেয়ে একই... পুত্র সন্তানের সঙ্গে কন্যা সন্তানের ফারাক করবেন না... কন্যা ভ্রূণ হত্যা বন্ধ করুন...!" এ তো সব সময়ই হচ্ছে।

কয়েক মুহূর্তের জন্য স্নিগ্ধার মনে হয়েছিল, সে ঠিক কোন যুগে আছে! চতুর্দিকে মধ্যযুগীয় গন্ধ! যতই আধুনিক বলে দাবি করুক না কেন, আসলে আপাত আধুনিক ও শিক্ষিত মোড়কের তলায় মধ্যযুগীয় প্রাণীটির ঘোরাফেরা তখনই টের পেয়েছিল সে। কিন্তু প্রাণীটা দাঁত-নখ তখনও বের করেনি। ঋতম তার রূঢ়তা সম্পর্কে সচেতন হয়ে সঙ্গে সঙ্গে মুড চেঞ্জ করে ফেলেছিল। স্নিগ্ধাকে জড়িয়ে ধরে বলেছিল, "ওসব কথা ছাড়ো। তুমি শুধু ছেলের কথা ভাবো। দেখো, আমাদের ছেলেই হবে।"

যেন স্নিগ্ধা পুত্রসন্তান কামনা করলেই তার গর্ভ অভ্যন্তরস্থ প্রাণটির সঙ্গে সঙ্গে পুরুষাঙ্গ গঠিত হয়ে যাবে! স্নিগ্ধা মুখে কিছু বলেনি। কিন্তু মনে মনে দাঁত-নখের ভয় ছিলই। যদিও ঋতম এর পর আর এ বিষয়ে কিছু আলোচনা করেনি। তবু স্নিগ্ধা বুঝতে পেরেছিল, এ বিষয়টাকে ইস্যু করে প্রায়ই ছেলে আর মা-বাবার গোপন বৈঠক বসছে।

শাশুড়ির সঙ্গে এ বিষয়ে কথা বলতে চায়নি স্নিগ্ধা। ভদ্রমহিলা ভারী অদ্ভুত। বিয়ের পর থেকেই দেখে আসছে, মহিলার মেজাজের কোনও ঠিক নেই। আসলে তিনি বিয়ের আগে অভিনয় করতেন। বিয়ের পর এ বাড়ির নিয়মানুযায়ী অভিনয় ছেড়ে দিয়েছেন। সর্বক্ষণই গায়ে একগাদা হিরে-জহরতের গয়না পরে বসে আছেন। ঋতমদের বনেদি সোনা-হিরের বিজনেস 'ধনলক্ষ্মী জেমস অ্যান্ড জুয়েলারি'র চলমান ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসাডার!

মহিলাকে কখনও স্বাভাবিক মানুষ বলে মনে হয় না তার। সব সময়ই কেমন যেন 'অভিনেত্রী-অভিনেত্রী' ভাব। এই হাসছেন, মজা করছেন, আবার স্নিগ্ধার সামান্য ত্রুটিতেই রেগে লাল হয়ে যাচ্ছেন। দুর্ব্যবহার করছেন। বর্তমানে পুত্রবধূকে নিয়মিত এক গ্লাস দুধের সঙ্গে কাশ্মীরি কেশর মিশিয়ে খাওয়াতেই ব্যস্ত তিনি। যাতে গর্ভস্থ পুত্রসন্তানের চামড়া রেশমের মতো হয়, গায়ের রং দুধে-আলতা হয়।

স্নিগ্ধার একমাত্র আশ্রয় ছিলেন মা। কিন্তু তিনিও কিছুদিন আগেই দেহত্যাগ করেছেন। মা মারা যাওয়ার পর থেকেই সে বড় একা অনুভব করছে। এ বাড়িটাকে এখন আর বাড়ি মনে হয় না। যক্ষপুরী বলাই বরং ভাল। নিয়মের শেষ নেই। একটা মানুষও এখানে নিয়মের বাইরে যায় না। সকালের ব্রেকফাস্ট থেকে শুরু করে ডিনারের সময় পর্যন্ত বাঁধা। মায়ের কাছে থাকতে কত রকমের বায়নাক্কা করত স্নিগ্ধা। সকাল দশটার আগে তার ঘুমই ভাঙত না। ব্রেকফাস্টে কখনও লুচি, কখনও পরোটার আবদার। যখনই তরকারি খেতে ইচ্ছে করত, তখনই একপ্লেট তরকারি ছোঁ মেরে তুলে নিত! এটা খাব না, ওটা খাব না তো লেগেই আছে...

এখানে এসবের বালাই নেই। সবাইকেই সকাল সাতটায় উঠতে হবে। আটটায় ব্রেকফাস্ট টেবিলে আসতে হবে সেজেগুজে! আটটার এক মিনিট দেরি হলে শ্বশুরমশাই চেঁচিয়ে বাড়ি মাথায় করবেন। এখানে লুচি, পরোটার সিনই নেই। ব্রেড, ফলের রস, কর্নফ্লেক্স—

এসবই চলে! এবং রোজই এক মেনু। নিয়মের বাইরে কিছু নেই। শ্বশুরমশাই ও ঋতম সময় মেপে বাড়ি থেকে বেরোন, এবং প্রায় বাঁধা সময়ে বাড়ি ফেরেন। ঋতম ক্লাবে যায় সপ্তাহে একদিন, শনিবার। সেদিনও কিন্তু ঠিক রাত দশটা বাজলেই তার গাড়ি গেট দিয়ে ঢোকে। শাশুড়ি রোজ একবার বাড়ি থেকে বেরোন, বিকেলের দিকে। আর ঘণ্টা দেড়েক পরে ফল-মিষ্টি ইত্যাদি নিয়ে বাড়ি ফেরেন। সেসময় কিন্তু তাঁর পরনে সাদা শাড়ি, যদিও এমনিতে তিনি রঙিন শাড়িই পরেন। এমনকী লক্ষ করে দেখেছে স্নিগ্ধা, ঋতমের কামার্ত হয়ে ওঠার সময়টাও প্রায় ধরা-বাঁধা। এ বাড়ির নিয়ম হল— রাত দশটাতেই সবাইকেই শুয়ে পড়তে হবে। যদি ঘুম না আসে তবে কড়িকাঠ গোনো। কিন্তু ঘরের দরজা বন্ধ হতে হবে ঠিক দশটাতেই। আর ঠিক এগারোটা বাজলেই ঋতমের উসখুসানি শুরু হয়, এগারোটা বেজে পাঁচে তার স্নিগ্ধাকে ভীষণ...ভীষণ...ভীষণ সেক্সি লাগে। আর এগারোটা দশে বউকে ছেড়ে থাকা তার পক্ষে অসম্ভব মনে হতে থাকে। এবং মোটামুটি সাড়ে এগারোটার মধ্যেই সে স্নিগ্ধার মধ্যে প্রবেশ করে! এর নড়ন চড়ন নেই।

স্নিগ্ধা জানতে চেয়েছিল, "একটা কথা বলো, তোমাদের সবই কি চিরকালই নিয়ম মেনে চলে আসছে?"

"হ্যাঁ", ঋতম বলে, "এসব আমাদের পূর্বপুরুষদের আমল থেকে চলে আসছে। আমার ঠাকুরদা ঠিক আটটাতেই ব্রেকফাস্ট করতেন। বারোটায় লাঞ্চ, রাত আটটাতে ফের ডিনার! এই নিয়মের বাইরে কিছু হলেই তাঁর মাথা গরম হয়ে যেত।"

"বুঝলাম।" স্নিগ্ধা মুচকি হেসে বলে, "তার মানে এগারোটা পাঁচেই তাঁর ঠাকুমাকে ভীষণ...ভীষণ...ভীষণ সেক্সি লাগত। আর এগারোটা দশে তিনি তাঁর ঘাড়ে গিয়ে হুড়মুড় করে পড়তেন।"

"মানে?" ঋতম অন্তর্নিহিত অর্থটা বুঝে উঠতে পারেনি। স্নিগ্ধা মুচকি হেসে উত্তর দেয়, "কিছু না। ভাবছি তোমরা কী ভয়ঙ্করভাবে নিয়ম মেনে চলো। হে-র হি-ট-লার!"

প্রথম প্রথম ব্যাপারটাকে হাল্কা ভাবে নিলেও এখন আর ভাল লাগে না তার। মনে হয়, জীবনটা যেন ক্রমশই একটা অসহ্য বোঝা হয়ে উঠছে। একই জিনিসের পুনরাবৃত্তি। নিয়ম...নিয়ম...এবং নিয়ম। খাওয়ার নিয়ম, শোওয়ার নিয়ম, টয়লেটে যাওয়ার নিয়ম, সঙ্গমের নিয়ম— সব কিছুর সঙ্গে বর্তমানে যোগ হয়েছে পুত্রসন্তান উৎপাদনের নিয়ম! এত নিয়মে দমবন্ধ হয়ে আসে স্নিগ্ধার।

সে আপনমনেই কিচেন থেকে বেরিয়ে আসে। দুর্গা আর বেলা এখন অন্যান্য বাড়ির বউদি-দাদাদের মুণ্ডপাত করতে ব্যস্ত। স্নিগ্ধা চুপচাপ এসে দাঁড়াল বারান্দায়। বাড়ির বাইরে চমৎকার একটা বাগান তৈরি করেছেন তার শ্বশুরমশাই। কিন্তু অদ্ভুত! সমস্ত বাগানটাই যেন নিয়মের শাসানিতে তটস্থ। ঝাউগাছগুলো সব সমান উচ্চতায় ছাঁটা। কারওর একটু বেশি মাথাউঁচু করার উপায় নেই। কারওর একটু বেঁটে, লম্বা, রোগা বা মোটা হওয়ার উপায় নেই। সে তার সামান্য স্ফীত পেটে হাত বলায়। চুমুমুমু, এই নিয়ে তেরো সপ্তাহ বয়েস হল তোর। বড্ড দেরি করছিস তুই। কবে আসবি সোনা মায়ের কোলে? ভাবতে ভাবতেই স্নিগ্ধা থমকে গেল। ঋতম গিয়েছে আলট্রাসাউন্ড স্ক্যানের রিপোর্ট আনতে। এতক্ষণ সে নিজের সন্তানের সঙ্গে ভাব বিনিময় করছিল। হঠাৎ অদ্ভুত এক আশঙ্কায় সেই বিনিময়ের সূত্র কেটে গেল।

ঋতম কি শুধুই আলট্রাসাউন্ডের রিপোর্টে বাচ্চার অবস্থান দেখবে? না অন্য কিছু?

'ভাবব না...ভাবব না' করতে করতেও ভাবনাটা তার মাথাতে চলেই এল। ঋতম বাচ্চাটার সেক্স ডিটারমিনেশন করবে না তো?

তিন

"সন্ধ্যা, তুমি ঘর মুছেছ!"

পাখি কাজের মেয়েকে উদ্দেশ্য করে বলে, "আমার পোড়া কপাল মুছেছ! এর নাম ঘর মোছা! চতুর্দিকে ছাই আর ছাই!"

সন্ধ্যার মুখ কাঁচুমাচু। "কী করব? দাদাবাবু রোজ মেঝের ওপর বসে কী লেখেন। আর সিগারেটের ছাই মেঝের ওপরই ফেলেন। আমি কতবার মুছব?"

সন্ধ্যারও দোষ নেই। প্রদীপ এককথায় চেন স্মোকার। মেঝের ওপর না বসলে তার নাকি লেখার মুড আসে না। লেখার মুডের আর একটি অনুষঙ্গ বলাই বাহুল্য, সিগারেট। বাড়িতে অ্যাশট্রে নেই— এ কথা বললে ভুল হয়। বরং একাধিক অ্যাশট্রে আছে। কিন্তু প্রদীপ সেগুলোর একটাও ব্যবহার করবে না। পাখি অনেকবার বলে দেখেছে। রেগেমেগে, রীতিমত দাঁত কিড়মিড়িয়ে বলেছে, "শ্মশানে ঘুরে ঘুরে তোর স্বভাবটাও ভূতুড়ে হয়ে গেছে— বুড়ো ভূত কোথাকার! ঘরটাকেও শ্মশান বানাচ্ছিস।"

প্রদীপের আরও অদ্ভুতুড়ে উত্তর, "ভগবান আর ভূতে গুলিয়ে ফেলছিস সোনা। শ্মশানবাসী ও ছাইভস্মধারী যিনি, তিনি ভূতনাথ হতে পারেন, কিন্তু কিছুতেই ভূত নন। বরং দেবতা! আমার স্বভাব তাই ভূতুড়ে নয়, দেবুড়ে... আই মিন দেবোপম!"

"দেবাদিদেব!" পাখি তাড়া করে প্রদীপকে, "বাকিটা আর থাকে কেন? আসুন, আপনাকে নীলকণ্ঠও বানিয়ে দিই।"

প্রদীপ তড়াক করে লাফ মেরে উঠে খাতাপত্র নিয়ে পালিয়ে যায়। প্রদীপ এমনই। এমনই ছন্নছাড়া, জংলি মনোভাবের। এসব দেখেই তো প্রেমে পড়েছিল। ভাবতে ভাবতেই আপনমনে হেসে ফেলে। ছোটবেলা থেকেই সে হারকিউলিসকে বিয়ে করবে বলে পণ করে বসেছিল। অথচ শেষমেশ বিয়ে করল এই ল্যাকপ্যাকে সিংকে! প্রদীপ কোনও অ্যাঙ্গল থেকেই হারকিউলিস নয়— তবে হাড়কিউলিস! বিয়ের দিন তার বান্ধবীরা এই নিয়ে প্রচুর প্যাঁক মেরেছিল। তার সহকর্মী কাম বন্ধু আলো ফিসফিস করে বলেছিল, "বর মন্দ নয়। বেশ নিরীহ অহিংস ছাগল-ছাগল দেখতে। তবে লোকটার যদি পাছা থাকত তবে একটু মানুষের মতো লাগত। আদারওয়াইজ় কেমন হাইড্রার মতো লাগছে!"

রাগতে গিয়েও রাগতে পারেনি পাখি। প্রদীপ সত্যিই বড় রোগা। ওর বাবা অল্প বয়েসেই মারা গিয়েছিলেন। মামাবাড়িতে খুব অবহেলায়, মানুষ হয়েছে। প্রদীপের ভাষায়, "পরগাছার অনুভূতি কাকে বলে জানিস? ধর, তুই একটা বাড়িতে দিব্যি খাচ্ছিস-দাচ্ছিস, ঘুমোচ্ছিস, বগল বাজাচ্ছিস। কিন্তু যখনই বাড়িতে বড় কোনও উৎসব হল— তুই সাইড হয়ে গেলি। তোর কাউকে নেমন্তন্ন করার অধিকার নেই। যদি বাই এনি চান্স খাওয়া-খরচার বাইরে একটা পয়সাও লাগে, মামারা আলোচনা করে ঠিক করবেন তোকে টাকাটা দেওয়া উচিত কি না! একটু দূরেই তোর মা অসহায়, ম্লান মুখে বসে থাকবে। এই হলাম আমি। তোকে বিয়ে করতেই পারি। কিন্তু একটা পরগাছাই সহ্য হচ্ছে না, তার ওপর আর একটা! মামারা স্রেফ খেদিয়ে দেবে!"

পাখি বলেছিল, "মামাবাড়ি থাকবি কেন? আমি দিব্যি ভদ্র একটা চাকরি করি। আমার নিজস্ব ফ্ল্যাট আছে। আমার কাছে থাকবি।"

"তাতে লাভ কী? আল্টিমেটলি সেই পরগাছাই তো! এত দিন বটের গায়ে ছিলাম, এবার পাকুড় গাছে থাকব।"

"শিল্পীরা কখনওই পরগাছা হয় না। তুইও একদিন ঠিকই ডালপালা মেলবি। তত দিন শুধু তোর গোড়ায় জল ঢালার কাজটা আমার। আর এটাও লক্ষ রাখতে হবে, যাতে চারাগাছটাকে অর্থচিন্তা নামের ছাগলটা মুড়িয়ে না খায়। এইটুকু করলেই, ব্যস।"

প্রদীপ ইমোশনাল হয়ে যায়, "তুই আমার মতো একটা টিপিক্যাল পকেটফাটা বাউন্ডুলের মধ্যে কী এমন দেখলি?"

"কাঁঠাল দেখেছি। বলিস তো এখনই গোঁফে তেল দিতে শুরু করি।"

তারপর থেকেই দুজনের সমবেত সংসার জীবনের ট্র্যাকে চলে এসেছে। অনেকেই সন্দেহ করেছিল যে, এ বিয়ে টিকবে না। মেয়েরা নাকি অকর্মণ্য স্বামী পছন্দ করে না। আর কোনও পুরুষও নাকি তার স্ত্রীয়ের রোজগারের অন্ন মুখে তুলতে চায় না। খোঁচা যে ওরা খায়নি বা এখনও খায় না, তা নয়। প্রদীপ মন খারাপ করেছে। ঝগড়াও করেছে। পথেঘাটে টিপ্পনি কাটার লোক তো কম নেই। এই তো, গত

পরশু পাশের ফ্ল্যাটের মিসেস ঘোষের বিবাহবার্ষিকী উপলক্ষে নেমন্তন্ন ছিল। মিসেস ঘোষ জানতে চেয়েছিলেন, "আচ্ছা মিস্টার গুপ্ত, আপনি তো সব সময়ই ফ্ল্যাটে থাকেন দেখি। কী করেন?"

প্রদীপ খুব শান্তস্বরে বলে, "আজ্ঞে, লিখি।"

"লেখেন তো জানি। কিন্তু করেন কী?"

মানে! সে ভদ্রমহিলার দিকে অবাক হয়ে তাকায়। এইমাত্রই বলল যে, সে লেখে। তার পরও মহিলা জানতে চাইছেন প্রদীপ কী করে!

"না, লেখালেখি তো অল্পবিস্তর সকলেই করে," মিসেস ঘোষ বললেন, "আমার কর্তাও তো এককালে কবিতা-টবিতা, গল্প-টল্প লিখেছেন। সেটা কথা নয়। অ্যাকচুয়ালি আপনার অকুপেশনটা কী? চাকরি করেন না বিজনেস?"

মিঃ ঘোষ একটা তির্যক হাসি হেসে বলেছিলেন, "উনি হাউসহাজব্যান্ড। আই মিন হোমমেকার।"

মিসেস ঘোষ এমন ভাবে তাকিয়েছিলেন যেন চোখের সামনে একটা রঙিন জেব্রা এসে নৃত্য করছে।

"হোমমেকার! আপনি কুকিং জানেন?"

প্রদীপ ক্লিষ্ট হেসে উত্তর দেয়, "নাঃ, আমি শুধু খেতে জানি।"

পাখি একটু দূরে দাঁড়িয়েই সমস্ত কথাবার্তা শুনছিল। তার ভুরুতে ভাঁজ পড়েছিল অনেকক্ষণ আগেই। এবার এগিয়ে এসে বলল, "অন্য মেয়েরা মানুষ বিয়ে করে। আমি সিংহ বিয়ে করেছি।"

"সিংহ!"

"জানেন না?" এবার হাসার পালা পাখির। "ন্যাশনাল জিওগ্রাফিকে দেখেননি? বিবাহিত সিংহরা কখনওই নিজের খাবার নিজে জোগাড় করে না। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই শিকার করে সিংহী। শিকার করে স্বামীকে খাবার এনে দেয়। তখনই পশুরাজ নড়েচড়ে বসেন। নয়তো নড়ার নামই করেন না।" সে সস্নেহে প্রদীপের কাঁধে হাত রাখে, "ইনি আমার পুরুষসিংহ। ওঁকে রোজগার করার মতো তুচ্ছ কাজ করতে বলব! আমার ঘাড়ে ক'টা মাথা!"

ঘোষ-দম্পতি গুগলিটা খেয়ে চুপ করে গিয়েছিলেন। কিন্তু প্রদীপের আঁতে ঘা লেগেছিল। এখনও সে ভালভাবে পাখির সঙ্গে কথা বলছে না। পাখি ব্যাপারটা লক্ষ করলেও চুপ করে আছে। সে জানে, যতই আধুনিকমনস্ক হোক— পুরুষদের কিছু ইগো থাকবেই। স্বামীর রোজগারের টাকা স্ত্রী উড়িয়ে বেড়ালে কোনও অসুবিধে নেই। উল্টোটা হলেই যত সমস্যা। মেয়েরা চিরকালই যেন ঘাড়ে বসে খাওয়ার লোক। বড়জোর নিজের রুটিটুকু রোজগারের সামর্থ্য তার থাকতে পারে। কিন্তু স্বামীর রুটিও সে রোজগার করবে কেন? এতে শুধু মহাভারত নয়, গোটা মানবজাতির ইতিহাসই বোধহয় অশুদ্ধ হয়। প্রদীপ এখনও এই প্রচলিত ধারণা থেকে বেরোতে পারেনি। তবে যত দূর নিজের স্বামীকে সে চেনে, তাতে চিন্তার বিশেষ কিছু নেই। আস্তে আস্তে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে চলে আসবে।

পাখি প্রদীপকে আরও একটু সময় দিতে পারত। প্রদীপের মৌনতা ভাঙার সঠিক সময় এখনও আসেনি। কিন্তু আজ তার সঙ্গে যে করেই হোক বাক্যালাপ শুরু করতে হবে। পাখির আজ প্রদীপকে প্রয়োজন।

প্রদীপ তার লেখার ঘরে বসে, উদাস নয়নে বাইরের দিকে তাকিয়ে আমগাছে একটা কাঠবেড়ালির খেলা দেখছিল। হাতে জ্বলন্ত সিগারেট। পাখি দৃশ্যটা আড়চোখে একবার দেখে নিল। তারপর যেন কিছুই হয়নি এমন ভাব করে বলে, "নিজের ধোঁয়া নিজের কাছেই রাখুন স্যার। কাঠবেড়ালিটার প্যাসিভ স্মোকিং হচ্ছে।"

সে ঘাড় ঘুরিয়ে পাখিকে একবার দেখল। তারপর শান্ত স্বরে বলে, "তোর বিয়ের আগের টাইটেলটা কী ছিল যেন? ভট্টাচার্য— তাই না?"

"হ্যাঁ।" পাখি কৌতূহলী— "কেন?"

"ভাবছি এখন থেকে নিজের নামটা মিঃ পি গুপ্ত না লিখে পি ভট্টাচার্য লিখব।"

পাখি বুঝল গত পরশুর হ্যাংওভার এখনও কাটেনি। সে মুচকি হেসে বলে, "এই হচ্ছে তোদের বোকা বোকা মেল ইগো।"

"তোর এই মহত্ত্ব দেখলেই গা জ্বলে যায়। একটা অপদার্থ, অকর্মণ্য লোককে বিয়ে করে বসে আছিস। ঘাড়ে বসিয়ে খাওয়াচ্ছিস। নিজেকে কী প্রমাণ করতে চাস বল তো!"

"সমাজসেবিকা।" পাখি মুচকি হাসে। "বেকারত্ব একটা বড় সামাজিক সমস্যা। আমার মতো মোটা পে-প্যাকেজ পাওয়া অনেক চাকুরে মেয়ে বাজারে আছে। তারা যদি ইঞ্জিনিয়ার, ডাক্তার, বিজনেসম্যান বিয়ে না করে একটা করে বেকার ছেলে বিয়ে করে, তবে বেকার সমস্যা কত কমে বল তো! আমি তাদের পথিকৃৎ। ভেবে দ্যাখ, কত বড় সমাজসেবা করছি। অন্তত পশ্চিমবঙ্গে একটা বেকার ছেলের সংখ্যা কমল। ইকনমিক্সের পাতায় আমার নাম সোনার অক্ষরে লেখা থাকবে..."

প্রদীপ এবার হেসে ফেলল। পাখির ওপর বেশিক্ষণ রেগে থাকা যায় না।

"যাক। গোঁসা কমেছে সিঙ্গি মহারাজের।" সে উঠে দাঁড়ায়, "কফি খাবি? সঙ্গে তোর ফেভারিট চিকেন স্যান্ডউইচ বানিয়েছি। সকাল থেকে ধোঁয়া ছাড়া আর কিছু খেয়েছিস বলে তো মনে হয় না।"

"চল।"

ব্রেকফাস্ট টেবিলে বসে দরকারি কথাটা পাড়ল পাখি। প্রদীপ তখন স্যান্ডউইচ শেষ করে ডিমের পোচের প্লেটে মনোযোগ দিয়েছে।

"দীপ।"

"উঁ?"

"একটা ফেভার করবি?"

প্রদীপ খেতে-খেতেই বলল, "বল।"

পাখি বলে, "আমাকে অনিকেতদার একটা ইন্টারভিউ এনে দিতে হবে।"

প্রদীপ আকাশ থেকে পড়ে। "কী সর্বনাশ! অনিকেত মিত্র। তিনি তো কাউকেই ইন্টারভিউ দেন না। কট্টরভাবে প্রচারবিমুখ।"

অনিকেত মিত্র বর্তমানের একজন নামী-দামি সাহিত্যিক। বহু বছর আগে তাঁর স্ত্রী মৃত সন্তান প্রসব করে দুর্ভাগ্যবশত মারা গেছেন। দ্বিতীয়বার আর বিয়ে করেননি। প্রদীপের ওপর একটা অদ্ভুত স্নেহ আছে। তাকে সন্তানসম ভাবেন। জীবনে কাউকে ইন্টারভিউ দেননি। জার্নালিস্টদের দেখলেই তেড়ে যান। তাঁর বক্তব্য, "ওরা হল কথা বেচার মিড্‌ল্‌ম্যান। যা তুমি বলবে, আর পাঠক যা শুনতে চাইবে— ওরা ঠিক তার মাঝখানে। তোমার বলা কথাগুলোকে রং চড়িয়ে, নিজের মতো করে বানিয়ে গরম গরম পেশ করবে। আমি দেখতে চাই না যে, ইন্টারভিউতে আমি এমন সব কথা বলছি, যা জীবনে কখনও বলার কথা ভাবিইনি! সো, আই হেট দ্য মিডিয়া!"

প্রদীপ এক মুহূর্ত চুপ করে থাকল। তারপর বলল, "দ্যাখ, গ্যারান্টি দিতে পারছি না। কিন্তু ট্রাই করব।"

পাখি কাঁধ ঝাঁকায়।

প্রদীপ চুপ করে কিছুক্ষণ ভাবল। রোজ বিকেলে অনিকেতদা শিশুদের কবরখানায় যান। যেখানে তাঁর মৃত সন্তানটিকে সমাধিস্থ করা হয়েছিল সেখানে গিয়ে দাঁড়ান। ওই মুহূর্তটা খুব দুর্বল। অনিকেতদার হিমবাহের মতন মনটাও তখন ভারাক্রান্ত আর সান্দ্র থাকে। কথাটা তখনই পেড়ে দেখা ভাল। ভাবতে ভাবতেই আপন মনে হেসে ফেলল প্রদীপ। একেই বলে জীবন! নিজের প্রয়োজনে মৃত্যু কিংবা শোককেও ব্যবহার করতে হচ্ছে!

জীবনের কী অদ্ভুত স্বার্থপর তাড়না! সে তাড়না কাউকে তোয়াক্কা করে না। এমনকী মৃত সন্তানের শোকগ্রস্ত পিতাকেও নয়!

চার

ঋতমের থমথমে মুখের দিকে তাকিয়ে ভয় পেল স্নিগ্ধা।

অফিস থেকে ফেরার পথে আল্ট্রাসাউন্ড রিপোর্ট নিয়ে এসেছে ঋতম। ডাক্তারের সঙ্গে কনসাল্টও করে এসেছে। কিন্তু কী কথা হয়েছে তা কিছুতেই বলছে না। স্নিগ্ধা যত বার জানার চেষ্টা করেছে, ততবারই মোলায়েম ভাবে এড়িয়ে গেছে।

ঋতমদের পরিবারের আরও একটা অদ্ভুত নিয়ম— সব কিছুই প্রথমে মা-বাবার সঙ্গে আলোচনা করতে হবে। তারপর পরিবারের অন্য সদস্যরা জানতে পারবে। সে কোনও সমস্যার কথাই হোক, কি কোনও সুসংবাদ। স্নিগ্ধা মা-বাবার গুরুত্বকে মর্যাদা দেয়। কিন্তু স্ত্রী? তার কি কোনও মর্যাদা নেই! সংসারে পেয়িং গেস্ট-এর মতো থাকা আর যাই হোক, খুব সুখকর নয়। পারিবারিক কোনও সমস্যার আলোচনায় সে নেই! স্বামীর কোনও ব্যক্তিগত সমস্যায় তার মতামত অপ্রয়োজনীয়। এমনকী তার নিজের কোনও প্রবলেমেও সিদ্ধান্ত নেবেন শ্বশুর-শাশুড়ি।

স্নিগ্ধা সবই চুপচাপ মেনে নিয়েছে। সে কোনও দিনই খুব প্রতিবাদী স্বভাবের ছিল না। সাংঘাতিক স্বাধীনচেতাও নয়। এ জগতে কিছু কিছু মানুষ আছে যাদের স্বভাবের কোনও আকৃতি নেই। অনেকটা জলের মতন। যে-পাত্রে রাখা হয় সেই পাত্রেরই আকার ধারণ করে। স্নিগ্ধার এই স্বভাবগুণের জন্যই তাকে পছন্দ করে পুত্রবধূ হিসাবে এনেছেন ঋতমের মা-বাবা। অন্য কোনও স্বাধীনচেতা মেয়ে হলে নিয়মের দাসত্ব মেনে নিত না। কিন্তু স্নিগ্ধা মানিয়ে নিয়েছে। মানিয়ে নিতে নিতে যখনই হাঁফ ধরে গেছে, তখনই মায়ের সঙ্গে কথা বলেছে। মা বলতেন, "যে-কোনও সংসারে শিকড় গাড়তে হলে সন্তানের প্রয়োজন হয়। বাইরের মেয়ের গুরুত্ব কারও কাছেই নেই, কিন্তু সন্তানের মায়ের দাম আছে।"

আজ সেই পথেই চলেছে স্নিগ্ধা। তার গর্ভে এখন ঋতমের অনাগত সন্তান বেড়ে উঠছে। তার খুশি হওয়ার কথা। অথচ একটা অদ্ভুত ভয় তাকে কুরে কুরে খাচ্ছে। ঋতমের গম্ভীর মুখ সেই ভয়কে আরও কয়েক গুণ বাড়িয়ে তুলল। সে শুনতে পেল বসার ঘরে মিটিং বসেছে। চাপা গলায় কথাবার্তা চলছে। কী হল? বাচ্চাটা ঠিক আছে তো?

সে আলতো করে নিজের পেটে হাত বোলায়। মনে মনে নিজের সন্তানকেই প্রশ্ন করে, কী হল বল তো সোনা? বাবার মুখ অমন গম্ভীর কেন? তুই ঠিক আছিস তো?

স্নিগ্ধার কায়াহীন আশঙ্কা অমোঘ রূপ নিল আর একটু পরেই।

"তোমায় বাচ্চাটা অ্যাবর্ট করাতে হবে স্নিগ্ধা।"

তরল সিসার মতন কথাগুলো কান বেয়ে গড়িয়ে পড়ল মস্তিষ্কের খাঁজে খাঁজে। সে প্রথমে বুঝতে পারল না ঋতম ঠিক কী বলছে! বোকার মতো হাঁ করে তাকিয়ে অনুভব করছিল সারা শরীরে তীব্র জ্বালাময়ী প্রদাহ। কয়েক মুহূর্তের জন্য মনে হল কোথাও কেউ নেই— কিছু নেই। চতুর্দিক অন্ধকার হয়ে আসছে। ঋতমের গলার স্বরও আস্তে আস্তে ক্ষীণ হয়ে কানের কাছে শুধু ঝিঁঝির ডাক। স্নিগ্ধার মনে হল, সে অনন্ত রাত্রির সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। এ রাতের কোনও শেষ নেই!

সে টলে পড়ে যাচ্ছিল। ঋতম তাকে ধরে ফেলেছে।

"স্নিগ্ধা....শোনো...!"

"না।" স্নিগ্ধার শ্বাসকষ্ট হচ্ছিল। সে কোনওমতে নিঃশ্বাস নিতে নিতে বলে, "না...না!"

"এমন করে না, শোনো।"

সে ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে যাচ্ছিল। তলপেট আঁকড়ে ধরে ককিয়ে উঠল, "কিছুতেই না!"

"স্নিগ্ধা। বোঝার চেষ্টা করো। আমাদের বাচ্চাটা বেঁচে নেই। ও মারা গেছে। অ্যাবর্ট না করালে গ্যাংগ্রিন হয়ে যাবে। আমার কথা শোনো। ডক্টর সিন্‌হা বলেছেন যত তাড়াতাড়ি সম্ভব..."

এতক্ষণে বুকের ভেতরের প্রবল ঝড় পাঁজর ভেঙে বাইরে বেরিয়ে এল। উন্মত্তের মতো হা হা করে কেঁদে উঠল স্নিগ্ধা। "না...না...কিছুতেই না...!"

ঋতম তাকে জড়িয়ে ধরেছে। কোনওমতে শান্ত করার চেষ্টা করতে করতে বলল—"পাগলামি কোরো না, আমার কথা শোনো... শোনো!"

শুনবে না... কোনও কথা শুনবে না সে...তার সন্তান বেঁচে নেই...বিশ্বাস করে না। কিছুতেই বিশ্বাস করবে না ঋতমের কথা... সব ভুল... সব মিথ্যে... এ কোনও দুঃস্বপ্ন! কোনও দুঃস্বপ্ন দেখছে স্নিগ্ধা। কেউ ধাক্কা মেরে জাগিয়ে দিক তাকে... কেউ বলুক "সব বাজে কথা, তুমি দুঃস্বপ্ন দেখেছ। তোমার সন্তান সম্পূর্ণ সুস্থ আছে!"

"ডা. সিন্‌হা বলেছেন কাল ফার্স্ট আওয়ারেই তোমাকে নার্সিংহোমে নিয়ে যেতে।" স্নিগ্ধার মাথায় হাত বোলাতে বোলাতে বিষাদগম্ভীর কণ্ঠে বলে ঋতম, "ভেঙে পোড়ো না। আমি আছি তো। আমাদের আবার ইস্যু হবে। দেখো... আবার কেউ আসবে... নতুন কেউ...।"

মায়ের মন মানে না। ঋতম তাকে বোঝাতে থাকে। শ্বশুর-শাশুড়িও সান্ত্বনা দিয়ে গেলেন। বোঝানোর চেষ্টা করলেন। শেষমেশ বুঝল স্নিগ্ধা। বুঝতেই হত তাকে। ঠিক হল, পরদিন ফার্স্ট আওয়ারেই মৃত সন্তানকে গর্ভচ্যুত করা হবে। সিদ্ধান্তটা শ্বশুর-শাশুড়ি আগেই নিয়েছিলেন। এবার অফিশিয়ালি ঘোষণা করলেন। ঋতম সমর্থন করল। স্নিগ্ধা কিছুই বলল না। শুধু পাথরের মূর্তির মতো চুপ করে বসেছিল সে। তার কিছুই করার নেই। কিছু বলারও নেই। প্রকৃতির নিয়মের বিরুদ্ধে সে যেতে পারে না। নিয়তির বিরুদ্ধেও নয়। চুপ করে বসে ভাবছিল, আর শুধু একটা রাত বাকি। তার অনাগত সন্তান শুধু আর একটা রাত তার সঙ্গে থাকবে। তারপর...

তখন অনেক রাত।

বসার ঘরের মস্ত বড় পেন্ডুলাম ঘড়িটা ঢং ঢং করে জানাল রাত বারোটা বাজে। বাইরে তখন একটাও শব্দ নেই। জানলা দিয়ে শুধু আমগাছটার ছায়া ছায়া মূর্তি দেখা যাচ্ছে। এই আমগাছটায় আজ পর্যন্ত কখনও আম হয়নি। সবুজ ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া পাতায় সে অনন্ত যৌবনবতী অপ্সরা। অপরূপ লাবণ্যে বাগানের শোভা বাড়িয়েছে। কিন্তু আজ পর্যন্ত আমগাছটা মা হয়নি।

বিছানায় শুয়ে শুয়ে স্নিগ্ধা প্রহর গুনছিল। আর কয়েক মুহূর্ত। তারপর একটা ছোট্ট মানুষ শরীর ছেড়ে চলে যাবে। প্রকৃতির খামখেয়ালে সে একদিন তার মধ্যে আশ্রয় নিয়েছিল। কীসের অভিমানে তাকে ছেড়ে চলে গেল কে জানে! কয়েক দিন আগেও তো সে ঠিক ছিল। তখন তো একবারও মনে হয়নি— থাকবে না। তাকে নিয়ে কত স্বপ্ন দেখেছিল! সব মিথ্যে! সবই কি মিথ্যে? উত্তর দেওয়ার কেউ নেই। স্নিগ্ধার চিন্তাসূত্র কেটে গেল। ল্যান্ড ফোনটা কর্কশ স্বরে বেজে উঠেছে।

এত রাতে কে ফোন করছে! যে ফোন করছে সে কি জানে না, এ বাড়ির বাসিন্দারা রাত দশটার পরে ল্যান্ডফোন ধরে না। ব্যবসা সংক্রান্ত এমার্জেন্সি হলে ঋতমের মোবাইলেই ফোন আসে। ল্যান্ডফোন ভুল করেও রাত দশটার পরে বাজে না।

তবে আজ বাজছে কেন?

স্নিগ্ধা নিষ্প্রাণ ভাবে হাত বাড়িয়ে তুলে নেয় রিসিভারটা। তার কথা বলার বিন্দুমাত্রও ইচ্ছে নেই। সমস্ত অনুভূতি যেন ব্লটিং পেপার দিয়ে কেউ শুষে নিয়েছে। কিন্তু ফোনটা না তুললেও উপায় নেই। আওয়াজে ঋতমের ঘুম ভেঙে যেতে পারে। অগত্যা ফোনটা রিসিভ করে আবেগহীন যন্ত্রমানবীর মতো বলে, "হ্যালো।"

ও প্রান্ত প্রথমে সম্পূর্ণ নিশ্চুপ। একটা ঘন নিঃশ্বাসের শব্দ। কিন্তু কোনও আওয়াজ নেই!

সে বিরক্ত হয়েই বলে, "হ্যালো? কে বলছেন?"

এবার উত্তর এল। অপ্রত্যাশিত কণ্ঠস্বরে একটা অপ্রত্যাশিত উত্তর! একটা কচি গলা! একদম কচি অথচ মিষ্টি গলা। আধো আধো উচ্চারণ— কিন্তু দুর্বোধ্য নয়। রিনরিনে মিষ্টি গলায় উত্তর এল— "মা, আমায় মেরো না।"

স্নিগ্ধা বুঝে উঠতে পারল না ব্যাপারটা ঠিক কী হচ্ছে। তার মনে হল, সম্ভবত ফোনটা রং নম্বরে এসেছে। কিন্তু একটা বাচ্চা মাঝরাতে কাকে ফোন করছে!

সে আবার সেই প্রশ্নটাই দ্বিতীয়বার করল, "কে বলছেন?"

কচি গলাটা উত্তর দিল, "আমি মরিনি মা। আমায় মেরো না। ওরা আমাকে মেরে ফেলতে চায়।"

"কারা?" স্নিগ্ধা অবাক।

"বাবা, দিদুন, দাদাই। সবাই আমাকে মারতে চায়।" কণ্ঠস্বরটা একটু থেমে নিবিড় অভিমানে বলল, "তুমিও তো ভাবছ আমি মরে গেছি! কাল সকালে তোমরা সবাই মিলে আমায় মেরে ফেলবে। তাই না?"

স্নিগ্ধার মেরুদণ্ড বেয়ে হিমেল স্রোত বয়ে যায়! এ কী শুনছে সে! এ কি তার মানসিক ভ্রান্তি! সে কি পাগল হয়ে গেছে, না কেউ বদমায়েসি করছে? বাস্তবে ঘটছে না স্বপ্নে? কী বলছে বাচ্চাটা! এই শিশুর কণ্ঠস্বরের পেছনে কে?

ও প্রান্তের কণ্ঠস্বর বলল, "তুমি কি নিজে আমার ছবিটা দেখেছ? তোমায় কি কোনও ডাক্তার নিজের মুখে বলেছে যে, আমি মরে গেছি? বাবার কথাতেই বিশ্বাস করলে? একবারও ভাবলে না যে, ওরা তোমাকে ভুল কথা বলতে পারে!"

স্নিগ্ধা কাঁপা কাঁপা কণ্ঠস্বরে জানতে চায়, "কে তুমি?... কে বলছ?"

ও প্রান্ত আবার চুপ।

"কে বলছ?" সে উত্তেজিত হয়ে বলে, "কে তুমি? উত্তর দাও।"

এবার উত্তর এল। নাহ্, কোনও ভ্রান্তি নয়। স্পষ্ট উচ্চারণে কচি কণ্ঠস্বরটা কেটে কেটে বলল, "আমি নন্দিনী। তোমার মেয়ে।"

লোকটা এবার আমার মুখের ওপর অসভ্যের মতো খ্যাঁক খ্যাঁক করে হেসে উঠল।

আমি অবধারিত ভাবে জানতাম ও হাসবেই। তাই অপমানটা গায়ে মাখিনি। লেখকদের মান-অপমান বোধ বেশি জাগ্রত হওয়া উচিত নয়। তাদের রাগ থাকতে নেই। প্রথম জীবনে সম্পাদকদের জুতো খেয়ে সার কথা বুঝেছি। স্রষ্টাদের গায়ের চামড়া একটু মোটা হওয়াই বাঞ্ছনীয়। কচ্ছপের মতো মাটি কামড়ে পড়ে থাকতে না-পারলে এ লাইন ছাড়তে হবে।

তাই রাগ হল না। বরং শান্তভাবেই বললাম, "যত দূর মনে পড়ছে, আমি কোনও হাসির কথা বলিনি।"

লোকটার হাসি তখনও থামেনি। অতিকষ্টে বলল, "হাসির কথা নয়! ওঃ! আপনি পারেনও বটে। মেগা সিরিয়ালে তবু মরা মানুষ ফিরে আসে! আপনি তো দেখছি আরও এককাঠি সরেস! যে এখনও জন্মায়নি তাকেই আমদানি করলেন। স্বয়ং বাল্মীকিও এত ভয়ঙ্কর কল্পনা করতে পারেনি। শুনেছি রাবণ জন্মানোর পরেই বড় হয়ে গিয়েছিল। তার তবু একটা লজিক আছে।"

"কী লজিক?"

"আফটার অল রাক্ষস বলে কথা। ওদের ব্যাপার-স্যাপারই আলাদা।"

"আমার গল্পে লজিক নেই?"

"না, নেই।" লোকটা আয়েশ করে একটা সিগারেট ধরাল, "একটা তেরো সপ্তাহের বাচ্চা মেয়ে মাতৃগর্ভে বসে নিজের মাকে ফোন করছে! এটা একটা গল্প হল! কী করে করছে! রীতিমতো যুক্তি দিয়ে কথা বলছে। এত কথা সে শিখল কোথা থেকে? এ কি হাই-টেকনোলজির মাতৃগর্ভ নাকি! সেখানে ফোন আছে! আই মিন... ফোনে কথা বলতে গেলে ও প্রান্তেও তো আর একটা ফোন লাগে।"

আমি ওর যুক্তি মেনে নিই। "তা লাগে।"

"তাহলে টেলিফোন সেই বাচ্চা মেয়েটা মাতৃগর্ভে পেল কোথায়? অথবা মহাভারতের কর্ণের সহজাত কবচ-কুণ্ডলের মতো সেও একখানা মোবাইল ফোন নিয়ে জন্মেছে।"

"কর্ণের কবচ-কুণ্ডল নিয়ে জন্মানো, কিংবা অভিমন্যুর মাতৃগর্ভে বসে চক্রব্যূহ ভেদ করার কৌশল শেখার গল্প লজিক্যাল বলে মনে হয় আপনার?"

"যথেষ্ট লজিক্যাল।"

"তাহলে আমার গল্পটাও লজিক্যাল।"

লোকটা হেসে ফেলল। "আপনি দেখছি এঁড়ে তর্ক জুড়ে দিয়েছেন! গল্পটা যে আজগুবি তা কিছুতেই স্বীকার করবেন না, তাই না?"

সে আলতো করে নিজের পেটে হাত বোলায়। মনে মনে নিজের সন্তানকেই প্রশ্ন করে, কী হল বল তো সোনা?

"না। অন্তত এই মুহূর্তে করব না। কারণ গল্প সবে শুরু হয়েছে। এখনও শেষ হয়নি।"

"বেশ। আপনি মহাকবিদেরও কল্পনাকে টেক্কা দিচ্ছেন। তারপর?"

পাঁচ

"মিডিয়া আসলে কী বল তো! কাইন্ড অব পিপিং টম। তোর ব্যক্তিগত কিছু থাকতে দেবে না। তুই সকালে কখন উঠিস, কোন পেস্ট দিয়ে দাঁত মাজিস, কখন টয়লেটে যাস— সব কিছু না জানা অবধি ওদের শান্তি নেই। এমনকী মৃত্যুর আগে তুই কত মিলিলিটার প্রস্রাব করেছিস তাও ওদের জানাতে হবে। আমি চাই না আমার মরার পর কোনও চ্যানেলের উপস্থাপিকা ঠোঁটে রং মেখে বলুক, মৃত্যুর আগে উনি এত মিলি প্রস্রাব করেছিলেন।" বলতে বলতেই গান ধরলেন। "গোপন কথাটি রবে না গোপনে..."

অনিকেতদার সঙ্গে কথা বলতে বলতেই প্রদীপের চোখ বয়স্ক ভদ্রমহিলার দিকে চলে গেল। অনিকেতদার সঙ্গে সে যে-ক"বার এই কবরখানায় এসেছে ঠিক ততবারই চোখে পড়েছে ভদ্রমহিলাকে। একমাথা সাদা চুল সব সময়ই এলো করে ছাড়া থাকে। সাদা শাড়ি পরেন। চোখে মুখে একটা আভিজাত্যের ছাপ। যৌবনে নিশ্চয়ই সুন্দরী ছিলেন। এখন যৌবনের চপল সৌন্দর্য না থাকলেও অদ্ভুত একটা গম্ভীর অথচ করুণ আকর্ষণ আছে। এমন মানুষদের উপস্থিতির সঙ্গে সঙ্গে মনের কোনও এক কোনায় মৃদু সুরে বেহালা বাজাতে থাকে। যেন অনন্ত বিষাদ দু'চোখে ভরে নিয়ে তাকিয়ে আছেন মানুষটি।

আজ পর্যন্ত ভদ্রমহিলাকে কোনও কথা বলতে শোনেনি প্রদীপ। সব সময়ই চুপ করে তাকিয়ে থাকেন কবরখানার দিকে। তারপর সমাধিস্থলের মধ্যে যে-কোনও একটিকে বেছে নিয়ে সাদা ফুল দিয়ে সুন্দর করে সাজান। কবরের গায়ে আলতো করে হাত বোলাতে থাকেন। যেন সমাধিস্থ ছোট্ট মানুষটিকে আদর করছেন।

আজ কিন্তু নিয়মের ব্যতিক্রম হল। অনিকেতদা একটু জোরেই গান ধরেছিলেন। তার ওপর সম্পূর্ণ বেসুরো। ভদ্রমহিলা একটু বিরক্ত হয়েই

বললেন, "একটু আস্তে। দেখছেন না, আমার খুকু ঘুমোচ্ছে।"

এই প্রথম তাঁর কণ্ঠস্বর শুনল প্রদীপ। ভীষণ অভিজাত, নম্রসুরে বাঁধা চমৎকার একটা কণ্ঠস্বর। কথাগুলো নরম হলেও তীব্র বিরক্তি এবং অনুযোগ বহন করে।

বকুনি খেয়ে অনিকেতদা থতমত খেয়ে গেলেন। প্রথমেই কী বলবেন ভেবে পেলেন না। তারপর অনুতপ্ত কণ্ঠে জানান, "সরি।"

মহিলা আর কিছু না বলে সমাধিস্থল সাজানোয় মন দিলেন। অনিকেতদা প্রদীপকে নিয়ে সামান্য সরে এলেন।

"জাঁদরেল মহিলা। একটু ক্র্যাকও আছে। কী রকম বকা দিয়ে দিল দেখলি? এই জন্যই আমি মেয়েদের ধারে কাছে ঘেঁষি না।"

প্রদীপ অনিকেতদার দিকে অপলক তাকিয়েছিল। অদ্ভুত একটা পার্থক্য এর মধ্যেই তার চোখে পড়েছে। অনিকেতদার শিশুটি এখানে সমাধিস্থ। এই ভদ্রমহিলারও তাই। কিন্তু তাঁর মধ্যে যে-শোকস্তব্ধ বিষাদ ছেয়ে আছে, তা অনিকেতদার মধ্যে নেই। অনিকেতদার কাছে তাঁর মৃত সন্তানের চেয়ে দার্শনিক চিন্তাভাবনাটাই বেশি গুরুত্বপূর্ণ। রোজ বিকেলে এই সমাধিস্থলের সামনে এসে দাঁড়ানোর মধ্যে শোকগ্রস্ত পিতার বেদনার চেয়ে দার্শনিক উদাসীনতার ভাগই বেশি। অনিকেতদার আচরণ আসলে প্রমাণ করতে চায়— দেখো, আমার সন্তান মারা গেছে। আমি শোকার্ত। আমি একা।

কিন্তু এই মহিলার মধ্যে আবেগের উচ্ছ্বাস নেই। বরং যেন আত্মমগ্ন। তাঁর দেখানোর কিছু নেই। প্রমাণ করারও কিছু নেই। নীরবে আপনমনে কোনও একটি কবর ফুল দিয়ে সযত্নে সাজাচ্ছেন।

অনিকেতদা ফিসফিস করে বললেন, "ওদিকে বেশি তাকাস না। ভদ্রমহিলার মাথায় গোলমাল আছে। কী ভাবতে কী ভেবে বসবেন। তারপর ফের বকুনি।"

অনিকেতদার ত্রাস দেখে বেশ মজা পেল প্রদীপ। মৃদুস্বরে জানতে চায়, "কী গোলমাল আছে? আমার তো দিব্যি সুস্থ স্বাভাবিক মনে হচ্ছে।"

"দিনের পর দিন এখানে দাঁড়িয়ে থেকে থেকে এক সময় আমি নিজে আবিষ্কার করেছি যে, আসলে মৃত্যুটা ডেড এন্ড। তার ওপারে আর কিছু নেই। কেউ নেই। আমি কোনও দিন আমার মৃত সন্তানের অস্তিত্ব টের পাইনি। অথচ উনি টের পান। আশ্চর্য নয়?"

প্রদীপের মনে হয়, আসলে অনিকেতদা হীনমন্যতায় ভুগছেন। তিনি একজন সাহিত্যিক। সাধারণ মানুষের চেয়ে তাঁর মন অনেক বেশি সংবেদনশীল। তাই যা তিনি টের পাননি, তা আর একজনকে পেতে দেখে বিশ্বাস করতে পারছেন না। অনিকেত মিত্র যা পারেননি, তা একজন সাধারণ মহিলা কী করে পারবেন! ইম্পসিব্‌ল।

সে মৃদু হাসে। "আশ্চর্য কি না সেটা ওঁকে জিজ্ঞাসা করে দেখলেই হয়।"

"মাথা খারাপ!"

"মাথা খারাপের কী আছে?" প্রদীপ ভদ্রমহিলার দিকে গুটি গুটি পায়ে এগিয়ে যায়। অনিকেতদা তার দিকে সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন। আস্তে আস্তে বললেন, "তুই নির্ঘাত কেলো করবি। কী দরকার মহিলাকে ঘাঁটিয়ে। এক্ষুনি তেড়ে এসে কামড়ে দেবেন। সব সহ্য হয়, কিন্তু কোনও মেয়ের হাতে ঠ্যাঙানি হজম হয় না। সেধে সেধে গাল বাড়িয়ে থাপ্পড় খাওয়া কি খুব জরুরি?"

প্রদীপ উত্তর না দিয়ে এগিয়ে যায় সেদিকেই। হাঁটু গেড়ে বসে পড়ে ভদ্রমহিলার সামনে। মহিলা তখন দুলে দুলে ঘুমপাড়ানি গান গাইছেন, "আমার সোনা, চাঁদের কণা।" ডান হাতটা একটা সমাধির ওপরে আলতো করে বোলাচ্ছেন। প্রদীপ চুপ করে কিছুক্ষণ তাঁকে লক্ষ করে। ভদ্রমহিলাকে দেখে মানসিক রোগী বলে মনেই হয় না। আজ পর্যন্ত যত মানসিক রোগী দেখেছে প্রদীপ, তাদের সকলের মধ্যেই অদ্ভুত একটা অস্থিরতা লক্ষ করেছে। কিন্তু ইনি একেবারে শান্ত, ধীর-স্থির। কোনও রকম উত্তেজনা বা অস্থিরতা তো নেই-ই, বরং ভীষণ সমাহিত ভাব।

"আপনার খুকু ভারি লক্ষ্মী তো!" সে আস্তে আস্তে বলে, "কী সুন্দর চুপ করে ঘুমিয়ে পড়ল।"

তিনি হাসলেন। হাসিতে স্নেহ আর বাৎসল্য, দুই-ই সমানুপাতে ঝরে পড়ল। "হ্যাঁ, মেয়েরা তো লক্ষ্মীই হয়। আর ছেলেরা দস্যি।"

"খুকু দস্যিপনা করে না?"

তাঁর মুখের হাসিটা আরও উজ্জ্বল হল, "তা একটু করে। কখনও কখনও বায়নাও করে। তখন ভাল করে বুঝিয়ে বলতে হয়।"

"কী বায়না করে?"

এবার মহিলার মুখের হাসিটা মুছে গেল। উদাস কণ্ঠে বললেন, "বাড়ি যেতে চায়। এখানে থাকতে চায় না। ছোটবেলায় এত প্রশ্ন করত না। এখন বড় হচ্ছে তো। সব বোঝে। বোঝে যে এটা ওর বাড়ি নয়। বাড়িতে ওর ভাই, বাবা আছে। কিন্তু কেউ ওর সঙ্গে দেখা করতে আসে না।"

"কেন দেখা করতে আসে না?" প্রদীপের কৌতূহল হয়।

তাঁর মুখে মন খারাপের মেঘ নেমে আসে। চোখ দুটো অস্বাভাবিক নিষ্প্রভতায় ম্লান হয়ে যায়, "ওর ভাই জানেই না যে ওর একটা দিদি আছে। আর ওর বাবা মেয়েকে তেমন ভালবাসে না।" তিনি গভীর চোখ দুটো তুলে তাকালেন প্রদীপের দিকে। "তাই আমি একাই আসি। খুকু এখন বড় হয়েছে, অনেক প্রশ্ন করে। কিন্তু ওকে কি বলা যায় যে, নিজের বাড়িতে মেয়েটা নিজেই আনওয়ান্টেড। যদি তা না হত, তবে কি ওরা ওকে এখানে রেখে যেত? আজ তো ওর নিজের বাড়িতেই থাকার কথা। তাই না?"

প্রদীপ অবাক হয়ে ভদ্রমহিলার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে। তার মনে একটা অদ্ভুত সম্ভাবনা অনেক প্রশ্ন নিয়ে ঘুরে ঘুরে আসছিল। সে কোনও উত্তর না দিয়ে তাকিয়ে থাকে তাঁর দিকে। তিনি আস্তে আস্তে এবার সেই ছোট্ট কবরটার দিকে তাকালেন। "খুকু আর একটু বড় হোক। আমি জানি, ও ঠিক নিজে নিজেই চলে যাবে বাড়িতে। তখন কেউ ওকে আটকাতে পারবে না। ওর বাবাও নয়!"

প্রদীপের গা শিরশির করে উঠল। ভদ্রমহিলা কী বলছেন! কী ইঙ্গিত করতে চাইছেন। তাঁর মেয়ে অবাঞ্ছিত। বাবা মেয়েকে ভালবাসে না। মেয়েটার কি স্বাভাবিক মৃত্যু হয়েছিল? না... অন্য কিছু!

ছয়

পাখির আজ অফিসে কাজের খুব চাপ। একটু আগেই ওদের বস এসে সবাইকে একরাউন্ড দাঁত খিঁচিয়ে গেছেন। আর এক রাউন্ড লাঞ্চ ব্রেকের পর হবে। লোকটা কবে রিটায়ার করবে কে জানে! বয়েস তো কম হল না। কিন্তু রিটায়ার করার নাম নেই।

পাখির সহকর্মী আলো অবশ্য বলে, "কে জানে, আবার হয়তো এক্সটেনশন নিয়ে ফের আমাদের জ্বালাতে আসবে। যতক্ষণ না মরছে, ততক্ষণ কোনও গ্যারান্টি নেই।"

পাখি হেসে ফেলেছিল। আলো খুব মজাদার মেয়ে। এমন সব কথাবার্তা বলে যে, না হেসে উপায় থাকে না।

কিন্তু আজ সকাল থেকেই আলোর মুখ গম্ভীর। কথাবার্তা কম বলছে। মুখের চিরপরিচিত মিষ্টি হাসিটা উধাও। মাথা গুঁজে নিজের কপি লিখছে। এমনিতে সে প্রচণ্ড পরিশ্রমী। উদয়াস্ত খেটে যায়। আলোর এমন গুমোট মুখ আগে কখনও দেখেনি পাখি। কাজের ব্যস্ততার দরুন তার সঙ্গে কথা বলার সুযোগও পায়নি। সকাল থেকেই দু"জনের মরারও সময় নেই। শেষমেশ লাঞ্চ ব্রেক-এ কথা বলার সুযোগ হল।

ক্যান্টিনে পরোটা আর আলুর দমের ফরমায়েস করে আলোর পাশের চেয়ারটাতেই বসল পাখি।

"ডা. ঝাড়েশ্বরের ঝাড় কেমন এনজয় করলি?" মামুলি কথা দিয়েই কথোপকথন শুরু করল সে। আলো ম্রিয়মাণ হাসল, "ওটা তো দৈনিক ব্যাপার।"

"আমার পাতাটা প্রায় তৈরি হয়ে গেছে," সে বলে, "মনে হচ্ছে আজ বিকেলেই ছেড়ে দিতে পারব। তোর কী অবস্থা?"

আলো অন্যমনস্ক হয়ে বলে, "হুঁ। দেখি।"

"কী হয়েছে তোর?"

আলো সচকিত হয়ে বলে, "কী?"

"হয়েছেটা কী? মুখে হাসি নেই, সব সময় অন্যমনস্ক! প্রেম?"

অন্য সময় হলে আলো জোরে হেসে উঠত। কিন্তু আজ হাসল না। বরং ম্লান মুখে বলে, "ধুস ওসব প্রেম-ফ্রেম আমার জন্য নয়।"

পাখি হেসে ওঠে। "এই যে শুনলাম সব কথা পাকা হয়ে গেছে। অজয়বাবুর সঙ্গে এই শীতেই আপনি ছাঁদনাতলায় বসবেন। তাহলে কি ভুল শুনেছি?"

আলো দীর্ঘশ্বাস ফেলে। নাহ্, পাখি ভুল শোনেনি। ঠিকই শুনেছিল। সত্যি কথা বলতে কি, তিন দিন আগেও সব ঠিকই ছিল। বিয়ের তারিখও পাকা। অজয়কে মা-বাবার পছন্দ। অজয়ের বাড়িতেও আলোকে নিয়ে কোনও আপত্তি নেই।

কিন্তু তিনদিন আগে যা ঘটল, তার কোনও ব্যাখ্যা নেই। অফিসে বেরনোর আগেই হঠাৎ অজয়ের ফোন। "আলো, তুমি কি অফিসে পৌঁছে গেছ?"

"না, অন দ্য ওয়ে।"

"একবার দেখা করতে পারবে?"

"এখন?... হঠাৎ?"

"খুব জরুরি দরকার।"

"কোথায়?"

"রবীন্দ্রসদন এক্সাইডের সামনে...।"

আলো কোনওমতে দৌড়তে দৌড়তে এক্সাইডের সামনে পৌঁছেছিল। অজয়কে খুঁজে পেতে বিশেষ কষ্ট হয়নি। সে রবীন্দ্রসদন মেট্রোর সামনেই দাঁড়িয়েছিল। আলো উদ্বিগ্ন স্বরে জানতে চায়, "কী হয়েছে বলো তো? কাকু-কাকিমা, সবাই ঠিক আছেন তো?"

"সবাই ঠিক আছে।" অজয় আস্তে আস্তে বলে। "চলো, অ্যাকাডেমির সামনে একটা রেস্তরাঁ আছে। ওখানে বসে কথা বলি।"

"অজয়, আমার অফিস..."

"আমার জন্য একদিন না হয় একটু লেটই হলে।"

অজয়ের ব্যাপার-স্যাপার কিছুই মাথায় ঢুকছিল না আলোর। রেস্তরাঁতে এসে বসলেও উদ্বেগটা কিছুতেই ছাড়ছে না। অজয় তো কখনও এমন করে না। সে জানে যে, এই সময়টা আলোর অফিস চলে। তার নিজেরও কাজ থাকে। সে পেশায় প্রোমোটার। তাই তাদের সব সময়ই সন্ধেবেলা দেখা হয়। কখনও দু'জনে একসঙ্গে ডিনারও করে। কিন্তু সকালের দিকে ব্যস্ততার দরুন খুব একটা দেখা হয় না। হল কী?

"তোমার বাবা-মা কী অ্যারেঞ্জমেন্ট করেছেন?" অজয় খুব সহজ কণ্ঠেই জানতে চায়, "তাঁরা কি কিছু ভেবেছেন?"

"কী বিষয়ে?" আলোর মাথায় কিছুই ঢোকে না।

"আমাদের বিয়ের ব্যাপারে।" সে আরও নিচু গলায় বলে, "আই মিন... ওঁরা কি ফার্নিচার-টার্নিচার বা জুয়েলারির অর্ডার দিয়েছেন?"

"ফার্নিচার!"

আলো প্রায় আকাশ থেকে পড়ে। তার বাড়ির অবস্থা যে খুব ভাল নয়, তা অজয়ের জানা। বাবা যে-কোম্পানিতে চাকরি করতেন, সেটা লক-আউট হয়ে গেল। সেই শোকে বাবার প্রথম স্ট্রোক। তখন আলো স্কুলে পড়ে। প্রথমে দিদি একাই সংসারের হাল ধরেছিল। আলোর পড়াশোনার সমস্ত খরচ, সংসারের যাবতীয় সমস্যা দিদি একার কাঁধেই তুলে নিয়েছিল। ওর স্বপ্ন ছিল মাস্টার্স করার। হয়নি। হায়ার সেকেন্ডারির পরেই পড়াশোনায় ইতি দিয়ে নার্সিং করতে চলে গেল। দিদিকে অনেক কষ্ট করতে দেখেছে আলো। ছেঁড়া চপ্পল বার বার সেলাই করে পরত। সালোয়ার কামিজের রং উঠে গেলেও সে ছাড়ত না। দিদির ভাগ্য প্রথমে দাগা দিলেও পরে ওর কপাল খুলল। যে-হাসপাতালে ও নার্সিং করত, সেই হাসপাতালেরই এক ডাক্তারের সঙ্গে প্রথমে প্রণয় ও পরিশেষে বিবাহ। দিদি কিন্তু নার্সিং ছাড়েনি। ও জানত, ওর ডাক্তার বর যত টাকাই রোজগার করুক না কেন, তার টাকায় বাপের বাড়ির খরচ-খরচা চলবে। বিক্রমদা, অর্থাৎ ডা. বিক্রম চট্টোপাধ্যায়ের শত আপত্তি থাকা সত্ত্বেও সে নার্সিং করে গেছে। সেই টাকায় চলেছে আলোর পড়াশোনা। আজ আলো প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু এখনও বাবার অবস্থার বিশেষ উন্নতি হয়নি। বরং কিছু দিন আগেই সেকেন্ড স্ট্রোকটা হয়ে বাঁদিকটা পড়ে গেছে। চিকিৎসা করাতে জলের মতো টাকা বেরিয়ে যাচ্ছে। মা-ও খুব সুস্থ নন। এত দিনের খাওয়া-না-খাওয়ার অত্যাচার এখন প্রতিশোধ নিচ্ছে। পেটে ব্যথার কথা এত দিন কাউকে বলেননি। মায়েদের স্বভাবই হল না বলা! কিন্তু ব্যথা যখন অসহ্য হল, তখন আর লুকোতে পারেননি। ফলস্বরূপ আলসার ধরা পড়ল। কয়েক মাস আগেই অপারেশন হয়েছে। দিদি যতটুকু সাহায্য করার করেছে। বিক্রমদা নিজে ও তাঁর ডাক্তার কলিগরাও কম সাপোর্ট দেননি। তবু ভাল চিকিৎসা করাতে হলে ভাল অঙ্ক তো খসবেই। আলোকেই একটা মোটা টাকার লোন নিতে হয়েছে অফিস থেকে।

এসব কথা অজয় খুব ভালভাবেই জানে। অথচ সে এখন খবর নিচ্ছে যে, বিয়ের জন্য ফার্নিচার, জুয়েলারি তৈরি হচ্ছে কি না!

"মানে?" সে বিস্মিত, ব্যথিত কণ্ঠে বলে, "ফার্নিচার। জুয়েলারি! কিন্তু এমন তো কথা ছিল না।"

"এসব কথা বিয়ের আগে হয় নাকি? সব বিয়েতেই অল্পবিস্তর গিফট-টিফট দেওয়া হয়," অজয় বলল, "আমি মা-বাবার একমাত্র ছেলে। তাঁদের কিছু শখ-আহ্লাদ আছে। আমার বিয়ে নিয়ে তাঁদের তো কম স্বপ্ন নেই। আর তাছাড়া সামাজিক বিয়েতে এসব তো হয়ই।"

"সামাজিক বিয়ে করার দরকার কী অজয়?" কাতরভাবে বলে আলো, "আমরা তো রেজিস্ট্রি করলেই পারি। কোর্টে গিয়ে দু'জনে সাইন করলেই বিয়েটা হয়ে যায়। তোমার বিয়ে আমার সঙ্গে হবে। ফার্নিচার বা গয়নার সঙ্গে নয়।"

"বাঃ!" আলো অবাক হয়ে দেখল, অজয় রেগে যাচ্ছে। রাগে ওর ফর্সা মুখ লাল হয়ে উঠেছে। গরগর করে বলল, "তার মানে তোমরা এ বিয়েতে কুটোটিও ঠেকাবে না? আমার ফ্যামিলির স্বপ্ন? তার কী হবে?"

এবার আলোও উত্তেজিত। "তোমার ফ্যামিলি! তাদের স্বপ্ন! তুমি এতটা স্বার্থপর কী করে হতে পার অজয়? আমার ফ্যামিলির কথা একবারও ভাবছ না। তারা কী করে এসব অ্যারেঞ্জমেন্ট করবে? আমিই বা কী করে করব? আমার লিমিটেশনস তুমি জানো।"

"হ্যাঁ। খুব জানি।" অজয় অসভ্যের মতো চিৎকার করে ওঠে, "সব সময়ই তো দেখে আসছি তোমার ল্যাঙল্যাঙে বাবা, আর চিররুগ্ণ মাকে। তোমার বাড়িতে গেলে মনে হয়— ভুল করে হাসপাতালে এসে ঢুকে পড়েছি। সব সময়ই অসুস্থ পরিবেশ। ও বাড়িতে একটা লোক সুস্থ নেই। বিয়ের পর হয়তো রোগীর দায় আমাদের ওপরই বর্তাবে— তাই না? সেবা করতে করতেই ম্যারেড লাইফ কাটাব আমরা!"

"বিহেভ ইওরসেলফ!" হিসহিসিয়ে বলল আলো। "আমার ফ্যামিলি যে অসুস্থ, তা তুমি প্রথম দিন থেকেই জানতে। প্রেম করার সময় সেটা মনে ছিল না? তাছাড়া আমার বাবা-মার দেখাশোনা করার জন্য আমি আছি। তোমার স্যাক্রিফাইসের কোনও প্রয়োজন নেই।"

"ফাইন। তার মানে বিয়ের পরও তুমি তোমার মাইনের পুরো টাকাটা নিজের বাড়িতেই পাঠাবে!"

"এর আবার বিয়ের আগে, আর পরের কী আছে? যা রোজগার করি, সেটা ব্যক্তিগত ভাবে আমার। কোথায় দেব, কেন দেব— সেটাও আমার ব্যাপার।"

"আর আমাদের সংসার? সেটা কি হাওয়ায় চলবে?"

"আমরা দু'জনেই ম্যানেজ করে নিতে পারব। এবং তারপরও আমি আমার ফ্যামিলি মেনটেন করতে পারব।"

"চমৎকার। তোমার ফ্যামিলি! তোমার দায়িত্ব! আমার বোঝা উচিত ছিল। তোমরা হচ্ছ সব ছেলেধরা পার্টি! তোমার দিদি একজন ডাক্তারকে ফোকটে ম্যানেজ করেছে, তুমিও একই কাজ করছ। মা ঠিকই বলেছিল, আমি একটা ভিখিরির মেয়েকে ঘরে আনছি।"

হতভম্ব হয়ে চুপ করে বসে ছিল আলো। কী উত্তর দেবে? তার তখনও নিজের কানকেই বিশ্বাস হচ্ছে না। তিন বছর! পাক্কা তিন বছরের প্রেম তাদের। তিন বছর ধরে প্রেম করে এসে আজ অজয়ের এত কথা মনে হচ্ছে! নিজেকেই তো দিয়ে দিচ্ছে আলো। আজন্মপরিচিত মানুষগুলোকে ছেড়ে শুধুমাত্র অজয়ের জন্য সে একটা নতুন সংসারে পদার্পণ করতে চলেছে। এটাই কি যথেষ্ট নয়? খাট, আলমারি, ড্রেসিংটেবিল কি আলোর চেয়েও দামি?

কিছুক্ষণ স্তম্ভিত হয়ে বসে থাকার পর সে আস্তে আস্তে বলে, "আমার ধারণা ছিল— আমরা দু'জনেই দু'জনকে ভালবাসি।"

"টু হেল উইথ ইওর ভালবাসা।" স্প্রিং-এর মতো লাফিয়ে উঠেছিল অজয়। "অ্যান্ড টু হেল উইথ ইউ..."

রাগে মশমশ করতে করতে চলে গিয়েছিল সে। একবারও পেছন ফিরে তাকায়নি। তাকিয়ে দেখেনি যে, আলোর ঠিক কী অবস্থা হল। অথচ তখনও আলো তাকিয়েছিল তার গমনপথের দিকে। মনে মনে ভাবার চেষ্টা করছিল, এ লোকটা কে?

দাবি আরও বাড়তে পারে। এর পর বলবে গাড়ি চাই, ফ্ল্যাট চাই, অত টাকা ক্যাশ চাই! ওকে এমন শিক্ষা দিতে হবে যাতে জীবনেও আর পণ দাবি না করে।"

আলো উদ্বিগ্ন দৃষ্টিতে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকে তার দিকে। তারপর আস্তে আস্তে বলে, "আমায় একটু ভাবতে দে।"

"শিওর।" পাখি হাসল।

"যদি আমি তেমন কোনও স্টেপ নিই— পাখি, তুই সঙ্গে থাকবি তো।"

পাখি গম্ভীর মুখে বলল, "না। আমি তোর সঙ্গে মোটেও থাকব না। আমাকে তো অজয়ের পেছন পেছন যেতে হবে। ওর পণ চেয়ে হাজতে যাওয়ার খবরটা কভার করতে হবে না?"

এতক্ষণে আলোর মুখে ক্ষীণ হাসির রেখা ফুটে ওঠে। সে মৃদুস্বরে বলে, "থ্যাঙ্কস।"

সাত

সব কথা শুনে পাখির মুখ শক্ত হয়ে যায়। সে আস্তে আস্তে বলে, "বাচ্চা শুয়োর যে কত রকমের হয়! এতই যখন ফার্নিচারের জন্য হেদিয়ে মরছে, তখন একটা ফার্নিচারের দোকানির অশিক্ষিত মেয়েকে বিয়ে করলেই তো পারে হারামজাদা!"

"পাগল হয়েছিস!" ম্লান হাসল আলো, "একে দোকানির মেয়ে! তার ওপর অশিক্ষিত! প্রেস্টিজে লাগবে না?"

"ও বাবা! ক্লাসও চাই!" পাখি বলে, "ওর নিজের ক্লাস কী তার নেই ঠিক, আবার অন্যের ক্লাস দেখতে যায়! চাঁড়াল কাঁহিকা!"

আলো কিছু বলল না। কী-ই বা বলতে পারে। এখানে ওর বক্তব্য বিশেষ কিছু নেই। পাখি কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে তারপর জিজ্ঞাসা করে, "তুই কোনও ডিসিশন নিয়েছিস?"

"কীসের ডিসিশন?"

"পণ চাওয়া আইনত অপরাধ। তুই যখন ফার্নিচারগুলো চাইছিস না, সেগুলো কোনওমতেই স্ত্রী-ধন নয়, এবং যখন এগুলো অজয়েরই দাবি, তখন এটা পুরোপুরি ডাউরি কেস। তুই কি লোকটাকে এখনও বিয়ে করার কথা ভাবছিস?"

আলো জোরালো গলায় বলে, "না।"

"তোদের...মানে—কিছু মনে করিস না। বন্ধুত্বের খাতিরেই জিজ্ঞাসা করছি, তোদের কি ফিজিক্যাল রিলেশন ছিল?"

অবনত মুখে জবাব দেয় আলো, "হ্যাঁ।"

"কত দিন ধরে?"

"প্রায় তিন বছর..."

"ফাইন। তাহলে এখনই লোকাল পুলিশ স্টেশনে গিয়ে ওর নামে রিপোর্ট করতে পারিস। বিয়ের প্রতিশ্রুতি দিয়ে, তিন বছর ধরে লোকটা তোর সঙ্গে শারীরিক সম্পর্ক রেখেছে। এবং এখন পণ ছাড়া বিয়ে করতে রাজি হচ্ছে না। প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ। এটাও ক্রিমিন্যাল অফেন্স। এছাড়া পণ চেয়েছে বলে ছ'মাসের জন্য শ্রীঘরে যেতে পারে। পারলে মহিলা সমিতির দ্বারস্থ হ। হাজতে যদি নাও যায়— হ্যারাসমেন্ট তো হবে।"

"কী লাভ?" আলো হতাশ গলায় বলে, "তাতে তো বিয়েটা আর হবে না। প্যাচ-আপ করতে চাইলেও করব না। যখন ওই লোকটার আমার জীবনে কোনও ভূমিকাই নেই তখন ওর জন্য আমি খামোখা এত পরিশ্রম করব কেন?"

"আলবাত করবি। তুই একজন নেহাতই গৃহপালিত মেয়ে হলে বিয়ে না করার সিদ্ধান্তই যথেষ্ট ছিল। কিন্তু তুই একজন ঘাঘু সাংবাদিক। ব্যক্তিগত দায়িত্বের পাশাপাশি কিছু সামাজিক দায়িত্বও আছে তোর।" সে একটু থেমে বলে, "লোকটার হাত থেকে তুই নিষ্কৃতি পেলি ঠিকই। কিন্তু আর-একটা মেয়ের কাছেও সে এই একই দাবি করতে পারে। সেই মেয়েটা মেনে নিতে পারে, না-ও পারে। তাছাড়া লোকটা যে শুধু ফার্নিচারেই থামবে এমন কোনও গ্যারান্টি আছে কি? বিয়ের পর তার কথাটা বলতেই যেন আগ্নেয়গিরির বিস্ফোরণ হল! ঋতমকে দেখে মনে হল, এত দিনে বাঘটা দাঁত নখ বের করে ফেলেছে। শাশুড়ি মায়ের মুখটা পাথরের মতো শক্ত। শ্বশুরমশাইয়ের চোখ দুটো লাল। কাল রাতের ফোনটার কথা অবশ্য কাউকে বলেনি স্নিগ্ধা। এমনকী তার নিজেরও বিশ্বাস হচ্ছিল না। একটা কচি গলা যখন বার বার বলছিল যে, সে স্নিগ্ধার গর্ভস্থ সন্তান, এবং তার নাম নন্দিনী— তখনও স্নিগ্ধা বিশ্বাস করেনি। সে ভাবতেই পারেনি যে, একটা সুশিক্ষিত, বনেদি পরিবারে এমন কাণ্ডও ঘটতে পারে। কিন্তু বাচ্চাটার কথাগুলো ওর বিশ্বাসের ভিত নড়িয়ে দিয়েছে। এ পরিবারের কুসংস্কারের ভিত এতটাই মজবুত যে, এরা সব কিছু করতে পারে। সারারাত ধরে টানাপড়েনের ধাক্কায় উদ্‌ভ্রান্ত ছিল সে। তার মন তখন দ্বিধাবিভক্ত। অনেক ভেবেচিন্তে স্নিগ্ধা শেষ পর্যন্ত ফোন করল আলোকে। আলো তার বহু দিনের বন্ধু। এই বাড়ি থেকে মিনিট পাঁচেকের দূরত্বেই থাকে। দু"জনেই একসঙ্গে স্কুলে পড়েছে, কলেজে পড়েছে, মাস্টার্সও করেছে। বর্তমানে আলো একটি নামকরা পত্রিকার সাংবাদিক। প্রায় ভোররাতে স্নিগ্ধার ফোন পেয়ে সে অবাক!

"তুই!" একটা পেল্লায় হাই তুলে ঘুম জড়ানো বিস্মিত স্বরে বলল আলো, "কী রে! এত ভোর ভোর! সব ঠিকঠাক আছে তো? অ্যাঁ!"

"আমায় একটা ফেভার করবি? তোর জানাশোনা কোনও ভাল গাইনি আছে?"

"গাইনি! মানে গাইনিকোলজিস্ট!" আলোর ঘুমের চটকা ভেঙে গিয়েছিল। সে উদ্বিগ্ন হয়ে বলে, "কেন রে? তোদের ফ্যামিলির তো বাঁধা গাইনি আছে। ডা. সিন্‌হা। তোরা তো ওঁকেই দেখাস।"

"হ্যাঁ।" স্নিগ্ধা দৃঢ় কণ্ঠে বলে, "কিন্তু আমার একটা সেকেন্ড ওপিনিয়ন দরকার।"

"সেকেন্ড ওপিনিয়ন! কেন? এনি কমপ্লিকেশন?"

"স্লাইট।" সে এবার কাতর গলায় বলল, "তোর জামাইবাবু তো নামকরা ডাক্তার। দ্যাখ না বিক্রমদাকে বলে..."

"দাঁড়া, টেনশন নিস না। দিদি যে-গাইনিকে দেখাত সে খুব ভাল ডাক্তার। বিলেতফেরত। ফার্টিলিটি এক্সপার্ট। বিক্রমদাকে বলতে হবে না। ভদ্রমহিলার সঙ্গে আমার র‍্যাপো আছে। আমি ওঁকে ফোন করছি। তুই কবে দেখাতে চাস?"

"অ্যাজ আর্লি অ্যাজ পসিব্‌ল। সম্ভব হলে আজই।"

"সেরেছে!" আলো একটু চিন্তিত। "মহিলার তো আবার অ্যাপয়েন্টমেন্ট পাওয়াই দুষ্কর। দাঁড়া, দেখছি আমি।"

মিনিট পাঁচেক চুপচাপ। একটু পরেই আলো রিং ব্যাক করল। বলল, "ঠিক আছে। সব ব্যবস্থা হয়ে গেছে। তুই আজ দুপুর বারোটা নাগাদ খেয়ে দেয়ে ওঁর বন্ডেল রোডের ক্লিনিকে চলে যা। অ্যাড্রেসটা তোর মোবাইলে টেক্সট করে দিচ্ছি। চাপের কিছু নেই। গিয়ে রিসেপশনে আমার নাম বলবি।"

হড়বড় করে আরও কিছু বলতে যাচ্ছিল আলো। স্নিগ্ধা তাকে থামিয়ে দিয়ে বলে, "ডক্টরের নামটা কী?"

"সুনীতা সুরাল। বিড়াল নয় কিন্তু —"সু-রা-ল।"

স্নিগ্ধা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেছিল। এই হয়তো ভাল হল। যে-সন্দেহটা মনের মধ্যে খচ খচ করছে, সেটারও নিরসন হবে। আবার বাড়ির কাউকে সেভাবে অপমান করাও হবে না। সে তো আর ঋতমদের পুরোপুরি অবিশ্বাস করছে না। জাস্ট একটা সেকেন্ড ওপিনিয়ন নিতে যাচ্ছে। ঋতমদের আপত্তি করা উচিত নয়। কিন্তু মুশকিল হল স্নিগ্ধার উচিত-অনুচিতের ধারণাগুলো ঋতমদের থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। কথাটা বলতেই ঋতম লাফিয়ে উঠল। "মা-নে! তুমি আর একজন ডাক্তারের সঙ্গে অ্যাপয়েন্টমেন্ট করে ফেলেছ। আমাদের পারমিশন না নিয়েই! সেকেন্ড ওপিনিয়ন নেবে! কেন? ডা. সিন্‌হার ওপর তোমার বিশ্বাস নেই?"

"সম্পূর্ণ বিশ্বাস আছে।" নিচু অথচ দৃঢ় গলায় জবাব দেয় সে, "তবু আর একটা মতামত নিতে ক্ষতি কী? জাস্ট ফর হান্ড্রেড পার্সেন্ট শিওরিটি।"

"টু হান্ড্রেড পার্সেন্ট শিওরিটি দিচ্ছি তোমায়।" ঋতম ফুঁসে ওঠে, "বাচ্চাটা মরে কাঠ হয়ে গেছে। ও যতক্ষণ তোমার ভেতরে থাকবে ততক্ষণ তুমি সেফ নও। ইমিডিয়েটলি অ্যাবর্শন না করালে তোমার লাইফ রিস্ক আছে।"

"কাল রাত থেকে আজ সকাল পর্যন্ত যখন অপেক্ষা করেছি তখন আর কয়েক ঘণ্টাতেই বা কী এমন হবে?" স্নিগ্ধা শান্ত দৃষ্টিতে সবার মুখের দিকে তাকাল।

"ফাইন," ঋতম বলল, "কে এই ডক্টর? নাম কী?"

"সুনীতা সুরাল। বালিগঞ্জ ফাঁড়ির কাছে, বন্ডেল রোডে চেম্বার। আজ বারোটায় অ্যাপয়েন্টমেন্ট।"

"মহিলা ডাক্তার। আর ইউ ক্রেজি!"

"কেন? মেয়েরা কি ডাক্তার হতে পারে না?"

শাশুড়ি মা এতক্ষণে মুখ খুললেন, "হবে না কেন স্নিগ্ধা। কিন্তু ছেলেরা যত ভাল, মেয়েরা কি ততটা হয়? তাছাড়া ডা. সিন্‌হা টপমোস্ট গাইনি। তাঁর সঙ্গে কোনও মহিলা ডাক্তারের তুলনা?"

স্নিগ্ধা চুপ করে থাকে। কী বলবে সে? ভাল ডাক্তার, খারাপ ডাক্তারও আজকাল জেন্ডারের ওপর নির্ভর করছে। এমন কথা তার শাশুড়ি মা অবশ্য বলতেই পারেন। কিন্তু ঋতম? সে তো লেখাপড়া জানা ছেলে! তার তো মহিলা ডাক্তারের নামে নাক সিঁটকানোর কোনও ব্যাখ্যাই নেই!

"শেষ কথা শুনে রাখো," ঋতম গায়ের জোরে বলে, "তুমি অন্য কাউকে দেখাতে পারবে না। আমরা অন্তত কেউ তোমাকে ওই ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাব না। উল্টোপাল্টা কথা বলা বন্ধ করো। ডা. সিনহা নার্সিংহোমে অপেক্ষা করছেন।"

"আমি যাব না।"

এই প্রথম বোধহয় যক্ষপুরীর বাসিন্দারা স্নিগ্ধার জোরালো কণ্ঠস্বর শুনল। শ্বশুরমশাইয়ের চোখ আরও লাল হয়ে গিয়ে এখন ফাটবে ফাটবে করছে। শাশুড়ি-মা চমকে উঠলেন। ঋতম স্তম্ভিত। এই প্রথম স্নিগ্ধা নিয়মের বাইরে একটা কাজ করে ফেলেছে। তার বুকের ভেতরটা উত্তেজনায় দপদপ করছে। মনে হচ্ছিল, এক্ষুনি বুঝি বুক ফেটে মরে যাবে। ঋতমদের এত আপত্তি কীসের? কেনই বা আপত্তি? ওরা সত্যিই কিছু গোপন করছে না তো? উড়ো টেলিফোনের কথা তবে কি সত্যি?

"ফাইন।" ঋতম কাঁধ ঝাঁকায়। "তার মানে তুমি অ্যাবর্ট করাবে না। অন্য ডাক্তার দেখাবে।"

"হ্যাঁ।"

"ঠিক আছে।" তার চোখ দুটো ক্রুর হয়ে ওঠে। "আমিও দেখব তোমাকে কে নিয়ে যায় ওই ডাক্তারের কাছে! যে-ড্রাইভার নিয়ে যাবে

তার চাকরি কাল থেকে থাকবে না। এই শারীরিক অবস্থায় তুমি বাসে, ট্রামে একা একা যেতেও পারবে না। এত জেদ! মেয়েছেলের জেদ কী করে ভাঙতে হয়, আমি জানি। পড়ে থাকো পেটে মরা বাচ্চা নিয়ে। পচুক, গ্যাংগ্রিন হোক— তখন বুঝবে মজা। মা, আমায় খেতে দাও। অফিস যাব।"

স্নিগ্ধা কেঁদে ফেলল। কী বলল ঋতম তাকে! মেয়েছেলে! একটা শিক্ষিত লোক তার নিজের স্ত্রীকে 'মেয়েছেলে' বলছে। এতদিন সংসার করার পর শেষ পর্যন্ত ঋতমের কাছে সে শুধুই 'মেয়েছেলে'। আর তার সেকেন্ড ওপিনিয়ন নেওয়ার ইচ্ছেটা শুধুমাত্র একটা অন্যায় জেদ!

সজল চোখে সে তাকাল শাশুড়ি মায়ের দিকে। সেখানে সহানুভূতি, মমতার ছায়ামাত্র নেই। মুখটা পাথরের মতো কঠিন। দাঁতে দাঁত পিষে বললেন, "তোমার বাবা-মা শেখাননি যে, স্বামীর ইচ্ছেটাই শেষ কথা? মুখে মুখে তর্ক করছ তুমি! এটা কী ধরনের এটিকেট?"

কথাগুলো বলেই মশমশ করতে করতে চলে গেলেন তিনি। তার পেছন পেছন শ্বশুরমশাইও। তিনি মুখে কিছু বললেন না ঠিকই। কিন্তু জ্বালাময়ী দৃষ্টিতে প্রায় ভস্মই করে দিলেন তাকে।

কোনও দিন নিজেকে এমন অসহায় মনে হয়নি। কোনও দিন স্নিগ্ধা ভাবেনি যে, তাকে এমন পরিস্থিতির মুখোমুখি হতে হবে। বাধা যত প্রবলভাবে আসছিল, ততই তার সন্দেহ বিশ্বাসের রেখা ছুঁতে চাইছিল। সে চোখের জল মুছে নেয়। ঋতম তো তার সবচেয়ে কাছের মানুষ! সে কেন বুঝবে না? কেন সে স্নিগ্ধার ইচ্ছেকে মর্যাদা দেবে না! সন্তান তো স্নিগ্ধার একার নয়! সে নিজের পেটে আলতো করে হাত বোলায়। খুব খিদে পেয়েছে। এই সময়টায় খিদে-তেষ্টা বেশি হয়। কিন্তু আজ তাকে কেউ ব্রেকফাস্ট টেবিলে ডাকবে না। আজ সকালের মাখন-রুটিতে তার নাম লেখা নেই।

ভাবতেই অসম্ভব কান্না পেয়ে গেল স্নিগ্ধার। কষ্টের চূড়ান্ত সময়গুলোয় মাকে বড্ড মনে পড়ে। মা বলতেন, "মেয়েদের সব সময়ই সংসারে মানিয়ে নিতে হয়। পুরুষেরা চিরকালই মাথাগরম লোক। কিন্তু মেয়েদের ধৈর্য ধরতে হয় মা। নয়তো সংসার ছারখার হয়ে যায়।"

আজ যদি মা থাকতেন তবে তাঁকে প্রশ্ন করত স্নিগ্ধা। এমন উদ্ভট নিয়ম কেন মা? স্বামী-স্ত্রী তো সংসারের দুটো চাকা। তবে কেন সব সময়ই একটা চাকার ওপর সমস্ত চাপ চাপিয়ে দেওয়া হয়? স্নিগ্ধার ঘরের পরিবেশটাও তার মনের মতো বিষাদঘন হয়ে এসেছিল। দু"দিকে দুটো বিরাট বিরাট জানলা খোলা! কিন্তু রোদের বদলে একটা পাতলা নীলাভ ধোঁয়া এসে ঢুকছে ঘরে। রোদ যে একেবারেই নেই, তা নয়। ধোঁয়ার পেছন পেছন একচিলতে মনখারাপ করা ম্যাটম্যাটে রোদ এসে পড়েছে বিছানার ওপরে। এখান থেকে সামনের বাগানটা দেখা যায়। শিশিরকণা ফোঁটায় ফোঁটায় গড়িয়ে পড়ছে পাতার গা বেয়ে। যেন ওরাও কাঁদছে।

এখন ডাইনিং রুমে কাপ-ডিশের টুংটাং। অর্থাৎ খাওয়া-দাওয়া চলছে। ওমলেটের তীব্র গন্ধ এসে ধাক্কা মারল তার নাকে। খালি পেটে ভীষণ গা গুলোচ্ছিল। মাথাটাও টলমল করছে। বাথরুমে গিয়ে একচোট বমি করার পর শরীরটা আরও অসুস্থ লাগছিল তার। পেটে খিদে নামের রাক্ষসটা দ্বিগুণ দাপাচ্ছে। তবু স্নিগ্ধা থামল না। সে দাঁতে দাঁত চেপে শারীরিক সমস্ত অস্বস্তিকে জয় করার চেষ্টা করছে। জান না ঋতম... তুমি জান না, আমরা কী করতে পারি। তোমাদের কল্যাণের জন্য নির্জলা উপবাস রাখতে পারি। সতীত্ব হননের ভয়ে আগুনে পুড়ে মরতে পারি। দশ মাস দশ দিন পেটে তোমাদের ধরতে পারি, এবং প্রাণান্তকর যন্ত্রণা সহ্য করে তোমাদের জন্মও দিতে পারি!

যন্ত্রণাকে আমি ভয় পাই না! তোমাদের মতো আমি সোনার চামচ মুখে নিয়ে জন্মাইনি। বাসে, ট্রামে চড়ার অভ্যাস আছে। দুনিয়ার ক"টা গর্ভবতী মেয়ে গাড়িতে চড়ে ডাক্তারের কাছে যায়? তারা যদি পারে, তবে আমিও পারব ঋতম। তুমি দেখে নিও, আজ ঈশ্বরও আমায়

আটকাতে পারবে না!

"তোর কাছে কত টাকা আছে আলো?"

আলো এরকম উদ্ভট প্রশ্ন শুনে মুখ তুলে স্নিগ্ধার দিকে তাকায়। বাসের ঝাঁকুনিতে তার যে অসুবিধা হচ্ছে তা স্পষ্ট। ফর্সা মুখ লাল। কপালে চন্দনের ফোঁটার মতো বিন্দু বিন্দু ঘাম। বার বার ঢোঁক গিলছে।

আলোর মনে অনেক প্রশ্ন ভিড় করে আসছিল। স্নিগ্ধার হঠাৎ সেকেন্ড ওপিনিয়ন নেওয়ার প্রয়োজন পড়ল কেন? কমপ্লিকেশন থাকলে ওকে ঋতম নিয়ে এল না কেন? বাসে কষ্ট করে আসতে হল কেন মেয়েটাকে? আলোর কষ্ট হচ্ছিল। স্নিগ্ধা কি কিছু লুকোচ্ছে?

"কেন রে?"

স্নিগ্ধা একটা কষ্টের নিঃশ্বাস ফেলে। "খুব খিদে পেয়েছে। বাস থেকে নেমে আমায় কিছু খাওয়াতে পারবি? আমার কাছে এক পয়সাও নেই।"

সেটা আলো আগেই জানত। স্নিগ্ধা যখন বাসস্ট্যান্ডের সামনে দাঁড়িয়েছিল তখনই লক্ষ করেছে যে, ওর সঙ্গে কোনও ভ্যানিটিব্যাগ নেই। রিপোর্টারের চোখ বড়লোকের বউয়ের হাবেভাবে ঠিকই অসঙ্গতি খুঁজে পেয়েছিল। যে-মেয়ে কুমারী জীবনেও কোনও দিন মেক-আপ ছাড়া বাড়ির বাইরে এক পাও রাখেনি, তার কী বিধ্বস্ত অবস্থা। একটা ছাপা শাড়ি পরে, হাওয়াই চপ্পল পায়ে গলিয়েই চলে এসেছে সে।

"সে কী! তুই বাড়ি থেকে খেয়ে আসিসনি?"

স্নিগ্ধা চোখ নামিয়ে নিয়েছে। হয়তো কান্না লুকোবার জন্যই। কোনওমতে মাথা নাড়ল।

"মাই গড!" আলো উত্তেজিত, "আর ইউ ক্রেজি? এই অবস্থায় কেউ খালি পেটে থাকে! তোর বাড়ির লোকগুলো কী! ঋতমের এইটুকু কমন সেন্স নেই যে, তোর এখন পেট ভরে খাওয়া উচিত! আর তাছাড়া সে নিজেই বা তোকে নিয়ে এল না কেন?" সে নিজের মনে বকবক করতে করতেই বের করে এনেছে লাঞ্চ বক্স। এই লাঞ্চ বক্সটা রোজই তার সঙ্গে থাকে। এমনিতে লাঞ্চটা অফিসের ক্যান্টিনে সারলেও আর এক সেট বন্দোবস্ত সে করে রেখেছে। ফিরতে ফিরতে রাত হয়ে গেলে তখন এই বক্সটা কাজে লাগে।

"পরোটা আর আলুর তরকারি।" লাঞ্চ বক্স খুলে উঁকি মেরে দেখল আলো, "চলবে?"

চলবে মানে? খুব চলবে। পরোটা কত দিন খায়নি স্নিগ্ধা! পরোটা আর আলুর তরকারির কথা বললেই মায়ের কথা মনে পড়ে। ঋতমকে অনেক বার মায়ের হাতের পরোটা খেয়ে দেখতে বলেছে সে। কিন্তু ঋতম ব্রেকফাস্টে ব্রেড-বাটার ছাড়া আর কিছুই খাবে না। বিরক্ত হয়ে বলেছে, "মায়ের হাতের পরোটা নিয়ে এত আদিখ্যেতা করার কী আছে! ও বাড়িতে কি পরোটা কেউ বানাতে পারে না! না জগতে তোমার মা একাই পারেন! একগাদা তেল চপচপে খাবার না খেলে তোমাদের পেট ভরে না। এত তেল, ঘি খেলে কোলেস্টেরল অবধারিত। গুচ্ছ ক্যালোরি! কী করে যে তোমরা পারো! টিপিক্যাল মিড্‌ল ক্লাস সেন্টিমেন্টগুলো এখন ঝেড়ে ফেলো স্নিগ্ধা। নয়তো সোসাইটিতে মুখ দেখানো মুশকিল হবে।"

শেষ কবে খেয়েছিল, এখন আর মনে পড়ে না। কিন্তু চোখের সামনে পরোটা আর আলুর তরকারি দেখে গলার কাছে একটা দলাপাকানো কষ্ট টের পাচ্ছে স্নিগ্ধা। অব্যক্ত অস্ফুট যন্ত্রণা। তার চোখ বেয়ে টপ টপ করে মোটা মোটা জলের ফোঁটা গড়িয়ে পড়ে।

"কাঁদছিস কেন? আলো বিস্মিত, "কী হয়েছে?"

"কিছু না।"

"তবে খাচ্ছিস না যে! খারাপ হয়েছে?"

"না, না।" চোখের জল মুছে হাসল সে। পরোটার কোনা ছিঁড়ে মুখে পুরল, "বাঃ, খুব ভাল।"

আলো সতর্ক চোখে মাপছে স্নিগ্ধাকে। সে অন্যমনস্কভাবে পরোটা মুখে পুরছে। দৃষ্টি বাইরের দিকে।

বাইরে তখন স্কুলের ছাত্রছাত্রীরা কাঁধে ব্যাগ নিয়ে তড়িঘড়ি হেঁটে চলেছে। বিনুনি দুলিয়ে লাফিয়ে ঝাঁপিয়ে মনের আনন্দে চলছে মেয়েরা। পরনে স্কুল ইউনিফর্ম। একজনের হাতের কাগজে সম্ভবত টোপাকুলের আচার। একটা একটা করে খাচ্ছে আর ঠকাস ঠকাস করে আঁটিগুলো ছুঁড়ে ফেলছে এদিকে ওদিকে। সব মিলিয়ে কী আনন্দ! স্নিগ্ধা দীর্ঘশ্বাস ফেলে। এই জীবনটাই বোধহয় সবচেয়ে আনন্দের। কোনও চিন্তা নেই, দুর্ভাবনা নেই। কারও সঙ্গে মানিয়ে চলতে হবে না। বাবা-মায়ের কাছে নিশ্চিন্ত আশ্রয়।

"স্নিগ্ধা, ইজ এভরিথিং অলরাইট? ঋতম কোথায়?"

স্নিগ্ধা আস্তে আস্তে মাথা নাড়ে, "জানি না। এখনও পর্যন্ত কিচ্ছু বলতে পারছি না তোকে।"

"মানে?"

"আমি এখনও কনফিউজড।" সে খাওয়া শেষ করে লাঞ্চ বক্সটা ফেরত দিয়ে দেয়। "ডা. সুরালের ওপর এখন সব নির্ভর করছে। আগে দেখি উনি কী বলেন। তারপর সব বলছি তোকে।"

"আচ্ছা।"

আলো আর প্রশ্ন করে না। প্রশ্ন করার সুযোগও ছিল না। ততক্ষণে ওদের স্টপেজ চলে এসেছে। সে স্নিগ্ধার হাত ধরল। সাবধানে নামাতে হবে তাকে। ডা. সুরালের ক্লিনিকে ঢুকতেই আলো একটু অস্বস্তিবোধ করছিল। রিসেপশনে যারা বসে আছে, তারা বেশির ভাগই গর্ভবতী। কাউন্টারের মেয়েটি আচমকা পাশ থেকে প্রশ্ন করল, "আপনার নাম?"

সে অন্যমনস্ক ভাবে জবাব দেয়, "আলোলিকা ব্যানার্জি।"

"বয়েস?"

"আঠাশ বছর।"

"অ্যাপয়েন্টমেন্ট আছে?"

"হ্যাঁ।"

"কত মাস রানিং?"

পরবর্তী প্রশ্নটা শুনে লাফিয়ে উঠল সে, "এই সেরেছে... আমি না...। আমি... না... ইনি—এ-ই স্নি-গ্ধা।"

স্নিগ্ধার হাসি পেয়ে গিয়েছিল। সে কোনওমতে হাসি চেপে কাউন্টারের দিকে এগিয়ে যায়। কাউন্টারের মেয়েটির কাছে গিয়ে সমস্ত ফর্ম্যালিটি সেরে এল সে। যদিও ভিজিটের টাকাটা আলোই সাবমিট করল। মেয়েটি বলল, "বসুন, ডক্টর একটু বাদেই আপনাদের ডেকে নেবেন।"

ডাক পড়তে অবশ্য বিশেষ সময় লাগল না। ডা. সুরাল আলোকে খুব ভালভাবেই চেনেন। আলো ওদের কাগজের স্বাস্থ্যের পাতায় বেশ কয়েকবার ওঁর ইন্টারভিউ নিয়েছে। ডা. সুরাল খুব মৃদু অথচ মিষ্টি স্বরে বললেন, "বলো, কী প্রবলেম?"

ওঁর এই 'তুমি' সম্বোধন খুব আপন ঠেকল। কিছু কিছু ডাক্তার প্রথম দর্শনেই পেশেন্টের বিশ্বাস জিতে নেন। মনে হয়, ওঁর দ্বারা সব সম্ভব। ডা. সুনীতা সুরালও ঠিক তেমন। স্নিগ্ধা অকপটে নিজের শারীরিক অবস্থার কথা জানায়। সমস্ত ডিটেল্‌সের কথা জানিয়ে শেষে একটি মিথ্যে কথা জুড়ে দেয়, "ইদানীং পেটে মাঝে মধ্যেই খুব পেন হয়। ঠিক বুঝতে পারছি না।"

"কোন ডক্টরের আন্ডারে আছ তুমি?"

"ডা. পতিতপাবন সিনহা।"

"ওরে বাবা!" ডা. সুরাল হাসলেন। "ওঁকে ছেড়ে তুমি আমার কাছে এসেছ! কী সর্বনাশ! ডা. সিনহা কিছু প্রেসক্রাইব করেছেন? ওঁর প্রেসক্রিপশন বা প্রিভিয়াস রিপোর্ট কিছু আছে তোমার কাছে?"

স্নিগ্ধা অসহায়ভাবে মাথা নাড়ল। সে কিছুই নিয়ে আসতে পারেনি। রিপোর্টগুলো সব ঋতমের কাছে। নিজস্ব ওয়ার্ডরোবে রেখে লক করে গেছে। সে শত চেষ্টাতেও খুলতে পারেনি।

"এটাই তো ভুল করো তোমরা। আগে কোনও মেডিকেশন ছিল কি না, তোমার মেডিক্যাল হিস্ট্রি না জানলে আমি এগোব কী করে? ঠিক আছে, চলো আগে আল্ট্রাসাউন্ড করে নিই। বেবির পজিশন আর কন্ডিশনটা একটু দেখে নেওয়া যাক। তারপর প্রয়োজন হলে আরও কিছু টেস্ট করতে হবে।"

স্নিগ্ধার বুক শুকিয়ে আসে। এতক্ষণ যে-ভয়টা ছিল না, এবার সেই ভয়টাই অক্টোপাসের মতো চতুর্দিক দিয়ে আঁকড়ে ধরেছে তাকে। ডা. সুরালও যদি একই কথা বলেন? যদি ঋতমদের কথাই সত্যি হয়? যদি তার অনাগত সন্তান মৃতই হয়? যদি ফোনটা নেহাতই ফাজলামি হয়ে থাকে?

স্নিগ্ধার পেটে জেল মাখিয়ে তার ওপর আলট্রাসাউন্ড প্রোব বোলাচ্ছেন ডা. সুরাল। ভুরু কুঁচকে তাকাচ্ছেন মনিটরের দিকে। মনিটরে তখন নীলচে আলো। তার মধ্যে কিছু একটা দেখা যাচ্ছে বটে, কিন্তু সে ছবি উদ্ধার করার ক্ষমতা স্নিগ্ধার নেই। সে তখন বিছানায় শুয়ে ভাবছে— তবে কি শেষ আলোটুকুও নিভে যেতে চলেছে। এর পরই কি ডা. সুরাল তার মমতা-মাখানো কণ্ঠে বলবেন, "ইওর বেবি ইজ নো মোর!"

"হয়ে গেছে।" ডক্টর আবার ফিরে গেছেন তাঁর কেবিনে। শাড়ি গুছিয়ে স্নিগ্ধাও ভয়ে ভয়ে চলে এল। বসল তাঁর সামনের চেয়ারে।

"পেট ব্যথাটা কত দিন ধরে হচ্ছে?"

"এই কয়েক দিন ধরে"...

চিন্তিত লাগল ডা. সুরালকে। স্নিগ্ধা কেবিনের চিলড এসির মধ্যেও ঘামছে। হৃৎপিণ্ড এত দ্রুত চলছে যে, মনে হচ্ছিল, এখনই সে হার্টফেল করবে। লাস্ট ভার্ডিক্ট শোনা অবধি হয়তো বেঁচে থাকবে না। কোনওমতে বলল, "ডক্টর আমার বাচ্চা কি...!"

"বেবি ইজ পার্ফেক্টলি অলরাইট।" ডা. সুরালের কণ্ঠে যেন ভগবান বলে উঠলেন, "কন্ডিশন, গ্রোথ, পজিশন— এভরিথিং ইজ ফাইন। নো কমপ্লিকেশনস।"

এতক্ষণ আলো মুখ বুজে বসেছিল। এবার হঠাৎ একটা বেয়াড়া প্রশ্ন করে বসল, "ডক্টর, মাসি হওয়ার সুবাদে একটা বাজে প্রশ্ন করব?"

ডা. সুরাল জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকালেন।

"ইয়ে... মানে... মানে, হচ্ছে গিয়ে... আমার বোনপো হবে? না বোনঝি?"

"হোয়াট রাবিশ আলোলিকা!" তিনি চোখ পাকালেন। "তোমরা আজকালকার মেয়ে হয়ে এরকম কথাবার্তা বলছ! ছেলে কি মেয়ে— সে তো কয়েক মাস পরেই জানতে পারবে!"

আলো আবদেরে সুরে বলে, "নিছকই কৌতূহল। আপনি তো দেখেছেন। জানেনও নিশ্চয়ই। বলুন না।"

ডা. সুরাল বললেন, "নো। এটা বে-আইনি। আমি এভাবে বলতে পারি না, ইটস আনএথিক্যাল।"

আলো ব্যাজার মুখ করে বসে থাকে। ডক্টর খসখস করে প্রেসক্রিপশন লিখছেন। স্থাণু হয়ে বসেছিল স্নিগ্ধা। তবে তো তার বাচ্চা ঠিকই আছে। সে মরেনি! মা-কে ছেড়ে চলে যায়নি! তবে ঋতম মিথ্যে বলল কেন? ভাবতেই শিউরে উঠল স্নিগ্ধা! কী সর্বনাশ হতে যাচ্ছিল তার...

"ডোন্ট ওরি," ডা. সুরাল তার কাঁধে হাত রাখলেন, "এভরিথিং ইজ অলরাইট। শুধু এই টেস্টগুলো একবার করিয়ে নিয়ে নেক্সট উইকে রিপোর্টস দেখিয়ে যেও। আর একদম স্ট্রেস নেবে না।" বলতে বলতেই হেসে বললেন, "বেবি ইজ ফাইন। হেলদি। চিন্তার কোনও কারণ নেই।"

ক্লিনিক থেকে বাইরে বেরিয়ে এসে আলো ব্যাজার মুখে বলে, "সবই তো বুঝলাম। কিন্তু ডক কিছুতেই ছেলে না মেয়ে জানালেন না।"

স্নিগ্ধার মুখ কঠিন হয়ে গিয়েছিল। ডা. সুরাল না বললেও সে

নিঃসন্দেহ যে, তার গর্ভের ভ্রূণটি কন্যাসন্তান। পুত্রসন্তান হলে ঋতমরা মিথ্যে কথা বলে তাকে অ্যাবর্ট করার চেষ্টা করত না। অতএব যে আসছে, সে ছেলে নয়— মেয়ে।

আট

ধনলক্ষ্মী জেমস অ্যান্ড জুয়েলারির অফিসে এসেও ঋতম শান্তিতে থাকতে পারছিল না। আজ সকালের ঘটনাটা বার বার মনে পড়ে যাচ্ছে তার। স্নিগ্ধা মুখে কিছু বলেনি। কিন্তু তার বডি ল্যাঙ্গোয়েজ বলছিল যে, সে সহজে থামবে না। অফিসে আসার পর থেকেই সে একনাগাড়ে স্নিগ্ধাকে মোবাইলে ট্রাই করে যাচ্ছে। কিন্তু বার বার টেলিফোনে খটোমটো বাংলায় একটি নারী কণ্ঠস্বর একই ডায়লগ দিচ্ছে— "আপনি যে-নম্বরে ফোন করছেন, সেই ফোনটি এই মুহূর্তে উপলব্ধ নেই!" কী যে স্টাইল হয়েছে এদের। তিনটে ভাষায় তিন রকম করে ভাষণ দেবে!

ধৈর্য রাখতে না পেরে সে শেষ পর্যন্ত বাড়িতেই ফোন করল। বেশ কিছুক্ষণ বাজল। তারপরই ও প্রান্তে মায়ের গলা—

"হ্যালো।"

"মা, আমি ঋতম।"

"বলো।"

"স্নিগ্ধা কোথায় মা?" ঋতম একটু ক্যাজুয়ালিই বলে, "ওর ফোনে ট্রাই করছি। কিন্তু পাচ্ছি না।"

"স্নিগ্ধা বাড়িতে নেই।" মা ভীষণ ঠান্ডা গলায় বলেন, "হয়তো বাইরে গেছে।"

ঋতম এবার উত্তেজিত। বিরক্তি মাখানো স্বরে বলে, "বাইরে গেছে! এই শরীর নিয়ে বাইরে কী করে যায়! তোমরা একটু চোখে চোখে রাখতে পার না?"

"স্নিগ্ধা তো বাচ্চা মেয়ে নয় ঋতম যে, চোখে চোখে রাখব!" মা ঠিক তেমনই ঠান্ডা গলায় বললেন, "তবু নজর রেখেছিলাম। যেই একটু ঠাকুরঘরে গিয়েছি, সেই ফাঁকেই..."

"হ্যাং ইওর ঠাকুরঘর!" সে হিসহিস করে বলল, "মা, তুমি বুঝতে পারছ না। স্নিগ্ধা যদি ওই মহিলা গাইনির কাছে যায়, তবে ওর বুঝতে কিছু বাকি থাকবে না। আমি তো বুঝতেই পারছি না, লাস্ট মোমেন্টে কী করে ও ডিসিশন পাল্টাল! তোমরা কেউ কি কিছু ওকে বলেছ?"

মায়ের আপাত শান্ত খোলস ছেড়ে এবার রাগের আঁচ বেরিয়ে পড়ল, "আমরা কী বলব? আমরা যা বলব তা কি ও শুনবে? অবাধ্য মেয়ে কোথাকার! পরিবারের মান মর্যাদার কথা ভাবার প্রয়োজনও বোধ করল না। আমাদের সাজেশন নেওয়া তো দূর— নিজের যা ইচ্ছে তাই করছে। কোন এক মহিলা ডাক্তার, তাকে দেখাতে গেছে।"

"মা, তুমি বুঝতে পারছ না।" সে অসহায়ের মতো বলে, "ওই ডাক্তার যদি ওর চেক-আপ করে তবে স্নিগ্ধা সব বুঝতে পারবে। আমরা কী চাইছি তা বুঝতে ওর এক সেকেন্ডও লাগবে না।"

"বুঝলেই বা কী?" মা কঠিন গলায় উত্তর দিলেন, "আমরা যা চাইছি সেটাই ফাইনাল। ওর ইচ্ছে থাক বা না থাক, আমাদের ডিসিশন ওকে মেনে নিতেই হবে। মনে রেখো ঋতম, এত বড় বিজনেস, এত রমরমা কিন্তু একদিনে হয়নি। এ বংশের ছেলেরা একটু একটু করে তৈরি করেছে। তোমার ঠাকুরদার, তোমার বাবার অনেক পরিশ্রমের ফসল। এত দিন ধরে যা চলে আসছে— তার অন্যথা হওয়া কোনওমতেই চলবে না। তোমার ঠাকুমা, আমি মেনে নিয়েছি, স্নিগ্ধাকেও মেনে নিতে হবে। ও কী জানল তা বড় কথা নয়।" বলতে বলতেই তাঁর কণ্ঠস্বর সন্দিগ্ধ হয়ে এল, "ঋতম, তুমি কি স্নিগ্ধাকে ভয় পাচ্ছ?"

ঋতম কী বলবে ভেবে পায় না। স্নিগ্ধাকে সে যত দূর চিনত, তাতে তাকে ভয় পাওয়ার প্রশ্নই ওঠে না। কিন্তু যেভাবে সে আজ সকালে ক্ষীণ প্রতিবাদ জানিয়েছিল, এবং বাড়ির কাউকে না বলেই যেভাবে অন্য ডাক্তারকে দেখাতে চলে গেল— তাতে বেশ বোঝা যায় যে, স্নিগ্ধা মরিয়া হয়ে উঠেছে। সে শান্ত স্বভাবের হতে পারে, কিন্তু অশিক্ষিত নয়। ও কিছু একটা সন্দেহ করেছে। কিন্তু কীভাবে সন্দেহ করল!

গোটা ব্যাপারটাই ঋতমের দুর্ভেদ্য প্রহেলিকার মতো লাগে। সে কী করবে ভেবে পাচ্ছে না। কিছুক্ষণ আগেই ডা. সিন্‌হা ফোন করেছিলেন। তিনি সমস্ত ব্যবস্থা করে রেখেছেন। ঋতমদের আসতে দেরি হচ্ছে দেখে ফোন করে জানতে চাইলেন, "কী ব্যাপার? আপনারা এত দেরি করছেন কেন?"

সে আমতা আমতা করে গোটা ঘটনাটা জানায়। স্নিগ্ধা সেকেন্ড ওপিনিয়ন নিতে চায় শুনে তিনিও ঘাবড়ে গেলেন— "হো-য়া-ট? সেকেন্ড ওপিনিয়ন! লুক মি. জুনিয়র রায়চৌধুরী, আমি আপনার বাবার আমলের ফিজিশিয়ান। আপনার জন্মও আমার হাতেই হয়েছে। তাই কাজটা করতে রাজি হয়েছিলাম। আপনাদের উদ্ধার করতে গিয়ে এই বুড়ো বয়েসে আমি হাতে হাতকড়া পরতে রাজি নই। নেভার।"

"ডা. সিন্‌হা..." ঋতম বোঝানোর চেষ্টা করে, "ব্যাপারটা অত সিরিয়াস নয়। স্নিগ্ধার হঠাৎ হয়তো কোনও কারণে মনে হয়েছে। উই উইল কনভিন্স হার।"

"ইউ মাস্ট।" ডা. সিন্‌হা চেঁচিয়ে ওঠেন, "আপনি কি জানেন, শুধুমাত্র আপনার বাবার অনুরোধে আমি এই ইললিগ্যাল কাজটা করতে রাজি হয়েছি। মায়ের অজান্তে অ্যাবর্শন ইললিগ্যাল। এখন যদি কোনওভাবে ব্যাপারটা জানাজানি হয়ে যায়— তবে হোয়াট অ্যাবাউট মাই রেপুটেশন? এখন আপনার মিসেস সেকেন্ড ওপিনিয়ন চাইছেন। এর পর যদি উনি পুলিশের দ্বারস্থ হন, তবে কী হবে?"

"এমন কিছু হবে না ডা. সিন্‌হা। স্নিগ্ধা তেমন মেয়েই নয়। আপনি শুধু আমাদের কয়েকটা দিন সময় দিন। স্নিগ্ধার যা শারীরিক অবস্থা, তাতে ও একা একা কোনও ডাক্তারের কাছে যেতে পারবে না। আমি আপনাকে গ্যারান্টি দিচ্ছি, এমন কিছু হবে না।"

ডা. সিন্‌হাকে তো কোনওমতে ঠান্ডা করা গেল। কিন্তু যাকে চিরকাল শান্ত, শিষ্ট, নির্বিবাদী বলে জেনে এসেছে, সেই মেয়ে বাড়ির লোককে লুকিয়ে ডাক্তার দেখাতে চলে গেছে। কী করে সম্ভব!

"স্যার!" ঋতমদের এক নতুন কর্মী দরজার ফাঁক দিয়ে উঁকি মারছে। "আসব?"

"ইয়েস?"

কর্মীটির হাতে মিষ্টির বাক্স। ঋতমের হাতে ধরিয়ে দিয়ে বলল, "এটা আপনার জন্য।"

ঋতম একটু অপ্রস্তুত হেসে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকায়। লোকটি লাজুক হেসে বলে, "আমি সম্প্রতি বাবা হয়েছি স্যার। তাই।"

"ও! ওহ্।" সে তাড়াতাড়ি মুখের চিন্তার ভাঁজগুলো মুছে ফেলেছে। "কনগ্র্যাটস! কী হল?"

"মেয়ে হয়েছে স্যার।" তার মুখে স্বর্গীয় আনন্দ ভেসে উঠল। "একদম ওর মায়ের মতো সুন্দর। আমার চেহারা তো দেখছেন। কালো কুষ্টি দাঁড়কাকের মতো। মেয়েটা আমার একদম ফুটফুটে ফর্সা। ভুরু দুটো টানাটানা। খুব সুন্দর হয়েছে স্যার। সবে এক সপ্তাহ বয়েস হয়েছে। আমি ছুটি হলেই একদম দৌড়তে দৌড়তে সটান বাড়ি। নো আড্ডা, নো গল্প, নো ক্লাব। আমি শুধু আমার মেয়েকে দেখি। ও যে হাসে তাই দেখেই শান্তি।"

লোকটি তাদের কর্মী। ঋতম তাকে দেখেছে। কিন্তু নাম জানে না। কখনও সেভাবে কথা হয়নি। কিন্তু আজ তার উদ্ভাসিত মুখের দিকে তাকিয়ে মুহূর্তের জন্য মনে হল, কী প্রয়োজন লিঙ্গ ভেদাভেদের! হোক না মেয়ে— সে তো ঋতমের ঔরসজাত! তারই সন্তান। তারই আত্মজা!

"স্যার।"

লোকটি কখন বেরিয়ে গেছে তার খেয়ালই নেই। সে তখন কল্পনা করছিল দুটো গোলগোল নরম হাত ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে একটি বাচ্চা মেয়ে নাচছে! হাতে সোনার বালার চিক চিক। গায়ে গোলাপি রঙের রেশমের ঝালর দেওয়া ফ্রক। পায়ে সোনার নূপুর রিনরিন করে

উঠেছে। আপেলের মতো গালদুটো সবার গালে ঠেকিয়ে নাচের মধ্যেই কখনও কখনও চলছে আদরপর্ব! কী আশ্চর্য! মেয়েটির রেশমের মতো চুল সূর্যালোকে সোনালি! বাদামি চোখদুটোয় দুষ্টুমির ঝিলিক। ঠোঁটদুটো একেবারে গোলাপের কুঁড়ি। সে যেন মর্ত্যমানবী নয়—কোনও দেবশিশু!

"স্যার।"

"উঁ?"

চিন্তান্বিত মুখে তার সেক্রেটারি এলা ঢুকল। তার দিকেও সম্মোহিত চোখে তাকিয়েছিল ঋতম। কী স্মার্ট! কী এফিসিয়েন্ট! ইন্টারভিউতে অন্তত ত্রিশজন পুরুষকে টেক্কা দিয়ে চাকরিটা একরকম জবরদখল করে নিয়েছে এলা। কোনও সুপারিশ ছিল না। অথচ চাকরিটা সে পাবে, যেন আগে থেকেই জানত। এ ও তো কারও না কারও মেয়ে। তবে কেন আগে এভাবে ভাবেনি ঋতম!

"স্যার, একটা সমস্যা হয়েছে।" এলা বলল, "মি. আগরওয়াল এসেছেন। আপনার সঙ্গে মিট করতে চাইছেন।"

"কিন্তু ওঁর তো অ্যাপয়েন্টমেন্ট নেই।"

"আমরা সে কথা বলেছি স্যার," এলা কুণ্ঠিতভাবে বলে, "কিন্তু উনি কিছুতেই শুনছেন না। রিসেপশনে দাঁড়িয়ে হল্লা করছেন। বলছেন ওঁকে ঠকানো হয়েছে। রীতিমত সিন ক্রিয়েট করছেন স্যার।"

ঋতম এক মুহূর্ত চিন্তা করে। মি. অতীশ আগরওয়াল ওদের খুব বড় কাস্টমার। ভদ্রলোকের পাঁচ মেয়ে ও তিন ছেলে। প্রত্যেকের জন্মদিন থেকে শুরু করে বিয়ে, ধনতেরাস অবধি সব জুয়েলারি ওদের শোরুম থেকেই যায়। বছরে প্রায় কোটি টাকার কেনাকাটা করেন। হিরে, চুনি, পান্না কিছুই বাদ যায় না। এবার ওঁর ছোট মেয়ের বিয়েতে সোনা, হিরে, জড়োয়া সেট মিলিয়ে প্রায় পাঁচ কোটি টাকার গয়নার অর্ডার দিয়েছেন।

"ওঁর অর্ডার পাঠানো হয়নি?"

"হ্যাঁ স্যার।" মাথা নিচু করে জবাব দেয় এলা, "রাইট টাইমেই পাঠানো হয়েছে।"

"তবে আবার কী হল?" ঋতম একটু ভেবে নিয়ে বলে, "ঠিক আছে। ওঁকে এ ঘরেই পাঠিয়ে দাও।"

"ওকে স্যার।"

মিনিট পাঁচেকের অপেক্ষা। তারপরই জুতো মশমশিয়ে ঘরে ঢুকলেন মি. আগরওয়াল। কোনও রকম সৌজন্যমূলক বার্তাবিনিময় না করেই উগ্র কণ্ঠে বললেন, "মি. রায়চৌড়ি, হ্যাভ আই গিভেন ইউ অ্যান ইনসাফিশিয়েন্ট অ্যাডভান্স? আপনারা যা প্রাইস বলেছেন, তা নিয়ে দরদাম করেছি?"

ঋতম বুঝে উঠতে পারল না যে, এসব কথা উঠছে কেন! সে বুঝল, যে কোনও কারণেই হোক, ভদ্রলোক ভীষণ চটে আছেন। সে বলে, "হোয়াট হ্যাপেন্ড মি. আগরওয়াল? এনি প্রবলেম?"

"ইউ আর ইন আ প্রবলেম!" তার দিকে আঙুল তুলে শাসানির সুরে বললেন ভদ্রলোক, "আমি আপনার ওল্ড কাস্টমার! আমার সঙ্গে মাঙ্কি বিজনেস করলে বিজনেস বরবাদ হয়ে যাবে মি. রায়চৌড়ি।"

ঋতম তখন পুরোপুরি হতভম্ব! বুঝেই উঠতে পারে না ভদ্রলোকের হঠাৎ হল কী!

"আমার মেয়ের শাদির জন্য জুয়েলারির অর্ডার দিয়েছিলাম। বলেছিলাম, নেকলেস পুরা ডায়মন্ডের হবে। আপনারা পাঁচ করোড় চেয়েছেন। দিয়েছি। কিন্তু, এটা কী রাবিশ পাঠিয়েছেন আপনারা!"

তাঁর পকেট থেকে নেকলেসের বাক্সটা বেরিয়ে এল। সেটাকে প্রায় ঋতমের মুখের ওপর ছুড়ে দিয়ে বললেন তিনি, "এর ডায়মন্ডগুলো সব লো স্ট্যান্ডার্ডের! আপ টু স্ট্যান্ডার্ড নয়। ইয়ে পহেনকে বিদা হোগি মেরি বেটি! বেওকুফ সমঝকে রাখ্যা হ্যায় মুঝে!"

এবার মেজাজের পারা ঋতমেরও চড়ল। সে রুমাল দিয়ে মুখ মুছে বলে, "লুক মি. আগরওয়াল, আপনার প্রেস্টিজের সঙ্গে আমাদের প্রেস্টিজও জড়িত। মে বি, কোনও রকমের মিসআন্ডারস্ট্যান্ডিং...!"

"মিসআন্ডারস্ট্যান্ডিং?" ভদ্রলোক চিড়বিড়িয়ে ওঠেন, "ইউ কল ইট জাস্ট আ মিসআন্ডারস্ট্যান্ডিং? আই কল ইট চিটিং। ধোঁকাদারি!"

"হাউ ডেয়ার ইউ টক টু মি লাইক দিস!" এবার ফুঁসে ওঠে ঋতম, "গোটা ঘটনাটা না জেনে আপনি এইভাবে আমাদের দিকে আঙুল তুলতে পারেন না। ইফ দেয়ার ইজ় এনি মিসআন্ডারস্ট্যান্ডিং, উই উইল ফিক্স ইট।"

"বিশোয়াস! এই ওয়ার্ডটা বোঝেন? পারবেন সেটা ফিক্স করতে?" আঙুল তুলে বললেন তিনি, "আই অ্যাম নট গোয়িং টু ট্রাস্ট ইউ ফারদার। অ্যাডভান্সের টাকা ফেরত দিন। আই ডোন্ট ওয়ান্ট এনি জুয়েলারি।"

"সেটা সম্ভব নয় স্যার। আমাদেরও কিছু রুলস অ্যান্ড রেগুলেশনস আছে। অ্যাডভান্স ইজ় নট রিফান্ডেবল। আপনি এত দিনের পুরনো কাস্টমার। আপনার জানা উচিত যে, অর্ডারি জুয়েলারির ক্ষেত্রে আমরা অ্যাডভান্স ফেরত দিই না। তার চেয়ে আপনি রিপ্লেস করতে পারেন।"

"ওয়েট... ওয়েট... আমি কী করতে পারি— ইউ ডোন্ট নো," শাসানির সুরে বললেন তিনি, "সি ইউ ইন কোর্ট।"

মি. আগরওয়াল চলে যেতেই এলাকে ডেকে পাঠাল ঋতম। এলা অবশ্য এ বিষয়ে বিশেষ আলোকপাত করতে পারল না। সে জানায়, "মি. আগরওয়াল নিজেই ডিজ়াইন পছন্দ করেছিলেন স্যার। কত বড় হিরে বসবে সে বিষয়েও বলেছিলেন। তাতেই যা এস্টিমেট হয়েছে তার থেকেই অ্যাডভান্স নিয়েছি আমরা। কোনও ভুল তো হয়নি।"

"এত দিনের বিজনেসে কখনও এমন হয়নি এলা!" সে কপালের ঘাম মুছল, "কোনও কাস্টমার এভাবে আমাদের 'চোর' বলেনি। এত দিনের বিজনেস রেকর্ড একদম সাফসুতরো। তবে আজ কী করে এরকম হল?"

এলা মাথা নিচু করেছে। "আই ডোন্ট নো স্যার।"

"ইফ ইউ ডোন্ট, দেন ট্রাই টু ফাইন্ড আউট।" অক্ষম রাগে টেবিলে একটা ঘুসি মারল ঋতম। এলা ভয় পেয়ে 'ওকে স্যার' বলে দ্রুত গতিতে কেবিন থেকে বেরিয়ে যায়।

শান্তি নেই...শান্তি নেই! বাড়িতে শান্তি নেই। অফিসেও! ঋতম অশান্ত ভাবে কেবিনের ভেতরে পায়চারি করতে থাকে। তার মুখমণ্ডল কঠোর হয়ে উঠছে। কেন? কেন হল এরকম? আগে তো কখনও হয়নি! মি. আগরওয়াল তাদের বহু দিনের কাস্টমার! কারিগরদের অমনোযোগিতা? না 'জলওয়া ডায়মন্ড'-এর ভুল! না...

ভাবতে ভাবতে সেই অমোঘ চিন্তাটাই এল তার মাথায়। না, মা-বাবা ঠিকই বলেন। স্নিগ্ধার গর্ভে যে আশ্রয় নিয়েছে, সে আশীর্বাদ নয়, অভিশাপ! মস্ত বড় অভিশাপ নেমে আসছে রায়চৌধুরী বাড়ির ওপর! দেবশিশু নয় সে, রাক্ষসী— অলক্ষ্মী! জন্মের সূত্রপাতেই ধ্বংসের তাণ্ডব শুরু করে দিয়েছে! এখনই এই! এর পর কী হবে তার ঠিক নেই!

সে অশান্ত ভাবে ফের ডায়াল করল বাড়ির নম্বর। অনেকক্ষণ বাজার পর যথারীতি ফের মা ফোনটা তুললেন।

"হ্যালো?"

"মা?"

"কী হয়েছে?" মায়ের কণ্ঠস্বরে বিরক্তি প্রকট, "বারবার ফোন করছ কেন?"

"স্নিগ্ধা কি ফিরেছে?"

"একটু আগেই ফিরেছে।"

ফোন কেটে দিল ঋতম। আর দেরি নয়। এখনই তাকে স্নিগ্ধার মুখোমুখি হতে হবে। একটা বোঝাপড়া অত্যন্ত জরুরি। স্নিগ্ধাকে বোঝাতে হবে যে, রায়চৌধুরী বাড়ির প্রথম সন্তান কিছুতেই মেয়ে হতে পারে না। তার কন্যাসন্তান আদতে সর্বনাশ ডেকে আনছে। ও অপয়া, অলক্ষ্মী! বাচ্চাটাকে নষ্ট করতেই হবে। যে কোনও মূল্যে। যদি সোজা পথে না হয়, তবে ছলে, বলে—কৌশলে!

ভাবতে ভাবতেই ঋতমের মুখ কঠিন হয়ে ওঠে।

নয়

"কী যে স্বামী-ইস্ত্রি, কিছুই বুঝি না!"

অ্যাপার্টমেন্টের বাইরে দুই কাজের মেয়ের মধ্যে চলছে পিএনপিসি।

"বুঝলি? ব্যাটাছেলেটা কিছুই করে না। বাড়িতেই সর্বক্ষণ ব্যোম ভোলানাথ হয়ে বসে থাকে। আর মেয়েছেলেটার নাকি রাতদুপুর অবধি আপিস চলে! আবার ডাকার কী ছিরি! দুজনেই দুজনকে 'তুই', 'তুই' করে। আমাদের ঘরের লোকরাও আমাদের 'তুই' বলে। কিন্তু আমরা কি তুই-তোকারি করি? কোথাও দেখেছিস মেয়েছিলেরা বরকে 'তুই' করে ডাকছে!"

"বলিস কী?" দ্বিতীয়জন চোখ গোলগোল করে বলে, "তোর বউদি দাদাকে 'তুই' বলে! কী অনাছিষ্টি!"

"কী জানি বাবা!" সন্ধ্যা হাত উল্টায়। "বুঝি না এ কেমন পেম!"

সে আরও কিছু বলতে যাচ্ছিল। কিন্তু তার আগেই পি এন পি সি ধামাচাপা পড়েছে! পাখির আজ তাড়াতাড়িই অফিসের কাজ হয়ে গিয়েছিল। তাকে আসতে দেখেই দুই মূর্তিমতী চুপ করে গেছে।

ওদের কথাবার্তা যে পাখির কানে যায়নি, তা নয়। কিন্তু সে এসবের তোয়াক্কা করে না। যখন প্রদীপকে বিয়ে করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল তখনই জানত যে, এসব কথা শুনতে হবে। তাই আশেপাশে যতই গুঞ্জন উঠুক না কেন, সে তার সিদ্ধান্তে, কর্তব্যে অবিচল। সমাজের সমালোচনা হেসে উড়িয়ে দিতে শিখে গেছে পাখি। তার প্রেমিক পুরুষ তো সঙ্গেই আছে। পৃথিবীর আর কোনও সমস্যাকে সে আমল দেয় না।

আজ কাজের খুব প্রেশার ছিল। তার ওপর বুলডগ বুড়ো আজ বিনা কারণেই প্রচুর দাঁত খিঁচিয়েছে। পাখির সন্দেহ, লোকটার বত্রিশ পাটি দাঁতই বাঁধানো! নয়তো এত দাঁত খিঁচোবার পরও দাঁতগুলো ঠিকঠাক থাকে কী করে! এমনিতেই হতভাগা পাখির একটা গুরুত্বপূর্ণ খবরকে ছেঁটে দিয়েছে। তার বদলে স্পোর্টসের একটা খবর বড় বড় অক্ষরে হেডলাইনে যাবে! অথচ কী কষ্ট করেই না স্টোরিটা পেয়েছিল সে! বর্ধমানের একটা প্রত্যন্ত গ্রামে একটা লোক তার দুই বড় মেয়ে, সদ্যোজাত শিশুকন্যা আর বউকে কুপিয়ে কুপিয়ে খুন করেছে। কারণ কী? না, বউটা পুত্রসন্তানের জন্ম দিতে পারেনি! তিনবার চেষ্টার ফল তিনটে কয়লার টুকরো! হিরের টুকরোর জন্ম দেওয়ার ক্ষমতা না থাকা ক্ষমার অযোগ্য অপরাধ। তাই আইনের তোয়াক্কা না করেই লোকটা গোটা পরিবারকে খতম করে ফেলেছে!

খবরের কপিটা দিতেই এডিটরের ভুরু কুঁচকে গেল। "হোয়াট রাবিশ পাখি! এটা কী খবর! আমি তোমায় ক্রিসপি, স্টানিং কিছু খুঁজতে বলেছিলাম।"

"যথেষ্ট ইম্পর্ট্যান্ট খবর স্যার!" পাখি বলল, "এখনও এমন কাণ্ড হয় এটাই তো আশ্চর্য!"

"আশ্চর্যের কিছু নেই," তিনি কপিটা সরিয়ে রেখে বললেন, "এ তো প্রায়ই হয়ে থাকে! বিশ্বাস না হলে লাইব্রেরিতে গিয়ে দ্যাখো। বেশি নয়, দু''তিন মাসের পুরনো কাগজ ঘাঁটলেই দেখবে, প্রায় প্রতি সপ্তাহেই এমন একটা খবর কাগজের কোথাও না কোথাও আছে।"

পাখি চুপ করে গিয়েছিল। বুড়ো বদমেজাজি হলে কী হবে, মহা ঘুঘু আছে! লোকটা যেসব কথা বলে, তার মধ্যে যথেষ্ট অথেন্টিসিটি থাকে। কোন সালের, কোন ডেটের পেপারে কী ছিল— সব মুখস্থ! সে আস্তে আস্তে বলে, "আমাদের কি এ বিষয়ে কিছুই করার নেই স্যার?"

"কী করব?" তিনি পেপারওয়েটটাকে ঘোরাতে ঘোরাতে বললেন, "যা করার তা তো করছিই। খবরের কাগজে এ নিয়ে কম লেখালেখি হয়েছে? আমরা মহিলা প্রধানমন্ত্রী দেখেছি, মহিলা রাষ্ট্রপতি দেখছি। মহিলা পুলিশ কমিশনার, অ্যাস্ট্রোনট— কী দেখিনি! তারপরও আমাদের দেশে মেয়ে সন্তান মানে বোঝা! এবং কন্যাসন্তানের জন্মের জন্য গর্ভবতী মহিলাটিই দায়ী! এই ধারণা এ দেশের মজ্জায় মজ্জায় ঢুকে গেছে।"

"এর জন্য কি অশিক্ষা দায়ী নয়?"

"উঁহু!" তিনি মাথা নাড়লেন, "অশিক্ষা নয়, কুশিক্ষা। তোমার কী ধারণা? শুধুমাত্র অশিক্ষিত পরিবারেই কন্যাভ্রূণ হত্যার মতো কেলেঙ্কারি ঘটে? শিক্ষিত, সম্ভ্রান্ত পরিবারেও এমন কাণ্ড হয়। পার্থক্য শুধু এইটুকু যে, অশিক্ষিত, অভাবী পরিবার ঘটনাটাকে ধামাচাপা দেওয়ার ক্ষমতা বা বুদ্ধি রাখে না। আর শিক্ষিত, সম্ভ্রান্ত পরিবার সেই ক্ষমতা রাখে। ব্যস।"

এডিটর বুড়োর কথা শোনা ইস্তক তার মাথায় ইস্যুটা ঘুরঘুর করছে। সত্যিই কি শিক্ষিত পরিবারেও কন্যাভ্রূণ হত্যার মতো বে-আইনি কাজ হয়? যখন সভ্যতা ক্রমশই আধুনিক থেকে আধুনিকতর হয়ে উঠছে, যখন প্রযুক্তির হাত প্রায় আকাশ ছুঁতে চলেছে, তখনও এমন আদিম প্রবৃত্তি মানুষের মনে সাপের মতো কালো কুণ্ডলী পাকিয়ে চলেছে! বিশ্বাস হয় না... বিশ্বাস হয় না!

এমনিতে অফিসের ক্লান্তি তো ছিলই। তার উপর চিন্তার ভার। ভাগ্য ভাল তাদের অফিসের একটি ছেলে আজ তাকে লিফট দিয়ে দিয়েছে। নয়তো ভিড়-ভাট্টা ঠেঙিয়ে আসতে প্রাণ যেত। এই মুহূর্তে সে একটা পরিপাটি স্নান চায়। তারপর গরম এক কাপ কফি। এখন সন্ধ্যা হয়ে আসছে। ফ্ল্যাটের দক্ষিণ খোলা ঘরটায় সন্ধ্যার মিষ্টি হাওয়া এসে আছড়ে পড়ে। বড় বড় দুটো জানলা থাকার দরুন ঘরটা ভীষণ খোলামেলা। এই দক্ষিণের ঘরটা দেখেই ফ্ল্যাটটা পছন্দ করেছিল পাখি। একটা দুষ্টু, ঝাঁকড়াচুলো গাছও দাঁড়িয়ে আছে জানলার একদিকে। হাওয়ার দাপটে তার পাতা খস খস করে নড়ে ওঠে। তার ডালপালায় যখন সূর্যাস্তের কাঁচা হলুদ রঙ এসে পড়ে, তখন তাকে আর সাধারণ গাছ বলে মনে হয় না। মনে হয় রূপকথার সেই সোনালি গাছ— যার পাতায় পাতায় সোনালি আলো উদ্ভাসিত হয়ে থাকে! যার বুকে আশ্রয় নেয় ঝলমলে ফিনিক্স!

লিফট-এ উঠতে উঠতে সেই ঘরটার কথাই ভাবছিল পাখি। ওই ঘরটায় এক কাপ কফি নিয়ে বসতে পারলে সে এখন বাঁচে। সারাদিনের ব্যস্ত শিডিউলে হাঁফিয়ে উঠেছে। এখন একটু শান্ত পরিমণ্ডল— রবীন্দ্রসংগীত, কফি আর দক্ষিণের হাওয়া! আঃ, বড় শান্তি!

কিন্তু সে শান্তি বোধহয় কপালে নেই পাখির। ফ্ল্যাটের দরজা খুলে ভেতরে ঢুকতেই এক ঝলক আঁশটে গন্ধে তার দম বন্ধ হয়ে আসার উপক্রম! কাঁচা ডিমের গন্ধ! তার সঙ্গে ড্রয়িংরুমের চতুর্দিকে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা ডিমের খোসা। দেখে মনে হয়, এখানে বসে কেউ বোধহয় প্রায় এক ডজন কাঁচা ডিম ভেঙেছে!

পাখির চক্ষু চড়কগাছ! তার ঘরের এ কী দশা! মাথাটা গরম হয়ে গেল। সে উত্তেজিত হয়ে ডাকল, "দীপ... দী—প!"

প্রদীপ কিচেন থেকে বেরিয়ে আসে। তার মূর্তিটাও দেখার মতন! দু''হাত কাঁচা ডিমে মাখামাখি। মুখে, গালে ডিমের হলদে ছোপ! হল কী, অ্যাঁ? সে রূপচর্চা করছে না কি! তাও এতগুলো ডিম ভেঙে!

পাখি কী বলবে ভেবে পাচ্ছিল না! সে হাঁ করে পতিদেবতার খোলতাই রূপ দেখছে! রাগে তার গা চিড়বিড় করছে। কিন্তু রাগের চেয়েও বেশি ছিল বিস্ময়! তাই কোনও কথাই তার মুখ দিয়ে বেরোল না!

"ওমলেট বানানোর চেষ্টা করছিলাম।" প্রদীপ মাথা নিচু করে উত্তর দেয়, "তোর জন্য।"

রাগে, অধীর উত্তেজনায় পাখি জোরে জোরে শ্বাস ফেলছে। কোনওমতে বলল, "ক'টা ডিম নষ্ট করেছিস তুই?"

প্রদীপের মুখ ম্লান হয়ে আসে। "ফ্রিজে যে ক'টা ছিল..."

গতকালই এক ডজন ডিম এনে রেখেছিল পাখি। তার মানে সবগুলোই! এই মুহূর্তে একটাও বাকি নেই।

ঠোঁট কামড়ে জানতে চায় সে, "আর ক'টা ওমলেট হয়েছে?"

"পারিনি রে।" হতাশ স্বর প্রদীপের, "ইনফ্যাক্ট আমি ওমলেট বানাতে জানি-ই না।"

এবার আর সহ্য হল না। পাখি প্রায় চেঁচিয়েই ওঠে, "পুরো বারোটা

ডিম নষ্ট করার পর তোর মনে হল তুই ওমলেট ভাজতে জানিস না! তোকে এসব করতে কে বলেছিল? কাজ কমাতে না পারিস, বাড়াতে যাস কেন? এখন নোংরা কিচেন, ড্রয়িংরুম— কে পরিষ্কার করবে? তুই করবি? জীবনে কখনও ঝাঁটা ধরেছিস? সারাদিন অফিস করে আসার পর ঘর ঝাঁট দিতে, মুছতে কেমন লাগে জানিস? আমি অনেক রকম ইডিয়ট দেখেছি দীপ...কিন্তু তোর মতো..."

"আমার মতো দেখিসনি," মাথা হেঁট করে বলল প্রদীপ, "তোর দোষ নয়। আমার মা, মামারাও আমার থেকে বড় ইডিয়ট দেখেনি।"

উত্তরটা শুনে পিত্তি জ্বলে গেল পাখির। সে কোনও কথা না বলে হাতের ব্যাগটা ধপাস করে সোফার ওপরে ছুড়ে ফেলল। তারপর বাথরুমে গিয়ে এক গামলা জল আর ন্যাতা নিয়ে ঘর, কিচেন পরিষ্কার করতে বসল।

"আই অ্যাম সরি পাখি," প্রদীপ মিনমিন করে বলে। কিন্তু তার ক্ষমাপ্রার্থনায় বিশেষ কাজ হল না। পাখি মেঝে মুছতে মুছতে উত্তেজিত স্বরে বলল, "তুই এখান থেকে যা দীপ। আমার ভাল লাগছে না।"

"বিশ্বাস কর," সে কাতর স্বরে বলে, "আমি শুধু ভেবেছিলাম... তুই অফিস থেকে টায়ার্ড হয়ে ফিরবি... তোকে যদি একটা ওমলেট করে দিতে পারি... ভেবেছিলাম তুই আসার আগেই ম্যানেজ করে নিতে পারব। আই অ্যাম সরি পাখি..."

"হোয়াট সরি?" রাগে ন্যাতাটা দূরে ছুড়ে ফেলল পাখি। "যা পারিস না তা করতে যাস কেন? ডিমগুলো কি আমি তোর এক্সপেরিমেন্টের জন্য এনেছি? রোজ সকালে দুটো ডিমের পোচ না হলে তোর হয় না! একটা, দুটোর ওয়েস্টেজ সহ্য হয় দীপ। কিন্তু পুরো এক ডজন! ছ'দিনের স্টক! কাল কী খাবি? এখন আমায় এইসব ম্যাসাকার সাফ করে ফের মার্কেটে যেতে হবে! ফিরে এসে ডিনার বানাতে হবে। তুই কি আমায় এক মুহূর্তও শান্তিতে থাকতে দিবি না?"

প্রদীপ অপ্রস্তুত। তোতলাতে তোতলাতে বলল, "আমি মার্কেটে যাচ্ছি... তুই চাপ নিস না।"

"কোনও দরকার নেই। তুই মার্কেটে গিয়ে স্রেফ টাকা নষ্ট করবি। বাজার করেছিস কখনও? জিনিসপত্র চিনিস? আগেরবার একগাদা টাকা খরচ করে পচা ইলিশ এনেছিলি। এবার পচা ডিম আনবি।"

প্রদীপ মুখ নিচু করে সেখান থেকে চলে যায়। ঠিক বলেছে পাখি। কোনও যোগ্যতাই নেই তার। সে বাজারে গেলে দোকানদার ঠকিয়ে দেয়। সংসারে কোনও কাজ করতে গেলে ভণ্ডুল করে ফেলে! কোনও কাজই তার দ্বারা হয় না! আশায় ছিল যে, তার এবারের গল্পটা হয়তো সম্পাদকদের পছন্দ হবে। পাখিরও খুব আশা ছিল। কিন্তু পাখি জানে না, আজই গল্পটা ফেরত এসেছে।

চুপচাপ ঘরে এসে বিছানায় বসে পড়ে সে। অন্যমনস্কভাবে একটা সিগারেট ধরায়। ঘরের চতুর্দিকে পাখির জিনিসপত্র ছড়িয়ে আছে। প্রদীপ আস্তে আস্তে সেগুলোর ওপর চোখ বোলায়। ড্রেসিংটেবিলে থরে থরে প্রসাধনের জিনিসপত্র সাজানো। বাদামি, নীল, কালো রঙের কাজল। সঙ্গে মানানসই আই লাইনার। মাস্কারা, আই শ্যাডো। দামি দামি লিপস্টিক। দামি ক্রিম, পাউডার, পারফিউম। নাইটক্রিম, যা পাখি রোজ রাতে শুতে যাওয়ার আগে মাখে। ওয়ার্ডরোবে তার অসংখ্য কুর্তি, জিনস, শাড়ি, সালোয়ার। লকারে গয়না। কিছু ইমিটেশন, কিছু সোনার!

প্রদীপের কাতর চোখ এর মধ্যেই একটা পরিচিত জিনিস খুঁজছিল। একটা সেফটিপিন বা ক্লিপের পাতা। এমন একটা কিছু, যা সে নিজে পাখিকে এনে দিয়েছে! কিন্তু এই জিনিসের স্তূপের মধ্যে এমন একটা জিনিস নেই, যেটায় প্রদীপের হাতের স্পর্শ আছে। গোটা সংসারটাই এক মুহূর্তের জন্য নির্বোধের হাট মনে হয়! এ এমন একটা জায়গা, যেখানে প্রদীপের কোনও অস্তিত্বই নেই। পাখির জীবনে, যৌবনের শখে তার কোনও জায়গাই নেই! কোনও দিন একটা কিছু কিনে এনে সে পাখির হাতে তুলে দেয়নি। বলেনি, "নে সোনা, এটা তুই চেয়েছিলি না? আমি তোকে দিলাম।"

নাঃ, বলেনি সে। বলতে পারেনি কখনও। দেখেছে পাখি শপিংমলের সামনে দাঁড়িয়ে কাতর দৃষ্টিতে কোনও এক্সক্লুসিভ জুয়েলারি বা শাড়ির দিকে দেখছে। কিংবা তার চোখের সামনেই কোনও কোটিপতির ঘরনি এক্সক্লুসিভ ও অসম্ভব দামি জিনিসটি কিনে নিয়ে চলে গেলেন! পাখির সেদিন আর অন্য কিছু পছন্দই হবে না। ক্লিষ্ট হেসে বলবে, "ভালোই হয়েছে। দশ হাজার টাকার শাড়ি কেনার মানে হয় না। বরং কোনও পলিসিতে ফেলে দিলে বুড়ো বয়েসে চিন্তা করতে হবে না।"

প্রদীপ শুধুই দেখেছে। পাখির আফসোস মাখা কথা শুনেছে। কিন্তু কিছুই করতে পারেনি। শুধু বুঝেছে, পাখির যৌবনের শখেও যেমন সে নেই, তেমনি বার্ধক্যের প্রয়োজনেও থাকবে না। জীবনের প্রতিপদে ক্লান্তিতে, আনন্দে, হতাশায়-বিষাদে পাখি একাই। প্রদীপের সেখানে কোনও জায়গা নেই!

এই 'নেই' হয়ে যাওয়াটা যে কতটা ভয়ঙ্কর, তা হয়তো অন্য কেউ বুঝবে না! মৃত্যুর পরও একটা মানুষের সত্তা জীবিত থাকে, তার সম্পত্তি, তার রেখে যাওয়া জিনিসপত্র নিয়ে যখন কাজিয়া চলতে থাকে, তখনও সেই মানুষটার আলগা অথচ সুদূরপ্রসারী অস্তিত্ব থাকে। কিন্তু প্রদীপের তাও নেই। তবে কি সে আদৌ জীবিতের দলে? না জীবন্মৃত? মায়ের জীবনে ছিল না। এখন পাখির জীবনেও নেই! তবে কি প্রদীপ বেঁচে আছে? আদৌ কি পাখি আর তার সম্পর্ককে জীবিত বলা যায়? না গোটাটাই একতরফা! জোড়াতালি দেওয়া একটা জাহাজ! এ জাহাজ কত দূর চলবে!

সে দুহাতে মুখ ঢাকল। পাখি, তোকে যখন ভালবাসতে যাই, তখন বুঝি—সে যোগ্যতা আমার ছিল না কখনও। তুই যখন আমায় ভালবাসিস, তখন মনে হয় দয়া করছিস! তোর আমাকে ঘৃণা করা উচিত। কিন্তু তুই তা করিস না। আমার তোকে ভীষণ ঘৃণা করতে ইচ্ছে করে। কিন্তু ঘৃণা করতেও ভয় পাই! কারণ কীসের জোরে ঘৃণা করব? সে জোর তোর উপর আমার নেই, কোনওদিন ছিল না পাখি... কোনওদিন না!

দশ

আলোর মোবাইলটা একনাগাড়ে বেজেই চলেছে। আলো জানে ফোনটা কে করছে। এই বিশেষ নম্বরটার জন্য অন্য রিংটোন অ্যাসাইন করা আছে। বাজলেই বোঝা যায় কে ফোন করছে।

কিন্তু সে ফোনটা কিছুতেই তুলবে না। কিছুতেই না!

অন্যান্য দিন বাসের পেট একটু বেশিই ভরা থাকে। গড়িমসি করতে করতে যখন সে স্টপেজে এসে পৌঁছয়, তখন অলরেডি ঝুলন পর্ব শুরু হয়ে গেছে। বাসের পাদানির দখল নিয়েও মারপিট! সেফটিপিনের মতো গোছায় লোক ঝুলছে! জানলায়, দরজায় কালো কালো মাথা! কেউ বেঁকে চুরে, কেউ ত্রিভঙ্গমুরারি হয়ে অ্যাডজাস্ট করছে। আলোর মাঝেমধ্যে মনে হয়, বাস বা ট্রেনের ভেতরেই সংসার পাতলে কেমন হয়? শুনতে খুব রোম্যান্টিক লাগে। কিন্তু মজার কথা হল বাস বা ট্রেনের মধ্যে মানুষের সহনশীলতা অনেক বেশি বেড়ে যায়। ধাক্কাধাক্কি, ঘাম, চাপের মধ্যেও সুন্দর অ্যাডজাস্ট করে নেয়। তিনজনের সিটে আগুপিছু করে চারজনের বসতে কোনও অসুবিধে হয় না। কিন্তু সংসারে সে জো নেই। সেখানে অ্যাডজাস্ট করতেই মানুষের যত আপত্তি!

অন্যান্য দিন বেচারি আলোকে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই বাড়ি ফিরতে হয়। আজ বাস সামান্য ফাঁকা ছিল। কপালগুণে একটা জেনারেল সিট জুটে গেছে। সেখানে জমিয়ে বসতে না বসতেই ফোনটা ফের বাজতে শুরু করল! তিন বছরটা খুব দীর্ঘ সময় নয়। আবার খুব সংক্ষিপ্তও নয়। তবু সেই সময়টুকুই বড় আনন্দে ছিল আলো। চিন্তা-ভাবনা ছিল। দায়দায়িত্বের জোয়াল ঘাড়ের উপর চেপে বসেছিল। কিন্তু তার সঙ্গে প্রেমও ছিল!

ভাবতেই আপনমনে মাথা নাড়ল সে। উঁহু, প্রেম ছিল না। যদি

পুত্রসন্তান হলে ঋতমরা মিথ্যে কথা বলে তাকে অ্যাবর্ট করার চেষ্টা করত না। অতএব যে আসছে, সে ছেলে নয়— মেয়ে।

থেকেও থাকে তবে তা একতরফা। দূর থেকে মরীচিকা দেখে মানুষ যেমন ভাবে যে, গনগনে মরুভূমির মধ্যেও জল আছে, তেমন ভাবেই অজয়ের মধ্যে প্রেম দেখেছিল আলো। কাছে যেতেই ব্যথা পেয়ে দেখল, কোথাও কিছু নেই—একরাশ শুকনো বালি শুধু নিষ্ঠুরভাবে ব্যঙ্গ করছে!

মোবাইলটা ফের বাজছে! সকাল থেকে উনচল্লিশটা মিস কল! যেদিন নিষ্ঠুর কথাগুলো বলেছিল অজয়, তারপর কেটে গেছে গোটা একটা সপ্তাহ। এর মধ্যে একবারও যোগাযোগ করার চেষ্টা করেনি আলো। অজয়ও কোনও ফোন করেনি। আলোর অফিসের চাপ ছিল। কিন্তু কাজের চাপে সে সব ভুলে ছিল বললে মিথ্যে কথা বলা হয়। তিন বছরের প্রেম হোক কি তিন দিনের, সহজে ভোলা যায় না। এর ফাঁকেই আলো চুপি চুপি অফিসের টয়লেটে, বাড়ির বাথরুমে, বিছানায় নিভৃতে অনেকবার নীরবে অশ্রুপাত করেছে। কিন্তু বাড়ির কাউকে কিছু বলেনি। অফিসে একমাত্র পাখি ছাড়া আর কাউকে নিজের ব্যথার কথা বলেনি। নিজের জীবন দিয়ে সে উপলব্ধি করেছে, কখনও নিজের দুঃখের কথা কাউকে বলতে নেই। মানুষ মূলত দুঃখবিলাসী। অন্যের দুঃখের কথা শুনতে ভালবাসে। 'আহা... উহু' করতে ভালবাসে। কিন্তু সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিতে চায় না।

মেয়েদের ব্যাপারে ঘটনাটা একটু আলাদা। প্রেমঘটিত কারণে ব্যথা পেলে মলম-পট্টি হাতে অনেক পুরুষই এগিয়ে আসে। কিন্তু সেই মলম-পট্টির পেছনে নখ-দাঁতও থাকে। একাকিত্বের ফাঁক দিয়ে অনেকেই ঢুকে পড়তে চায়। যদিও দুঃখ ভোলাবার জন্য তারা বড়জোর বিছানা অবধি যেতে রাজি, ছাঁদনাতলায় নয়! তাই ভাঙা বেড়া কখনও কাউকে দেখায়নি সে। দুনিয়ায় শেয়ালের বড় উৎপাত!

ফোনটা বাজতে বাজতেই কেটে গিয়েছিল। কয়েক সেকেন্ডের বিরতি দিয়েছিল। হয়তো রেস্ট নিচ্ছিল। কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থেকেই

আবার বাজতে শুরু করেছে। এবার সাধারণ রিংটোন!

আলো মোবাইলের পর্দায় চোখ রাখে। দিদি ফোন করছে।

"হ্যালো।"

"হ্যাঁ, আলো?" দিদির চিরকালই হড়বড় করে কথা বলার অভ্যাস। আলোকে কোনও কথা বলার সুযোগ না দিয়ে নিজেই বলতে শুরু করল, "তুই কোথায় আছিস? বাড়িতে ফিরেছিস? বাড়িতে না ফিরলে একবার আমাদের বাড়ি হয়ে যা। তোর সঙ্গে জরুরি কথা আছে।"

"খুব আর্জেন্ট?" আলো ক্লান্ত স্বরে বলে, "আমি খুব টায়ার্ড রে। কাল দেখা করলে হয় না?"

"ভীষণ আর্জেন্ট। আমি আর তোর বিক্রমদা ওয়েট করছি। তাড়াতাড়ি আয়।"

আলোর ভুরুতে ভাঁজ পড়ল। এখন আবার কীসের আর্জেন্সি! বিক্রমদাও বাড়িতে আছে। কী এমন দরকার পড়ল যে, দুজনে মিলে তাকে ডাকাডাকি-হাঁকাহাঁকি করছে!

সে বলে, "ঠিক আছে, আসছি।"

স্টপেজে নেমে ডান হাতের গলিটা ধরলে চতুর্থ দোতলা বাড়িটাই দিদিদের। সম্প্রতি বোধহয় নতুন রঙ করিয়েছেন বিক্রমদা। এর আগে সাদা রঙ ছিল। এবার হাল্কা গোলাপি হয়েছে। গেট দিয়ে ঢোকার সময়েই তার্পিন তেলের উগ্র গন্ধটা নাকে এল। আলোর এই গন্ধটা ভাল লাগে। যে কোনও নতুন রঙেই গন্ধটা পাওয়া যায়। বেশ চনমনে একটা ভাব এনে দেয় তার্পিন তেলের গন্ধ। বুঝিয়ে দেয়, এখানে নতুন রঙ লেগেছে। দিদি বোধহয় আলোর অপেক্ষাতেই বসেছিল। সবে ডোরবেলের সুইচে সে হাত রেখেছে, তার আগেই খুলে গেল দরজা। দরজার ফাঁকে উঁকি মারছে দিদির সুখী সুখী, ফুলো ফুলো পুতুলের মতো মুখ।

"আয়।"

জুতো খুলতে খুলতেই আলো টের পেল ভেতরে বিক্রমদা কার সঙ্গে যেন উচ্চ স্বরে কথা বলছেন। হাসির শব্দ হলঘর থেকে দরজা অবধি আসছে।

সে সপ্রশ্ন চোখে দিদির দিকে তাকাতেই দিদি বলল, "অজয় এসেছে।" তার পরেই নিচুস্বরে যোগ করল, "তুই কিন্তু কোনও সিন ক্রিয়েট করবি না!"

অজয়ের নামটা শুনেই রাগ, অদ্ভুত অভিমান এসে তাকে ঘিরে ধরছিল। কেন এসেছে লোকটা? এখানে তার কী দরকার? তাদের মধ্যে যা ছিল, সেই সূত্রটুকু নিজেই তো সেদিন কেটে দিয়েছিল অজয়। তবে এখন কী নিতে এসেছে?

সে শরীরে একটা ঝাঁকুনি দিয়ে ফের চটিটা পরছে দেখে খপ করে তার হাত চেপে ধরেছে দিদি, "বলেছি না, কোনও সিন ক্রিয়েট করবি না। ভেতরে চল।"

প্রচণ্ড অনিচ্ছা নিয়েও শেষ পর্যন্ত ভেতরের ঘরে ঢুকল আলো। সেন্টার টেবিলে থালায় লুচি, ছোলার ডাল, বেগুনভাজা সাজানো। তার দুদিকে অজয় আর বিক্রমদা। অজয়ের সেদিনের তেজ আর নেই। থেকে থেকেই হেঁ হেঁ করে দেঁতো হাসি হাসছে। এমন হাসি সচরাচর তাঁবেদাররা হাসে। "হ্যাঁ স্যার... হেঁ হেঁ হেঁ... ঠিক বলেছেন স্যার... হেঁ হেঁ হেঁ... আপনি বেঠিক বলতেই পারেন না স্যার... হেঁ হেঁ হে।" সে ঘরে ঢুকতেই অজয় তার দিকে একটা প্রফুল্ল দৃষ্টিক্ষেপ করল। হয়তো কিছু বলতও। তাকে সেই সুযোগটুকুও না দিয়ে আলো গটগট করে চলে গেল মোজোর কাছে। মোজো তার একমাত্র বোনপো। ছোটবেলায় 'মাসি' ডাকতে পারত না। বলত 'মাহি'। এখনও তাই ডাকে।

মোজো তখন খুব মন দিয়ে মস্ত বড় এল ই ডি টিভিতে একটা গানের সিকোয়েন্স দেখছিল। 'দিল হ্যায় কি মানতা নেহি'। পর্দায় কচি আমির খান আর পূজা ভাট। যদিও মোজোর এখন 'পোগো' বা 'কার্টুন নেটওয়ার্ক' দেখার কথা। কিন্তু টম অ্যান্ড জেরি ছেড়ে সে হঠাৎ বড়দের চ্যানেলে মনোনিবেশ করেছে কেন? জিজ্ঞাসা করতেই বলল, "আমি একটা মিষ্টি সলভ করার চেষ্টা করছি মাহি। এই দু'জন একটাই তরমুজ নিয়ে টানাটানি করছে কেন? ইজ ওয়াটারমেলন সো কস্টলি? আর একটা কিনে নিলেই তো পারে। শেয়ার করেও তো খেতে পারে। মারপিট করার দরকার কী?"

ফিল্মের গানের চেয়ে বেশি হল তরমুজ-সমস্যা?

"আসলে ওরা তো তোমার মতো গুড বয় নয় মোজো। তুমি জানো একটা চকোলেট ফ্রেন্ডসদের মধ্যে শেয়ার করে খেতে হয়। সবাই তা জানে না।"

"সবাই কেন জানে না মাহি?"

"সবাই তো তোমার মতো ওপ্‌ন মাইন্ডেড নয়," আড়চোখে অজয়ের দিকে তাকিয়ে কাটাকাটা শব্দগুলো ছুঁড়ে দিল আলো, "বেশির ভাগ মানুষই খুব সেলফিশ। নিজেরটা ছাড়া অন্য কিছু বোঝে না।"

সে খুঁটিয়ে দেখেনি। কিন্তু বুঝতে পেরেছে অজয়ের মুখ বিবর্ণ হয়ে গেছে। দিদি আড়চোখে ব্যাপারটা লক্ষ করে মোজোকে ডেকে নিল।

"মোজো, তোমার কালকের ম্যাথস হোমওয়ার্ক হয়েছে? টিভি অফ করো। অ্যান্ড বি আ গুডবয়। হোমওয়ার্ক নিজে নিজে কমপ্লিট করে নাও।"

মোজো বায়না ধরল, "আর একটু থাকি না মাম্। মাহি এসেছে। আমি মাহির সঙ্গে স্ক্র্যাবল খেলব।"

"মাহি এখন অনেকক্ষণ থাকবে," দিদি শান্ত অথচ দৃঢ় স্বরে বলে, "ডিনারের আগে এখান থেকে যাবে না। তোমার হোমওয়ার্কও ততক্ষণে শেষ হয়ে যাবে। তারপর যত খুশি স্ক্র্যাবল খেলো।"

মোজো খুব ভদ্র ছেলে। একগাল হেসে বলল, "ওকে মাম। মাহি, তুমি যাবে না কিন্তু। আমি জাস্ট হোমওয়ার্কটা করেই আসছি।"

নিজের ঘরে ছুটে গেল মোজো। এখন অন্তত দু'ঘণ্টা সে হোমওয়ার্ক নিয়ে ব্যস্ত থাকবে।

"মোজোকে মিথ্যে কথা বললি কেন?" দিদির দিকে তাকিয়ে বলে আলো, "আমি ডিনার অবধি ওয়েট করতে পারব না। মা-বাবা বাড়িতে বসে থাকবে। মা এখন সব কাজ পারে না।"

"সে চিন্তা তোকে করতে হবে না," দিদি বলল, "আমি বংশীকে পাঠিয়ে দিয়েছি, ও রান্নাবান্না করে দেবে। বাবাকে খাইয়ে দেবে। ওষুধও ঠিকঠাক দেবে।"

বংশী দিদিদের ড্রাইভার। কিন্তু সে পারে না, এমন কাজ নেই। জুতো সেলাই থেকে চণ্ডীপাঠ— সব অক্লেশে করে যায়। এমনকী আলোর ফোন বিল পে করা থেকে শুরু করে কম্পিউটারের খুঁটিনাটি ঠিক করা— সব করে। বাবা-মায়ের অসুস্থতার সময়ে সে যা সার্ভিস দিয়েছে তা ভাবা যায় না। কোনও কোনও ছেলেও বোধহয় মা-বাবার জন্য এত করে না! বংশীর অভিধানে বোধহয় 'অসম্ভব' শব্দটাই নেই।

বংশী মা-বাবার কাছে আছে শুনে আলো একটু আশ্বস্ত হল বটে। কিন্তু তার সঙ্গে বিরক্ত বোধও করল। এখন তাকে ওই লোকটার সামনে গিয়ে বসতে হবে!

"তোর খিদে পেয়েছে নিশ্চয়ই।" দিদি কিচেনের দিকে যাচ্ছে। "লুচি বেলে রেখেছি। জাস্ট গরম গরম ভেজে দেব। রাতে পোলাও করছি। তুই তো ভালবাসিস।"

আলো মনে মনে বলল, "ঘুষ!"

মুখে বলল, "আমি হেল্প করব?"

"একদম না। তুই টয়লেটে গিয়ে ফ্রেশ হয়ে নে। চেহারাটা পুরো ঝোড়োকাকের মতো লাগছে। তারপর অজয়কে একটু কোম্পানি দে। বেচারি একা একা বোর হচ্ছে।"

"একা একা বোর হচ্ছে বলে তো মনে হয় না," আলো নিরীহ মুখে বলে, "দিব্যি বিক্রমদার সামনে বসে হেঁ হেঁ করছে। তাছাড়া অজয় আমাকে এমন ঝোড়োকাকের মতো দেখতেই অভ্যস্ত। ময়ূর সেজে গেলে নির্ঘাত হার্টফেল করবে।"

কড়াইয়ে তেল চাপানোর চড়বড়ের সঙ্গে রান্নাঘর থেকে ভেসে এল দিদির গলা, "হেঁ হেঁ ছাড়া আর কী করবে? গত এক ঘণ্টা ধরে বিক্রম ওকে গলব্লাডার অপারেশনের খুঁটিনাটি বোঝাচ্ছে, ছবি দেখাচ্ছে। এই

পরিস্থিতিতে হেঁ হেঁ করা ছাড়া আর কী করার আছে?"

মনে মনে ভাবল আলো, "বেশ হয়েছে। যেমন জামাইবাবুর দ্বারস্থ হয়েছ, তেমন গলগ্রাডার নিয়েই বসে থাকো। আমি ওদিকে যাচ্ছি না।

"দিদি, তুই একা পারবি না। আমি আসব?"

"একদম না।" হাতে তেল চপচপে ঝাঁঝরি নিয়ে উঁকি মারল দিদি। চোখ বড় বড় করে বলল, "ফালতু জেদ করিস না। যা, গিয়ে বোস।"

অগত্যা আলো চুপচাপ গিয়ে বসে পড়ল বিক্রমদার পাশে। অজয়ের দিকে তাকানোর প্রয়োজনও বোধ করল না।

"এই যে, ছোটগিন্নি।" বিক্রমদা সস্নেহে আলোর মাথায় হাত রাখলেন। মানুষটা বড় সস্নেহ। দিদির কপালটা খুব ভাল। এমন স্বামী পাওয়া ভাগ্যের বিষয়। দেখলেই মনে হয়, এখনই বুঝি স্নান করে এলেন। বড় পবিত্র মানুষ। অর্থ আছে, দম্ভ নেই। আজ পর্যন্ত বিক্রমদাকে কেউ রাগতে দেখেনি। বরং ঠোকাঠুকি লাগলে দিদি একতরফাই বকবক করে যায়। আর বিক্রমদা দুই কানে আঙুল গুঁজে মিটিমিটি হাসতে থাকেন।

"বলুন অর্ধ পতিদেব।"

"আর কত দিন আধখানা পতি নিয়ে সন্তুষ্ট থাকবে? তাই আমরা তোমার একখানা পূর্ণাঙ্গ পতিদেব আনার চক্রান্ত করছি।"

"কিন্তু শুধু চক্রান্ত করলেই তো হবে না। আমারও পছন্দ-অপছন্দের ব্যাপার আছে।"

"অফকোর্স ডিয়ার।" বিক্রমদা উঠে দাঁড়িয়েছেন। "তোমার সঙ্গে একটু কথা আছে। বারান্দায় আসবে?"

"নিশ্চয়ই।"

"এক্সকিউজ় আস অজয়। একটু পরেই আসছি।"

অজয় লুচি গলাধঃকরণ করতে করতে নিঃশব্দে সম্মতিসূচক মাথা নাড়ল।

বিক্রমদার বারান্দায় প্রচুর পাখি এসে জড়ো হয় সকালে। বিক্রমদা খাঁচায় বন্দি করে পাখি পোষেন না। কিন্তু পাখি ভালবাসেন। তাই বারান্দার অতিথি পাখিদের জন্য জলের বন্দোবস্ত করে রেখেছেন। আলো চুপ করে দোলনা চেয়ারটায় বসল।

"ছোট গিন্নি, শুনলাম তোমাদের মধ্যে বিশেষ একটা ইস্যু নিয়ে প্রবলেম হয়েছে," তিনি আস্তে আস্তে বললেন, "অজয়ের মুখে গোটাটাই শুনলাম। তোমার রাগ হওয়া বিচিত্র নয়। তবে ওর যা দাবি তা খুব স্বাভাবিক। যে কোনও বিয়েতেই এমন অল্পবিস্তর লেনদেন হয়ে থাকে। যে কোনও মা-বাবাই চান যে, গৃহবধূর সঙ্গে সঙ্গে কিঞ্চিৎ লক্ষ্মীর আগমনও হোক। বিশেষ করে জুয়েলারি আর ফার্নিচারের ব্যাপারটা প্রায় অলিখিত নিয়ম।"

বিক্রমদা আলোর পাশে এসে বসেছেন, "এখন ও যা দাবি করছে, তা মেটানোর ক্ষমতা আমাদের আছে। তোমার গার্জিয়ান হিসাবে আমি সানন্দেই তোমাকে আর তোমার ঘর সাজিয়ে দেব। বিলিভ মি, আমার যদি একটা মেয়ে থাকত তাকে আমি যেভাবে সাজিয়ে দিতাম, তোমাকে তার থেকে কিছু কম দেব না। আফটার অল, তুমি আমার কন্যাসম।"

বিক্রমদার আন্তরিক কথাগুলোয় চোখে জল এসে পড়েছিল। আলো চোখ মুছে নিয়ে বলে, "বিক্রমদা, আপনিও আমার বাবার থেকে কিছু কম নন। সুখে দুঃখে যেভাবে পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন তাতে আপনার আন্তরিকতায় কোনও প্রশ্ন ওঠে না। কিন্তু..."

"কিন্তু?"

"যদি সত্যিই আপনার একটা মেয়ে থাকত, আর তার প্রোমোটার প্রেমিক এসে নির্লজ্জের মতো গয়না, ফার্নিচারের দাবি করত, তবে কি আপনি তার হাতে মেয়ে দিতেন? আপনি নিজে দিদিকে বিয়ে করার সময় কি এসব এক্সপেক্ট করেছিলেন? না মোজো যখন বড় হবে, বিয়ে করবে, তখন তার ভাবী স্ত্রীর পরিবারের কাছে আপনারা এই এক দাবি করবেন?"

বিক্রমদা অপলকে তার দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে বললেন, "বুঝেছি। তোমার অভিযোগ যৌক্তিক। তবু আমি বলব, একটু ভেবে দেখো। যে কারণে তোমাদের ব্রেক-আপ ঘটতে চলেছে, সেই কারণটাকে মুছে দিতে আমরা রাজি। তোমাদের প্যাচ আপ হওয়ার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা আছে। এবং সেক্ষেত্রে আমরা তোমার পাশে আছি।"

আলো কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, "আর যদি প্যাচ-আপ না হয়?"

"সেক্ষেত্রেও পাশে আছি। পরিস্থিতি যাই হোক না কেন—তোমার ডিসিশনই ফাইনাল।"

আলোর মাথা ফের ছুঁয়ে গেল বিক্রমদার ভারী হাত। আলো ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে ওঠে।

"কেঁদে নাও ছোট গিন্নি।" বিক্রমদা সস্নেহে বললেন, "মনের মধ্যে কোনও দ্বিধা রেখো না। কোনও ভার রেখো না। তোমায় আজ একটা ইম্পর্ট্যান্ট ডিসিশন নিতে হবে। সো বি স্ট্রং বেটা।"

এই 'বেটা' শব্দটা কান্নাকে আরও উচ্ছ্বসিত করে তুলল। 'বেটি' নয়—'বেটা।'

কান্না শেষে চোখ মুছে ঘরে এসে আলো দেখল, অজয় এখন বেশ প্রফুল্ল। হাসি মুখে বলল, "আর কোনও প্রবলেম নেই আলো। আমি বিক্রমদাকে সব বলেছি। বিক্রমদা ওই সামান্য নিডটুকু মেটাতে রাজি আছেন। এখন আমাদের বিয়ে হতে আর বাধা নেই।"

আলো দেখল বিক্রমদা খুব শান্ত দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন তার দিকে। দিদি একটু উদ্বিগ্ন। সে একটু চুপ করে থেকে বলে, "হ্যাঁ। আর বাধা নেই। তোমার বিয়ে এখন হতে পারে।"

"আমার বিয়ে?" অজয় বলল, "ওঃ আলো, তুমি এখনও রেগে আছ। আমার বিয়ে নয়, আ-মা-দে-র বিয়ে।"

"না, অজয়!" সে দৃঢ় গলায় বলে, "একা তোমারই বিয়ে। কারণ এ বিয়েতে আমার মত নেই।"

"হো-য়া-ট!" অজয় হাঁ হয়ে যায়। কিছুক্ষণ তার মুখে কোনও কথা ফুটল না। তার বিহ্বল অবস্থা দেখে পাশ থেকে দিদি বলল, "কী

বলছিস আলো! তুই বিয়েতে রাজি নোস!"

""ঠিক শুনেছিস দিদি।" সে আরও নিষ্ঠুর। "যে-লোকটা আমায় শ্রদ্ধা করে না, আমার পরিবারকে শ্রদ্ধা করে না— শুধু কয়েকটা কাঠের জিনিস আর সোনার নির্জীব বস্তুর জন্য এক কথায় তিন বছরের সম্পর্ক ভেঙে দিতে চায়, তাকে বিয়ে করতে আমি রাজি নই।"

"আলো!"

"লজ্জা করে না তোমার?" আলো এবার অজয়ের দিকে তাকিয়ে ফুঁসে ওঠে, "যাকে সুবিধাবাদী বলেছ, তোমার ভাষায় যে-মেয়েটা ফোকটে ডাক্তার বর বাগিয়েছে, তার বাড়িতেই বসে, তারই রান্না খেয়ে, তারই সামনে হেঁ হেঁ করছ। তার পয়সায় নিজের বিয়েতে ফুর্তি করতে তোমার কোনও আপত্তি নেই! কোনটা নেই তোমার? চোখের চামড়া নেই? না দুটো কানই কাটা গেছে?"

"আলো, তুমি ভুল বুঝছ..." অজয় কিছু একটা বলতে চাইছিল। তাকে থামিয়ে দিয়ে বলল আলো, "এত দিন ভুল বুঝছিলাম। তিন বছর ধরে ভুল বুঝিয়েছ আমাকে। আমিও ভুল বুঝে এসেছি। কিন্তু এবার একদম সঠিক বুঝছি। তোমার ভালবাসার, সম্পর্কের কোনও গ্যারান্টি নেই। আজ ফার্নিচারের জন্য সম্পর্ক ভাঙছ। কাল গাড়ির জন্য, পরশু ফ্ল্যাটের জন্য..."

অজয় মরিয়া হয়ে শেষ চেষ্টা করে, "কিন্তু আমি তোমায় ভালবাসি... তুমিও।"

আঙুল তুলে উদ্ধত ভঙ্গিতে বলল আলো, "টু হেল উইথ ইওর ভালবাসা। অ্যান্ড টু হেল উইথ ইউ!"

এগারো

"আমি খুব খুশি হয়েছি মা।"

টেলিফোনের ও প্রান্ত থেকে সেই কচি গলার স্বরটা ভেসে এল। উদগ্র কৌতূহলে রিসিভারে কান পেতে ছিল স্নিগ্ধা। সে জানত ফোনটা আজকে আসবে। জানত বললে অবশ্য একটু ভুল বলা হয়। সে ভীষণ ভাবে ফোনটাকে কামনা করেছিল। ওপ্রান্তে কে আছে তা সে জানে না। সত্যিই কি তার অনাগত সন্তান, না অন্য কেউ— তা তার জানা নেই। কিন্তু তবু ফোনটা না আসা অবধি সে শান্তি পাচ্ছিল না।

ঋতম আজ দুপুরেই বাড়ি ফিরে এসেছে। স্নিগ্ধা ভেবেছিল, সে হয়তো আরও ভয়াবহ রূপ ধরবে। রাগারাগি, লাফালাফি করে বাড়ি মাথায় তুলবে। তার সঙ্গে অবধারিত শাসানি। কিন্তু ঋতম এখনও আসেনি। বরং সে ফেরার পরেই স্বয়ং শ্বশুরমশাই সরেজমিনে তদন্ত করতে এসেছিলেন। স্নিগ্ধা দেখেছিল ভারী পাওয়ারের নিচে দুটো নিষ্ঠুর চোখ। ঈষৎ রক্তিমাভ। চৌকো চোয়াল দুটো বজ্র আঁটুনিতে আঁটা। ঠান্ডা গলায় জানতে চেয়েছিলেন— "কোথায় গিয়েছিলে?"

স্নিগ্ধা চুপ করে চিবুকে মুখ ঠেকিয়ে দাঁড়িয়েছিল, সে ঝগড়া করতে জানে না। তাই নীরবতাকেই প্রতিবাদের হাতিয়ার করে অকল্প আগুনের শিখার মতো দাঁড়িয়েছিল।

"সেই মহিলা ডাক্তারের কাছে?" তাচ্ছিল্য ভরা শব্দগুলো ছুড়ে দিলেন তিনি। "কী বলল সে?"

স্নিগ্ধা এবার মুখ তুলে তাকায়, মৃদুস্বরে বলে, "আপনারা ভুল বলেছেন বাবা। আমার সন্তান বেঁচে আছে।"

"হ্যাঁ," তিনি বলেন, "বেঁচে আছে। এবং সেই বেঁচে থাকার মাশুল গুনতে হচ্ছে ঋতমকে। আজ আমাদের প্রায় কয়েক কোটির লস হয়ে গেছে! এক পুরনো কাস্টমার অর্ডার ফিরিয়ে নিয়েছেন। এটা কী করে হল বলতে পার?"

তার অনাগত সন্তানের সঙ্গে পুরনো কাস্টমারের কী শত্রুতা থাকতে পারে তা স্নিগ্ধার মাথায় ঢুকল না। সে বরং আশ্চর্য হচ্ছিল কী অদ্ভুত কুসংস্কারাচ্ছন্ন পরিবার! তার শ্বশুর শিক্ষিত মানুষ। ঋতম এমবিএ পাশ করা ছেলে। ব্যবসায় উত্থান-পতন আছে, এ কথা যে কোনও সাধারণ মানুষই বোঝে। ব্যবসায় যদি কোনও গোলমাল হয়ে থাকে, তবে তার কারণও বিজনেস স্ট্র্যাটেজির মধ্যে অন্তর্নিহিত ভাবে থাকে। কিন্তু এরা তো সব দুর্ঘটনার জন্যই তার সন্তানকে দায়ী করবে বলে বসে আছে। সে শান্তস্বরেই উত্তর দেয়, "বাবা, আপনারাই বলেন যে, এ বাড়ির বউরা বিজনেসের ব্যাপারে মাথা ঘামায় না। তাই কোন কাস্টমার কী করেছে, কেন করেছে, তা আমি কী করে বলব?"

"চমৎকার!" তাঁর নিষ্ঠুর চোখ দুটো আরও প্রখর, আরও তীব্র হয়ে উঠেছে। "চমৎকার মুখে মুখে জবাব দিচ্ছ দেখছি। এত কথা বলতে কে শেখাল? তোমার রিপোর্টার বন্ধু? না ওই মহিলা ডাক্তার? শোনো স্নিগ্ধা, এ বাড়িতে কোনওদিন প্রথম সন্তান হিসাবে কোনও মেয়ে জন্মায়নি। এবারও জন্মাবে না। তুমি ভাবছ, খুব প্রতিবাদ করবে। পুলিশের কাছে যাবে, আইনের কাছে যাবে। কিন্তু কোনও লাভ হবে না। পুলিশ আর আইন আমাদের পকেটে থাকে।"

ভয় পাচ্ছে। তাই আগেভাগেই এত গর্জন করছে!

সে এবার হেসেই ফেলল।

"হাসছ কেন?" তিনি হতভম্ব।

স্নিগ্ধা হাসতে হাসতেই বলে, "আমি তো অত দূর ভাবিনি বাবা। আপনি দেখছি আমার আগেই অনেক দূর ভেবে রেখেছেন।"

"ব্যঙ্গ করছ?" নিষ্ঠুর কণ্ঠে জবাব এল, "এত জেদ ভাল নয় স্নিগ্ধা। আমাদের কথা শুনলেই ভাল করতে। এ বাড়িতে আজ পর্যন্ত নিয়মের ব্যতিক্রম হয়নি। এবারও হবে না। শুধু শুধু তুমিই কষ্ট পাবে।"

"ব্যতিক্রম সব ক্ষেত্রেই থাকে, বাবা," নিচু, নম্র গলায় বলল সে, "তবে আপনার ভয় অমূলক। আমি আইন-কানুন-পুলিশের দ্বারস্থ হব না। এমনকী আমার রিপোর্টার বন্ধুকেও ভেতরের কথা জানাইনি। নিতান্তই প্রয়োজন পড়লে তখন জানাব। এখনও পর্যন্ত মিডিয়াকে কেউ পকেটে পুরে রাখতে পেরেছে বলে শুনিনি।"

"মিডিয়ার ভয় দেখাচ্ছ!"

"আপনাদের কেন ভয় দেখাতে যাব? আপনারা তো আগেই ভয় পেয়ে আছেন। নন্দিনীকেও ভয় পেয়ে আছেন, সে আমার মেয়ে, যার এখনও জন্ম হয়নি।"

"নন্দিনী! নামও ঠিক করে ফেলেছ!"

শ্বশুরমশাই অগ্নিদৃষ্টিতে পুত্রবধূকে পুড়িয়ে দিয়ে জুতো মশমশিয়ে চলে গেলেন।

এতক্ষণ একটা অস্বাভাবিক জোর স্নিগ্ধাকে প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে দাঁড় করিয়ে রেখেছিল। কিন্তু প্রতিপক্ষ সরে যেতেই সে জোরটাও ভেঙে গেল। স্নিগ্ধা অবশের মতো ধপ করে বসে পড়ে নিজের বিছানায়। দেবে না! এরা মেয়েটাকে কিছুতেই জন্মাতে দেবে না! কীভাবে নিজের সন্তানকে বাঁচাবে সে? এই বাড়িতে থেকে তা কিছুতেই সম্ভব নয়। এরা সব পারে! কী করবে সে? তার কেমন যেন পাগল পাগল লাগছিল। বিড়াল এবং বাঘের প্রজাতিদের মধ্যে পুরুষেরা নিজেদের সন্তানকে নিজেরাই খেয়ে নেয়। তাই বেচারি মা পাগলের মতো একটু নিরাপত্তা খুঁজে মরে। সব সময়ই বাচ্চাদের সতর্ক চোখে পাহারা দেয়। চতুর্দিকে অনেক শত্রু! যেখানে বাচ্চার বাবাই সবচেয়ে বড় দুশমন সেখানে আর কাকে বিশ্বাস করবে!

এই মুহূর্তে নিজেকে যেন ওই পশুদের জায়গায় আবিষ্কার করছে স্নিগ্ধা। সেই একই পাশবিক প্রবৃত্তির গন্ধ চতুর্দিকে। কোথায় পালাবে সে! মা বেঁচে থাকতে তবু একটা আশ্রয় ছিল। এখন তাও নেই। সে আলোর মতো অর্থকরী দিক দিয়ে স্বাধীনও নয়। বিয়ের আগে একটা বেসরকারি স্কুলে পড়াত ঠিকই। কিন্তু বিয়ের পর এ বাড়ির সম্মানরক্ষার্থে চাকরিটা ছেড়ে দিয়েছে। এখন এই শারীরিক অবস্থায় কেউ তাকে নতুন করে চাকরিও দেবে না! নিজের বাচ্চাটাকে বাঁচাতে হলে এ বাড়ি ছেড়ে পালাতে হয়! অথচ পালিয়ে সে যাবে কোথায়? যে কোনও নারী ঠিক এই অবস্থায় সবচেয়ে বেশি দুর্বল। সবচেয়ে বেশি অসহায়! নিজের জন্য না হোক, বাচ্চার জন্য তাকে খাওয়া-দাওয়া করতে হয়। বিশ্রামে, যত্নে থাকতে হয়। ওই অবস্থায় যদি মাথার উপর ছাদ না থাকে, যদি সঙ্গে কেউ না থাকে তবে মা এবং বাচ্চা— দু'জনের বাঁচাই কষ্টকর হয়ে ওঠে।

এক মুহূর্ত কী যেন ভেবে নিল স্নিগ্ধা। তারপর টানটান হয়ে উঠে

দাঁড়াল। নাঃ, এ বাড়ি ছেড়ে তাকে পালাতেই হবে। এরা তার নন্দিনীকে বাঁচতে দেবে না। হ্যাঁ, ওকে নন্দিনী বলেই ডাকছে এখন সে। ও নন্দিনী ছাড়া আর কেউ নয়। নন্দিনী বলেই তার আগমনবার্তায় ভয় পাচ্ছে যক্ষপুরী!

নিজের ঘরের দরজা ভাল করে এঁটে গোছগাছ শুরু করল স্নিগ্ধা। অতিকষ্টে টেনে বের করল তার নিজস্ব স্যুটকেসটা। টাকা-পয়সা নেওয়ার কোনও প্রশ্নই ওঠে না। তার হাতের কাছে কোনও দিনই টাকা-পয়সা থাকে না। দরকার পড়লে শাশুড়ি-মা'র কাছে চাইতে হয়। তিনিই সিন্দুক খুলে প্রয়োজনীয় টাকা দিয়ে দেন। সেই সিন্দুকেই তার বিয়ের ভারী গয়নাগুলোও আছে। দু একটা হাল্কা গয়না যা বাইরে আছে সেইগুলোই নিয়ে নিল সে। এগুলো না হয় বেচে দেবে। তাতে যে-ক''দিনের খরচ চলে! তারপর দেখা যাবে। পথে যেতে-যেতে অনেক ভিখিরি মেয়েকে দেখেছে স্নিগ্ধা। তাদের মধ্যে কেউ গর্ভবতীও। তারা ফুটপাথেই দিন কাটায়, ভিক্ষাবৃত্তি করে দিন চালায়। দরকার পড়লে তাদের জীবিকাই নেবে!

ঠিক তখনই ল্যান্ডফোনটা বেজে উঠল। স্নিগ্ধার বুকের ভিতরটা ধক করে উঠেছে। যে কেউ হতে পারে অন্য প্রান্তে। যে কেউ হতে পারত। অথচ মন বলল, সে ফোন করছে! সে-ই।

"হ্যালো?"

"মা?" সেই কচি গলাটা বলে উঠল, "আমি নন্দিনী।"

বুকের মধ্যে বাষ্পের উচ্ছ্বাস। কোনওমতে চেপে বলল, "বলো।"

"আমি খুব খুশি হয়েছি," কচি গলাটা আধো আধো ভাবে বলল, "তুমি আমার লক্ষ্মী মা। সাহস করে অন্য ডাক্তার দেখিয়েছ। সত্যি কথাটা জেনেছ।"

স্নিগ্ধার দু চোখ দিয়ে টপটপ করে জল গড়িয়ে পড়ে। খানিকটা আনন্দে, খানিকটা যন্ত্রণায়। অন্তত একটা মানুষ তার এই লড়াইয়ের কদর বুঝেছে।

"চুপ করে আছ কেন মা? তোমার দুঃখ হয়েছে? কাঁদছ?"

চমকে উঠল সে! কী করে জানল মেয়েটা? কী করে এত কথা টের পায় সে? নিতান্তই কয়েক সপ্তাহ বয়েস তার!

"অবাক হচ্ছ?" সেই অতিপ্রাকৃতিক কণ্ঠস্বর বলে, "ভাবছ কী করে বুঝতে পারছি? আমি তোমার শরীরের মধ্যেই আছি মা। তুমি ভাবছ, শুধু তোমার দেহের মাংসপেশি আমাকে ঘিরে আছে। কিন্তু তোমার অনুভূতিও আমায় ঘিরে আছে যে! তোমার হৃৎপিণ্ডের খুব কাছাকাছি আছি কি না! তুমি যখন কাঁদছ, তখন আমারও মন খারাপ হচ্ছে। তুমি যখন কষ্ট পাচ্ছ, তখন আমারও কষ্ট হচ্ছে! আমি সব টের পাচ্ছি মা।"

"তাই?" অতিকষ্টে উত্তর দিল স্নিগ্ধা।

"বিশ্বাস হচ্ছে না? দাঁড়াও। বাড়ির কেউ যা জানে না তাও আমি জানি।"

"কী জান?"

"তুমি এখন বাক্স গোছাচ্ছ। এ বাড়ি ছেড়ে চলে যাওয়ার কথা ভাবছ।"

বজ্রাহতের মতো রিসিভার কানে নিয়েই দাঁড়িয়েই থাকে সে। কে এ? কোনও জাদুকরী! বাইরের কেউ হতে পারে না! কারণ স্নিগ্ধা এই মুহূর্তে ঠিক কী করছে তা বাইরের কেউ তো দূরের কথা, এ বাড়ির কাকপক্ষীও টের পায়নি! তবে? তবে কে এ?

সমস্ত বিজ্ঞান, যুক্তি-তর্কের বাইরে গিয়ে স্নিগ্ধার মনে হতে থাকে— এ আর কেউ নয়, তারই আত্মজা! হ্যাঁ, সে-ই। যে-মানুষটার সঙ্গে তার আদি ও অকৃত্রিম সম্পর্ক! স্নিগ্ধার সঙ্গে তার নাড়ির টান অবিচ্ছেদ্য। সেই আত্মজা ছাড়া আর কেউ এ হতে পারেই না! এ নন্দিনী। তার নন্দিনী!

"পালিয়ে যাচ্ছ মা?"

সজল চোখ মুছে নিয়ে সে বলল, "কী করব মা? তুই তো সব জানিস।"

"জানি।" বাচ্চার কণ্ঠস্বরে যেন বিধাতা বলে উঠলেন, "কিন্তু পালিয়ে গেলে কি তুমি আমায় বাঁচাতে পারবে? বাবা, দিদুন, দাদাই কি তোমাকে খুঁজে বের করতে পারবে না? কত দূর পালাবে তুমি? কত দিন পালাবে?"

"নন্দিনী!" এই প্রথম স্নিগ্ধা অশ্রুসিক্ত গলায় তার নাম ধরে ডাকল, "নন্দিন্... তোর মা যে বড় অসহায়! আমার পাশে কেউ নেই।"

"আমি তো আছি মা," পরম আশ্বাসে, পরম মমতায় বলল নন্দিনী, "আমি সব সময় তোমার সঙ্গে আছি। তোমার ভিতরে আছি। আর নন্দিনীরা কখনও পালায় না। কেন অন্য কোথাও যাবে তুমি? এই বাড়ি শুধু ওদের নয়— তোমারও। এবং সেই সঙ্গে আমারও। তুমি জোর করে এ বাড়িতে আসনি। তোমায় ওরা নিজেরা এনেছে। এ বাড়িতে তোমার অধিকার আছে। তেমনি আমিও জোর করে আসিনি। তুমি আর বাবা আমায় এনেছ। এ বাড়ি যেমন ওদের, তেমনি আমাদেরও। নিজের বাড়ি থাকতে আমি অন্য কোথাও যাব কেন?"

"কিন্তু এ বাড়ির কঠিন নিয়ম। ওরা তোমাকে আসতে দেবে না। তার আগেই..." আশঙ্কার কথাটা প্রাণে ধরে বলতে পারল না সে।

"পারবে না।" নন্দিনীর কচি কণ্ঠস্বরে আত্মবিশ্বাস। "আমি এ বাড়িতেই আসব। তুমি শুধু ভয় পেও না। যে-নিয়ম আমায় এ বাড়িতে আসতে বারণ করে, সে নিয়ম টিকবে না। সে নিয়ম বদলাবে। বদলাতেই হবে তাকে।"

স্নিগ্ধা কেঁপে উঠল। এ কে? সে কি কোনও অলৌকিক সন্তানের জন্ম দিতে চলেছে? কী করে এত জোর আসে মেয়েটার মধ্যে!

"তুমি শুধু একটু সাবধানে থেকো মা।" ফিসফিস করে নন্দিনী বলে, "আর দিদুন বা বাবা যতই জোর করুক, আজ রাতে তুমি কাশ্মীরি কেশর মেশানো দুধটা খাবে না। কিছুতেই খাবে না। মনে থাকবে তো?"

এ তো কথা নয়। রীতিমতো অলৌকিক আদেশ! যেন আকাশবাণী! যন্ত্রবৎ মাথা নাড়ল স্নিগ্ধা, "আচ্ছা।"

"ভাল থেকো মা।"

লাইনটা কেটে গেল।

রিসিভারটা বুকে চেপে ধরে আনন্দে, গর্বে অনেকক্ষণ কাঁদল স্নিগ্ধা। এতক্ষণের যাবতীয় কষ্ট, যন্ত্রণা আর তার মনে দাগ কাটতে পারছে না। শুধু রিসিভারটা চেপে ধরে পূর্ণতার আশ্বাসে সে বিড়বিড় করে বলল— "নন্দিনী... আমার নন্দিনী... নন্দিন্!"

গল্পের মধ্যে আবার বাধা!

যতক্ষণ লোকটা সিগারেট খাচ্ছিল, ততক্ষণ কোনও বাধা দেয়নি। দিব্যি চুপচাপ গল্প শুনছিল। কিন্তু সিগারেটটা শেষ হতেই সে আবার বকবক করে উঠেছে, "মেগাসিরিয়ালের এন্টারটেনমেন্ট অনুযায়ী সব কনটেন্ট ঠিকই আছে। নায়িকা কেঁদে ভাসাচ্ছে। শ্বশুরবাড়ি অত্যাচার করছে। স্বামীও কম যায় না। কিন্তু গল্পের গরু যে এবার গাছ থেকে লাফ মেরে হাওয়ায় উড়তে শুরু করেছে। এমন গল্প লেখেন কেন, যার কোনও বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা নেই!"

আমি এবার একটু বিরক্ত হলাম। লোকটার ধৈর্য নামক বস্তুটাই নেই। অনেক রকম শ্রোতা জীবনে দেখেছি। কিন্তু এই লোকটার মতো দাম্ভিক এবং অধৈর্য শ্রোতা পাইনি! যেন ঘোড়ায় জিন চড়িয়ে এসেছে। এক্ষুনি সমস্ত প্রশ্নের উত্তর না পেলে চলবে না। যা ও বোঝে না— সেটাই আজগুবি! অথচ কিছুতেই স্বীকার করবে না, গোটাটাই ওর মাথার উপর দিয়ে যাচ্ছে।

আমি প্যাকেট থেকে আর একটা সিগারেট বের করে এগিয়ে দিই ওর দিকে।

"এটা কী হল?"

"আপনার মুখ বন্ধ করার চেষ্টা করছি। ধোঁয়ার সঙ্গে হয়তো আমার গল্পটা হজম করা সহজ হবে।"

সে হেসে উঠল। বিনা বাক্যব্যয়ে সিগারেটটা ধরিয়ে বলল, "আপনার গল্পের আগে একটা ট্যাগ ঝুলিয়ে দিতে ভুলবেন না। স্মোকিং ইজ় ইনজুরিয়াস টু হেলথ!"

"শিওর।"

"একটা কথা বলুন, একবার না হয় ধোঁয়ার সঙ্গে কোনওমতে হজম করে নিলাম; কিন্তু বার বার যদি এই অদ্ভুতুড়ে অতিপ্রাকৃতিক ফোন আসতে থাকে, তাহলে হজম করি কী করে!" লোকটা সিগারেটে লম্বা টান দিয়েছে, "অতিপ্রাকৃতিক ব্যাপার একবার, দু'বার ভাল লাগে। কিন্তু বারবার একই ঘটনার রিপিটেশন হলে তখন সেটা রামসে ব্রাদার্স হয়ে দাঁড়ায়।"

"প্রথমত," আমি যথাসম্ভব বিনীতভাবে বলি, "ঘটনাটা যে অতিপ্রাকৃতিক এমন দাবি আমি করিনি। নন্দিনী কোনও পেত্নির নাম নয়, আগেই বলেছি। দ্বিতীয়ত, এ ঘটনাটা আজগুবি কি না তার সিদ্ধান্ত এখনই না নেওয়া ভাল। গল্পের শেষের জন্যও কিছু প্রশ্ন বাঁচিয়ে রাখুন।"

"হুম্," লোকটা একমুখ ধোঁয়া ছেড়ে বলে, "লেট মি গেস। এরকম একটা ফিল্ম আমি দেখেছিলাম। সেখানে গল্পের নায়ক নিজেই নিজেকে ফোন করছিল। পরে তার একটা সাইকোলজিক্যাল এক্সপ্ল্যানেশন পেয়েছিলাম। তেমনই কিছু? স্নিগ্ধা নিজেই আসলে ফোনগুলো আগে রেকর্ড করে রেখেছিল, তাই না? নন্দিনী ওর কাল্পনিক চরিত্র। অর্থাৎ ব্রেন মে কেমিক্যাল লোচা!"

আমি মুচকি হাসলাম। লোকটা ভারি অদ্ভুত। তবু ও যে এর মধ্যে একটা যুক্তি খোঁজার চেষ্টা করছে, এটাই যথেষ্ট পজিটিভ দিক।

"আপনাকে একটা প্রশ্ন করব?"

সে অবাক হয়ে তাকায়। হয়তো ভেবেছিল প্রশ্ন করার ব্যাপারে যাবতীয় মৌরসিপাট্টা ও একাই নিয়ে বসে আছে। আমিও যে প্রশ্ন করতে পারি সে সম্ভাবনার কথা ভাবেনি।

"করুন।"

"আমার গল্পে তিনটে মহিলা ক্যারেক্টার লিডে আছে। তার মধ্যে একজনের স্বামীর নাম প্রদীপ। মেয়েটি সাংবাদিক। মেয়েটির নাম কী বলতে পারবেন?"

তাকে একটু চিন্তান্বিত লাগল। আমি জানি, ও মনে করতে পারবে না। ভুলে যাওয়াটাই ওর রোগ। তবু অনেকক্ষণ চেষ্টা করল লোকটা। শেষ পর্যন্ত হাল ছেড়ে দিয়ে বলল, "নাঃ, মনে করতে পারছি না। একটু আগেই শুনেছি কিন্তু।"

"আর যে-মেয়েটির বিয়ে ভেঙে গেল, তার নাম? একটু আগেই বলেছি।"

সে ফের মনে করার চেষ্টা করল। আমি জানি এ উত্তরটাও দিতে পারবে না। বরং উত্তর খুঁজতে-খুঁজতে ক্লান্ত হয়ে পড়বে। তবু সারাদিন খুঁজেও নামটা মনে করতে পারবে না।

যথারীতি প্রশ্নের উত্তর খুঁজে না পেয়ে লোকটা খেপে গেছে। রেগে গিয়ে সে উঠে দাঁড়াল, "আমি এখানে গল্প শুনতে এসেছি, না মাধ্যমিকের বাংলা পরীক্ষা দিতে এসেছি? সিন প্যাসেজ থেকে উত্তর লেখার বয়েস আর আমার নেই।"

"আরে...আরে!" আমি সামাল দিই, "রাগ করছেন কেন?"

"আপনি আমার মেমরি টেস্ট নেবেন, আর আমি রাগব না?"

"সরি," আমি অনুতপ্ত স্বরে বললাম, "আমি আপনার টেস্ট নিতে চাইনি। শুধু একটা জিনিস দেখতে চাইছিলাম।"

"কী?"

"আপনি নায়িকা তিনজনের নাম বলতে পারেন কি না! আচ্ছা, প্রেগন্যান্ট মেয়েটির নাম..."

এক মুহূর্তও চিন্তা না করে জবাব এল, "স্নিগ্ধা। ওকে? হয়েছে?"

"হয়েছে। কিন্তু আরও একটা প্রশ্ন ছিল।"

"আরও একটা?" লোকটা তিতিবিরক্ত হয়ে বলে, "ঠিক আছে। এই লাস্ট। এর পর আর কোনও প্রশ্ন করলে স্ট্রেট উঠে যাব।"

"ওকে।" ওর দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে এক মুহূর্ত জরিপ করে নিই। সে আমার দিকে বিরক্তিমাখা দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে।

"আমি তিনজনের কথাই আপনাকে শোনাচ্ছি। কারও প্রতিই বিশেষ পক্ষপাত না করে পাশাপাশি বলে যাচ্ছি। আপনি অন্য দু"জনের নাম অনেক চেষ্টা করেও মনে করতে পারলেন না। কিন্তু আগেও দেখেছি, এখনও দেখলাম, স্নিগ্ধার নামটা মনে করতে আপনার এক সেকেন্ডও লাগছে না! কেন বলুন তো?"

এবার স্তম্ভিত হওয়ার পালা ওর! সম্ভবত নিজেও ব্যাপারটা লক্ষ করেনি। আমি ধরিয়ে দিতেই খেয়াল হল। উস্কোখুস্কো চুলে হাত বোলাতে বোলাতে বলল, "তাই তো! স্ট্রেঞ্জ! কী করে হল! ইনফ্যাক্ট নামটা খুব পরিচিত লাগছে!"

আমি দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলি, "ওকে। চলুন, গল্পটা শোনা যাক।"

ঋতম রাতে ঘরে এল। ও যখন ঘরে ঢুকছে, তখন স্নিগ্ধা বারান্দায় দাঁড়িয়ে। খুব মন দিয়ে নক্ষত্র দেখছিল সে। আর গর্ভস্থ মেয়েকে নক্ষত্র চেনাচ্ছিল।

"নন্দিনী, তুই কখনও সন্ধ্যাতারা দেখেছিস? ওই দ্যাখ.. ওটা হল সন্ধ্যাতারা... আর দূরে যেটা সবচেয়ে বড় হয়ে দপদপ করে জ্বলছে— ওটা ধ্রুবতারা। রবি ঠাকুর ধ্রুবতারাকে নিয়ে গান লিখেছিলেন। কী গান বল তো?" বলতে বলতেই সে গান ধরল, "তোমারেই করিয়াছি জীবনের ধ্রুবতারা/ এ সমুদ্রে আর কভু হবো না কো পথহারা..."

ঋতম চুপ করে কিছুক্ষণ দৃশ্যটা দেখল। এমনিতেই অফিসের ঘটনাটার পর তার মেজাজ খারাপ হয়ে আছে। তার উপর স্নিগ্ধার আদিখ্যেতা দেখে মুড আরও খারাপ হয়ে গেল। কিন্তু মেজাজ খারাপ করলে চলবে না। এতক্ষণ ধরে মা-বাবার সঙ্গে আলোচনা করে যে-স্ট্র্যাটেজি সে ঠিক করে এসেছে, তাতে একটুও রূঢ় ব্যবহার করা চলবে না। মা বলেছিলেন, "একবার অ্যাবরশন হয়ে গেলে স্নিগ্ধার আর কিছু করার থাকবে না। কিন্তু তার আগে ওকে একটুও বুঝতে দেওয়া চলবে না। তোমরা শুধু স্বাভাবিক ব্যবহার করে যাও। বাকিটা আমি দেখছি।"

বাবা একটু চিন্তা করে বললেন, "তবে আমি ডঃ সিন্‌হাকে ফোন করে দিচ্ছি। উনি রাতেই সব ব্যবস্থা করে রাখবেন। অ্যাম্বুল্যান্সও

পাঠিয়ে দেবেন।"

"তাই করে দাও।" মা সম্মতি জানালেন, "কিন্তু খুব সাবধান। আগের বার যা হয়েছিল, এবার যেন তা না হয়। স্নিগ্ধার মনে যেন একফোঁটাও সন্দেহ না থাকে। ঋতম, এ দায়িত্ব তোমার। ও সারাদিন না-খেয়ে আছে। ওর খিদেও পেয়েছে নিশ্চয়ই। আমি খাবারটা উপরে পাঠিয়ে দিচ্ছি। তুমি দেখবে, খাবারটা যেন স্নিগ্ধা খায়।"

"দেখব মা।"

মা কপালে দু'হাত ঠেকালেন, "ঠাকুর, আপদ নির্বিঘ্নে দূর করো বাবা। ভালোয়-ভালোয় ফাঁড়া কেটে যাক।"

ঋতমকে মা রীতিমতো পাখিপড়া করে সব শিখিয়ে দিয়েছিলেন। সেই নির্দেশমতোই সে উপরে উঠে এসেছে। কিন্তু কীভাবে কথা শুরু করবে বুঝতে পারছে না। যতবারই স্নিগ্ধার দিকে তাকাচ্ছে, ততবারই মনে পড়ছে যে, সে আজই এক লেডি ডক্টরকে দেখিয়ে এসেছে। ওর অজানা কিছু নেই। সে জানে, ঋতম মিথ্যেবাদী! নিজেকে বড্ড ছোট বলে মনে হচ্ছিল। ঋতমের মনে হচ্ছিল, স্নিগ্ধা তাকে আর বিশ্বাস করবে না। যে-উচ্চতায় এতদিন সে ছিল, যে-সম্ভ্রমের সঙ্গে স্নিগ্ধা তার সমস্ত কথা মেনে এসেছে, সে-উচ্চতায়, সে-সম্ভ্রমের আসনে ঋতম আর নেই। আজ নিজেকে পক্ষীপুরীষে লিপ্ত, ঘৃণ্য, কলঙ্কিত দেশনায়কের মতো মনে হচ্ছে! স্নিগ্ধার মুখোমুখি হতে অস্বস্তি হচ্ছিল তার।

কোনওমতে অস্বস্তিটা ঝেড়ে ফেলে বলল, "স্নিগ্ধা, এ কী পাগলামি?"

স্নিগ্ধা তাকে লক্ষ করেনি। সে পিছন ফিরে আপনমনেই গান গাইছিল। ঋতমের কথায় তার গান থেমে গেল। ঘাড় ঘুরিয়ে বলল, "কোনটা পাগলামি?"

"এই শারীরিক অবস্থায় কেউ না খেয়ে থাকে?" ঋতমের কণ্ঠ মোলায়েম। "নিজের কথা না ভাব, তোমার ভিতরে যে আছে তার কথা তো ভাবা জরুরি।"

স্নিগ্ধা হাসল, হাসিটা অদ্ভুত লাগল ঋতমের। তিক্ততা, ব্যঙ্গ আর শ্লেষ মিশেছিল সেই হাসিতে। ঋতম কয়েক মুহূর্তের জন্য স্নিগ্ধার চোখের দিকে তাকাতে পারল না! স্নিগ্ধার হাসি যেন প্রশ্ন করছিল, আমার ভিতরে যে-আছে, তার খেয়াল তোমার এতক্ষণ কোথায় ছিল ঋতম? তাকে তো মেরে ফেলতেই চেয়েছিলে তোমরা। তবে এখন কেন তার ভাল-মন্দর কথা জিজ্ঞাসা করছ?

মুখে অবশ্য এসব কিছুই বলেনি স্নিগ্ধা। মৃদু হেসে বলে, "খালি পেটে নেই। আলো খাইয়েছে। আমি আমার বেবির ব্যাপারে যথেষ্টই কনসার্নড!"

"দ্যাটস গ্রেট। আলো মানে তোমার সেই সাংবাদিক বন্ধু, তাই না?"

"হ্যাঁ।" সে সংক্ষিপ্ত উত্তর দিয়ে চুপ করে গেল। কিন্তু তার দৃষ্টি যেন ফের প্রশ্ন করল, তুমি তো জানতে চাইলে না লেডি ডক্টর কী বললেন? অথবা তুমি সবই জানতে— তাই না?

'হ্যালো'? 'মা?' সেই কচি গলাটা বলে উঠল, 'আমি নন্দিনী।'

ঋতম ফের চোখ নামিয়ে নিয়েছে। তার আত্মবিশ্বাস, অহঙ্কার, সব এই মুহূর্তে ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে যেতে বসেছে। কোনওমতে নিজেকে সামলাতে-সামলাতে বলল, "দুটো কড়া কথা না হয় বলেছি, তাই বলে এত রাগ? এই অবস্থায় বাসে-ট্রামে যাওয়া রিস্কি। গাড়ি তো নিয়ে যেতে পারতে।"

"তোমার কথার তো কোনও ঠিক নেই ঋতম। মেজাজেরও ঠিক নেই," স্নিগ্ধা সহজভাবে উত্তর দেয়, "আমায় নিয়ে যাওয়ার অপরাধে একটা গরিব লোকের চাকরি যাবে, এটা মেনে নিতে পারিনি। কারও চাকরি খাওয়া ঠিক নয়। তাছাড়া আমি টিপিক্যাল মিড্‌ল ক্লাস মেয়ে। বাসে ট্রামে চাপার অভ্যাস আছে।"

"তুমি এখনও রেগে আছ।"

"বিলিভ মি, আমি একটুও রেগে নেই।" সে হাসল। "তোমাদের কাছে কোনও এক্সপেক্টেশনও নেই আমার।"

কথাটা ঋতমের দিকে ছুড়ে দিয়ে স্নিগ্ধা আস্তে আস্তে এসে বসল বিছানার উপরে। কাঁচের জার থেকে একগ্লাস জল নিয়ে খেল।

"শুধু জল খেলেই চলবে? ডিনার করবে না?"

ঋতম আড়চোখে দেখল মা নিঃশব্দে ডিনারের ট্রলিটা ঘরে রেখে

গেলেন। তাঁর হাবভাব অবিকল চোরের মতন। প্লেটে-প্লেটে ঢাকা ট্রলিটার দিকে আলগা ইঙ্গিত করে নিঃশব্দ পায়েই চলে গেলেন তিনি।

স্নিগ্ধা ওঁকে লক্ষ করেছে। সে জোরালো শ্বাস টেনে বলে, "হ্যাঁ। খাব। খুব খিদেও পেয়েছে।"

ঋতম ট্রলিটা টেনে এনে তার সামনে রাখল। খাওয়া-দাওয়ার তেমন বাহুল্য নেই। সঠিক পরিমাণে ভাত আর রুটি, চিকেন-স্টু, ডাল, পনিরের তরকারি—স্যালাড, কাশ্মীরি কেশর মেশানো একগ্লাস দুধ। ছিমছাম ডিনার।

"এসো, আমি তোমাকে খাইয়ে দিই।" প্লেটটা তুলে নিয়েছে সে, "কোনটা আমরা আগে খাব? রুটি না ভাত?"

"আমি বাচ্চা মেয়ে নই ঋতম।" স্নিগ্ধা একটু যেন বিরক্ত। "নিজে খেতে পারি।"

ঋতম আবার অস্বস্তি বোধ করল। স্নিগ্ধা অদ্ভুত দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে তার দিকে। সে চোখে সংশয়, অবিশ্বাসের ছাপ প্রকট।

"তুমি আমায় এখনও ক্ষমা করনি। তাই না?"

সে কোনও জবাব দিল না। বরং কাছে এসে মুখ বাড়িয়ে বলল, "দাও।"

ঋতম তাকে সযত্নে খাইয়ে দিতে থাকে। স্নিগ্ধা বোধহয় জীবনে এই প্রথমবার স্বামীর হাত থেকে খাবার খেল। কিন্তু তার সমস্ত ইন্দ্রিয় সতর্কবাণী জানাচ্ছে। এই আকস্মিক প্রেম খুব স্বাভাবিক নয়। হয়তো এটা প্রেমই নয়— এর পিছনে কোনও ধান্দাবাজি আছে। নিজের স্বামীর সম্বন্ধে এমন কথা দু'দিন আগেও ভাবতে পারত না সে। দুদিন আগে ঋতম তাকে খাইয়ে দিলে স্বর্গীয় সুখ অনুভব করত। কিন্তু আজ সে পরিস্থিতি নেই। কাউকে বিশ্বাস নেই— দুনিয়ার কাউকে বিশ্বাস করতে নেই। সময়টা কঠিন।

খাওয়ার পর্ব শেষ হলে ঋতমই সযত্নে তার মুখ মুছিয়ে দিল। শুধু দুধটা বাকি। স্নিগ্ধা বলল, "ওটা আমি নিজে নিজেই খেয়ে নিতে পারব। অন্য কেউ খাইয়ে দিলে গলায় আটকে যেতে পারে। নাকে মুখে ঢুকে যেতে পারে।"

ঋতম জোর করল না। হেসে বলল, "অ্যাঞ্জ ইউ উইশ। তুমি খেয়ে নাও। আমি এই ফাঁকে স্নান করে আসি।"

স্নিগ্ধা সম্মতিসূচক মাথা নেড়ে দুধের গ্লাসে চুমুক দেয়। ঋতম টয়লেটে ঢুকতে ঢুকতে লক্ষ করল ও ছোট ছোট সিপে দুধ খাচ্ছে। সে নিশ্চিন্ত হয়ে দরজা বন্ধ করে দেয়।

তখন রাত প্রায় এগারোটা। ঋতমদের বাড়ির সামনে একটা ধবধবে সাদা অ্যাম্বুল্যান্স চুপিসারে এসে থামল। এতটাই সতর্ক তার গতিবিধি যে, দেখলে মনে হয়, উদ্দেশ্যটা জনহিতকর নয়। গেটকিপার তৈরিই ছিল। সে নিঃশব্দে দরজা খুলে দিয়েছে।

অ্যাম্বুল্যান্স থেকে দুজন ওয়ার্ডবয় নামল। তারা পেশেন্টকে নিতে এসেছে। ডঃ পতিতপাবন সিন্‌হা তাদের পাঠিয়েছেন। সাদা ইউনিফর্মে মিশমিশে কালো দুজন ওয়ার্ডবয়ের ষাঁড়ের মতো চেহারা দেখলে মনে হয়, ওয়ার্ডবয় নয়— যমদূত! তারা অ্যাম্বুল্যান্স থেকে স্ট্রেচার নামিয়ে এনে বাড়ির সামনে দাঁড়াল।

বাড়ির নীচের ঘরে আলো জ্বলে উঠেছে। বোঝাই যায়, বাড়ির বাসিন্দারা অ্যাম্বুল্যান্সটার প্রতীক্ষায় ছিল। দরজা খুলে ভিতর থেকে দুজন পুরুষ বেরিয়ে এল। ঋতম ও তার বাবা।

"পেশেন্ট কোথায়?" চাপা স্বরে প্রশ্ন করে ওয়ার্ডবয়দের একজন।

"দোতলায়," ঋতমের বাবা জানালেন, "খুব সাবধানে নিয়ে যাবে। কেউ যেন কিছু জানতে না পারে।"

"ডঃ সিনহার তেমনই অর্ডার আছে স্যার। পেশেন্ট ঝামেলা করবে না তো?"

"না।" ঋতম আত্মবিশ্বাসী জবাব দেয়, "পেশেন্ট ঘুমোচ্ছে।"

"ঠিক আছে।"

স্ট্রেচার হাতে দু'জন উঠে গেল দোতলার দিকে। সিঁড়িটা অন্ধকার। দুপাশে ছোট ছোট নাইটল্যাম্প জ্বলছে। তারই আলো পিছলে পড়ছে মার্বেলের সিঁড়িতে। আন্দাজে উঠে যেতে কোনও অসুবিধা হল না। দোতলায় স্নিগ্ধার ঘরে অন্ধকার। একটু আগেই ঋতম দেখেছে, সে গভীর ঘুমে মগ্ন। মা বোধহয় দুধে কোনও সেডেটিভ মিশিয়ে দিয়েছিলেন। ঘুমের ওষুধ এনে দিয়েছে নিশ্চিন্ত, নিশ্ছিদ্র ঘুম। সন্দেহের কোনও অবকাশই নেই। যখন তার ঘুম ভাঙবে, ততক্ষণে অ্যাবরশনটা হয়ে যাবে। তার পরের পরিস্থিতি কঠিন হলেও নরমে গরমে সামাল দেওয়া যাবে।

ওয়ার্ডবয়রা ঋতমের পিছন পিছন ঢুকে যায় স্নিগ্ধার ঘরে। ঋতমের বাবা চাপা উত্তেজনায় ঘরের বাইরে পায়চারি করছেন। ঋতম ঘরে ঢুকে বড় আলোটা জ্বালাল না। কে জানে, যদি স্নিগ্ধার ঘুম ভেঙে যায়। নাইট ল্যাম্পটা জ্বালিয়ে সে বিছানার দিকে তাকায়, যেখানে স্নিগ্ধার এখন ঘুমিয়ে থাকার কথা!

কিন্তু এ কী! সেখানে কেউ নেই তো! নরম গোলাপি ব্ল্যাঙ্কেটটা পায়ের কাছে পড়ে আছে! বালিশটাতে এখনও মাথার ছাপ স্পষ্ট! পাশবালিশটাও যথাস্থানেই! কিন্তু মানুষটা কই? পাঁচ মিনিট আগেও তো এখানেই ছিল... একটু আগেই তাকে গভীর ঘুমে দেখে গেছে ঋতম! তবে এখন সে গেল কোথায়? বিছানায় নেই!

"কাকে খুঁজছ ঋতম?"

দপ করে বড় আলোটা জ্বলে উঠেছে। অদ্ভুত আশঙ্কায়, প্রচণ্ড বিস্ময়ে বিস্ফারিত চোখে ঋতম দেখল, স্নিগ্ধা বারান্দার ইজিচেয়ারে বসে আছে। জ্বলজ্বলে চোখে তাকিয়ে আছে এদিকেই। দু'চোখে যেন বিদ্যুৎ চমকে চমকে উঠছে।

শান্ত গলায় বলল, "আমি দুধটা খাইনি। মুখে নিয়েছিলাম। কিন্তু সুযোগ বুঝে ফেলে দিয়েছি।"

ঋতম স্তম্ভিতের মতো দাঁড়িয়ে! তার দু'পায়ে কেউ যেন কয়েক টনের লোহা বেঁধে দিয়েছে। কী করবে, কী বলবে ভেবে পাচ্ছে না! অভিজাত, সম্ভ্রান্ত বংশের সন্তান চূড়ান্ত গ্লানিময় অপরাধ করতে গিয়ে ধরা পড়েছে। আর তার সামনে স্ত্রী নয়, সর্বশক্তিমান বিচারক বসে আছেন। তার দু'চোখে ঘৃণা দপদপ করছে। করুণার লেশমাত্রও নেই!

"স্নিগ্ধা!"

সে আরও কিছু বলার আগেই এ-ঘরের ফোনটা বেজে উঠেছে। ঋতম বিস্মিত হয়! এত রাতে এই লাইনে কে ফোন করছে! ফোনের শব্দের মধ্যে কী যেন একটা চাপা উত্তেজনা লুকিয়ে ছিল। ও প্রান্তে যে ফোনটা ধরে আছে, তার ব্যগ্রতা ঝনঝন করে ধাক্কা মারছে ঋতমের স্নায়ুতন্ত্রীতে!

সে একটু অবাক হয়েই ফোনটা তুলে নেয়, "হ্যালো?"

"বাবা হয়ে মেয়েকে খুন করতে চাও!" ও প্রান্তে একটা বাচ্চার মিষ্টি কচি গলা। মিষ্টত্বের সঙ্গে ঘৃণা, রাগ যেন ওতপ্রোত ভাবে জড়িত, "লজ্জা করে না? ছিঃ!"

ঋতমের বুকের মধ্যে একটা ভয় গুড়গুড় করে উঠল। কে কথা বলছে? কে এ? যে সমস্ত দুরভিসন্ধির কথা জানে! বাচ্চা মেয়ের গলা ঠিকই। কিন্তু বাচ্চার গলায় কি এত বিদ্রূপ, এত ঘৃণা থাকতে পারে! একটা শিশু কি এমন ইস্পাতকঠিন গলায় কথা বলতে জানে!

"কে? কে তুমি?" সে প্রায় পাগলের মতোই চেঁচিয়ে ওঠে, "কী সব যা তা বলছ?"

"যতই চেষ্টা করো, আমায় মারতে পারবে না!" রেশমের মতো পেলব কণ্ঠস্বরে বজ্রনির্ঘোষের মতো ধ্বনিত হল, "আমি আসবই। কেউ আটকাতে পারবে না। তুমিও না।"

ঋতমের পায়ের তলার মাটি যেন থরথর করে কাঁপছে! সে কি পাগল হয়ে গেল! না কোনও বিদেহী আত্মা তার সঙ্গে দূরভাষের তরঙ্গে কথা বলছে! যা শুনছে তা কি ঠিক!

টের পেল, সে দরদর করে ঘামছে। হাত থরথর করে কাঁপছে। তবু কোনওমতে জানতে চাইল, "ক্ক...কে? কে তুমি?"

স্পষ্ট শব্দে উত্তর এল। "আমি নন্দিনী। তোমার মেয়ে।"

ঋতমের হাত থেকে রিসিভারটা সশব্দে মেঝের উপর পড়ে গেল!

বারো

সন্ধ্যার কুসুম-কুসুম আলো নেমে এসেছিল ভদ্রমহিলার মুখে। সাদা শাড়িটায় সূর্যাস্তের কমলা রঙ ছড়িয়ে পড়েছে। সিঁথির সিঁদুরে সোনালি আভা! দিগন্তের প্রশান্তি নেমে এসেছে তাঁর অস্তিত্বে।

প্রদীপ আজও কবরখানায় এসেছে। না, অনিকেতদার সঙ্গে আসেনি। একাই এসেছে। আর তার আগ্রহের মূল বিষয়বস্তু সামনেই বসে আছেন। প্রদীপের হাতে একটা টেপ রেকর্ডার। ভদ্রমহিলার সঙ্গে তার কথাবার্তা সব ওঁর অজান্তেই টেপ করে নেয় সে। এই ক'দিন মহিলার সঙ্গে চমৎকার আলাপ জমিয়ে ফেলেছে। প্রথম প্রথম উনি খুব একটা নিজের কথা বলতে চাইতেন না। প্রশ্ন করলে জবাব দিতেন ঠিকই। তাও কেমন ধোঁয়া ধোঁয়া— স্পষ্ট তেমন কিছু না।

প্রদীপ কিন্তু হাল ছাড়েনি। ধোঁয়ার পিছনে যে আগুন আছে, তা বুঝতে দেরি হয়নি। সে একটু একটু করে মানুষটির কাছে যাওয়ার চেষ্টা করেছে। ওঁর ভিতরে ঢুকতে চেয়েছে। কাজটা খুব সহজ ছিল না। উনি খুব মিশুকে মানুষ নন। তা সত্ত্বেও শেষ পর্যন্ত তাঁর কাছের মানুষ হয়ে উঠতে পেরেছে প্রদীপ। আস্তে আস্তে খুলতে শুরু করেছে পুরনো অধ্যায়ের বিবর্ণ পাতা।

"মেয়েদের জীবনে লক্ষ করে দেখেছি মেয়েরাই বেশি সমস্যার সৃষ্টি করে।" তাঁর চোখে অতীত ঝলসে উঠছিল। "মেয়েরাই আসলে মেয়েদের সবচেয়ে বড় শত্রু। জন্মক্ষণ থেকে যে-নারীদের দেখে এসেছি তার মধ্যে মা আর ঠাকুমাই প্রধান। তুমি কখনও ছেলে সন্তান আর মেয়ে সন্তানের মধ্যে পার্থক্য বুঝেছ? তোমার দিদি থাকলে বুঝতে। তুমি বোধহয় একই সন্তান— তাই না?"

প্রদীপ মৃদু হাসল। "হ্যাঁ।"

"তাহলে ফারাকটা বুঝবে না।" তিনি হাসলেন। "আমি বুঝি। কারণ আমার দুই ভাই ছিল। প্রায় পিঠোপিঠিই বলতে পার। আমার থেকে একজন বছর খানেক, আর একজন বছর দুয়েকের ছোট।" তাঁর চোখদুটো কেমন যেন বেদনার্ত হয়ে উঠেছে। "ভাই বলছি ঠিকই। কিন্তু দিদিগিরি ফলানোর বিশেষ সুযোগ পাইনি।"

"কেন? অল্প বয়েসে বিয়ে হয়ে গিয়েছিল?"

"বিয়ে?" তিনি হেসে ফেললেন, "না...না। কারণটা বিয়ে নয়। কারণটা ছিলেন আমার ঠাকুমা আর বাবা।"

প্রদীপ জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে দেখে ভদ্রমহিলা কৌতুক বোধ করলেন। "আমার ঠাকুমা ছিলেন বেশ কমপ্লিকেটেড ক্যারেক্টার। ভদ্রমহিলা ট্রিমেন্ডাস কষ্ট করেছেন। বাংলাদেশের নোয়াখালির লোক ছিলেন ঠাকুরদা-ঠাকুমা। দেশভাগের পর আমার বাবা মা''কে নিয়ে একবস্ত্রে এদেশে চলে এসেছিলেন। আমার ঠাকুরদা তেমন কিছু করতেন না। বাংলাদেশের লোক তো! প্রচুর জমিজায়গা ছিল। খাওয়া-পরার চিন্তা ছিল না। তিনি একটা কাজই খুব ভাল পারতেন। অভিনয়! শখের থিয়েটারে অভিনয় করতেন। নাটক করেই তাঁর সময় কাটত। আসলে মানুষের অন্নচিন্তা না থাকলে যা হয় আর কী। হাতে অগাধ সময়। সময় তো কাটাতে হবে!"

"হুঁ।"

"কিন্তু এদেশে এসে আর সে সময় রইল না।" তিনি হাসছেন, "সবচেয়ে মজার কথা কী জান! তাঁর লক্ষ্মীমন্ত বউটি সে সময়ে ছেঁড়া ন্যাতা পরে, খেয়ে-না খেয়ে মুখ বুজে জীবনের সঙ্গে লড়ে গেছেন। তখন তাঁর গলার আওয়াজ কেউ শোনেনি। সকলেরই ধারণা ছিল, তিনি অত্যন্ত ভদ্র, নম্র পতিব্রতা স্বভাবের মহিলা। সমস্ত ঝড়-ঝঞ্ঝার সঙ্গে যেভাবে নীরবে লড়েছেন তা সত্যিই প্রশংসনীয়। অথচ মজার ব্যাপার, কষ্টের দিনে যা হয়নি, আনন্দের দিনে তা হল! যখন তেল-সাবান না মেখে, শাক-পাতা, কচু-ঘেঁচু খেয়ে, তেলের অভাবে পোড়া গিলে, ছেঁড়া কাপড় পরে জীবন কাটিয়েছেন— তখন তাঁর কারুর বিরুদ্ধে কোনও অভিযোগ ছিল না। অথচ আস্তে-আস্তে এক সময় যখন গায়ে-মাথায় তেল পড়ল, একটার জায়গায় বছরে দু''টো কাপড় জুটল, রান্নায় তেল পড়ল— সর্বোপরি ছেলের বউয়ের কপালেও যখন সুখ জুটল, তখনই তাঁর চরিত্রের আমূল পরিবর্তন ঘটল। বোবা নারী মুখরা হয়ে উঠল!"

"ইন্টারেস্টিং!"

তিনি ঝরঝর করে হাসলেন। "ইন্টারেস্টিং লাগছে তোমার? ইন্টারেস্টিং তো বটেই। বলতে পার খানিকটা সাইকোলজি। নিজে জীবনে শুধুই কষ্ট পেয়েছেন। স্বামীসুখ বলতে বৎসরান্তে একটি করে সন্তান উৎপাদন! আমার ঠাকুমা বারোটি পুত্রকন্যার জন্ম দিয়েছিলেন। কিন্তু তাঁদের মধ্যে তিনজনই বেঁচে ছিল। বাবা আর তাঁর দুই বোন। বাকিরা কেউ বাঁচেনি। তাই পুত্রবধূর সুখ সহ্য হল না।" একটু থেমে আবার বললেন, "আর্থিক অবস্থা তখনও যে সাংঘাতিক কিছু ভাল ছিল, তা নয়। কিন্তু হ্যাঁ, খেয়ে মেখে থাকা যেত। বাবা কলকাতার জুট মিলে চাকরি করতেন। একটু একটু করে দুই পিসির বিয়ে দিলেন। ঠাকুমার ভয়ে মাকে কিছু উপহার দিতে পারতেন না। যদি বা কলকাতা থেকে একটা মিলের শাড়ি বা স্নো-পাউডার, আলতা এনে দিতেন, তখনই বাড়িতে দাঙ্গা লেগে যেত। ঠাকুমা বাবাকে কিছু বলতেন না। একেবারে অভিযোগের ঝুলি নিয়ে বসে যেতেন ঠাকুরদার কাছে। বলা ভাল, হিস্টিরিক হয়ে উঠতেন। ঠাকুরদার বাপ-বাপান্ত করে বলতেন, "ওই দ্যাখো, তোমার ছেলে বউয়ের ভেড়া হয়েছে! সংসারের টাকা উড়িয়ে শাড়ি এনে দিচ্ছে, স্নো-পাউডার এনে দিচ্ছে। তুমি আমায় কী দিয়েছ? আমার কপালে কোন সুখটা জুটেছে?" বাড়িতে এই নাটক হত, আর মা-বাবা দুজনেই থ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকতেন!"

"ইনফিরিওরিটি কমপ্লেক্স?"

"আমি তো অত সাইকোলজিক্যাল টার্ম বুঝি না। তবে এর পিছনে একটাই মনোভাব থাকত বলে আমার ধারণা। আমি যা পাইনি— অন্য কাউকে পেতে দেব না। তার জন্য হাঙ্গামা করব, সিন ক্রিয়েট করব। এ মনোভাব সংসারে পুরুষদের মধ্যে কতটা থাকে তা আমি জানি না। তবে মেয়েদের মধ্যে যে থাকে, তা আমি স্বচক্ষে দেখে এসেছি।"

বলতে বলতেই ভদ্রমহিলা থামলেন। প্রদীপ একটা সিগারেট ধরাতে যাচ্ছিল। তিনি কড়া চোখে তাকালেন। সিগারেটের ধোঁয়া তার খুকু সহ্য করতে পারে না। বাধ্য হয়ে প্রদীপ সিগারেটটা ফের প্যাকেটের মধ্যে রেখে দিয়ে বলল, "তারপর?"

"ঝামেলাটা আরও বাড়ল যখন ঠাকুরদা মারা গেলেন। তখন অধিকারের লড়াইটা তুঙ্গে উঠল। স্বামী নেই। একমাত্র অবলম্বন ছেলে। তাঁকে পুত্রবধূর করায়ত্ত হতে কী করে দিতে পারেন তিনি! ফলস্বরূপ অদ্ভুত অদ্ভুত বাহানা শুরু হল। মাঝরাতে উঠে ছেলের কাছে চলে আসতেন। বলতেন— ঘুম আসছে না। তিন ছেলেমেয়ের বাবা, এক নারীর স্বামী— তাকে নিয়ে টানাটানি। ঠাকুমা বোধহয় প্রায় মানসিক রোগী হয়ে গিয়েছিলেন। আবদার করতেন, বাবাকে ছাড়া শোবেন না। বাবার কিছু করার ছিল না! অসহায় দৃষ্টিতে মায়ের দিকে তাকাতেন। বলতেন, "একটু সহ্য করে নাও... মায়ের তো বয়েস হয়েছে। আর কত দিনই বা আছেন? একটু মানিয়ে নাও।"

"মা নিশ্চুপে মানিয়ে নিলেন। দিনরাত কাজের মধ্যেই ডুবে থাকলেন। সে কি প্রাণান্তকর কাজ! চোখের সামনে দেখলাম— মা কেমন যেন হয়ে যাচ্ছেন। দিনে হাজারবার ঘর মুছতেন। কত বার যে স্নান করতেন তার ইয়ত্তা নেই। তখন বুঝতাম না। এখন বুঝি। তোমরা ভাব, ছেলেদেরই শুধু একতরফা কামপ্রবৃত্তি আছে। আমি জানি মেয়েদেরও আছে। তাদের শরীর আছে। সে শরীরেও আগুন জ্বলে। ছেলেরা সে আগুন নেভাতে অন্য নারীর কাছে যেতে পারে। মেয়েদের স্বামী ছাড়া উপায় নেই। আর আমার মায়ের সেই একমাত্র উপায়টিও ছিল না। তাই জ্বালা জুড়োতে পঞ্চাশবার স্নান করতেন। সবাই ভাবল— শুচিবায়ুগ্রস্ত! বাবাও ভাবলেন তাই। আসল ঘটনাটা তখন বুঝেছিলেন একজনই। কিন্তু তিনি তখন হিংস্র আনন্দে মশগুল। নিজে একজন নারী হয়ে আর এক নারীর যন্ত্রণা বুঝলেন ঠিকই, কিন্তু যন্ত্রণা উপশম করার চেষ্টাই করলেন না। বরং খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে তাকে রক্তাক্ত করে তুললেন।"

ভদ্রমহিলা থেমে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। প্রদীপ চুপ করে

আছে। সে খুব ভাল শ্রোতা। জিজ্ঞাসু দুটো চোখ মেলে তাকিয়ে আছে কথকের দিকে।

"আমার বয়েস তখন খুব অল্প। বড় ভাইটা একটু বড়। ছোটটা একেবারেই হামাগুড়ি দিচ্ছে। আমি দেখতাম, সারাদিনের হাড়ভাঙা খাটুনির পর মা রাতে বিছানায় শুয়ে এপাশ ওপাশ করছেন। শীত, গ্রীষ্ম, বর্ষা নেই— কখনও রাত দুটোয় পুকুরে ডুব দিচ্ছেন, কখনও সকাল চারটেতে। আমার চোখের সামনেই তাঁর চোখে কালি পড়ল। আমার চোখের সামনেই তিনি প্রথমে আস্তে আস্তে কাশতে শুরু করলেন। তারপর শুরু হাঁপানি। শেষ পর্যন্ত কাশির সঙ্গে রক্তের ছিটে তুলতে তুলতে একদিন একদম চুপ হয়ে গেলেন। আর স্নান করলেন না, ঘর মুছলেন না। বাবা বলেছিলেন— মানিয়ে নাও। মা মানিয়ে নিতে নিতে শেষ হয়ে গেলেন।"

তাঁর চোখ বেয়ে গভীর যন্ত্রণায় টপটপ করে জল পড়ছে। অশ্রুসিক্ত গলায় আত্মমগ্ন ভাবে বললেন, "মরে গিয়েও মহিলা প্রশংসা কুড়োতে পারলেন না জান? তোমরা আর জানবে কী করে? তোমরা এখনকার পুরুষ মানুষ। তাই জান না, সংসারে যদি স্ত্রীর নাটকীয় মৃত্যু হয় তবে সে কখনওই হাততালি পায় না। বরং শুনতে হয়, বড় অসুবিধা করে দিয়ে গেল। ঠাকুরমার দুঃখের শেষ রইল না যে, তাঁর খোকাকে একলা অসহায় ফেলে মহিলা দিব্য সতী সাধ্বীর মতো ড্যাং ড্যাং করে চলে গেল। তিনি নিজে সধবা অবস্থায় মরতে পারেননি। তাঁর মৃত্যুর পর কেউ তাঁকে প্রণাম করতে আসবে না। পায়ের আলতা নিয়ে কাড়াকাড়ি করবে না। অথচ মা কেমন লাল বেনারসি পরে রাজেন্দ্রাণীর মতো চলে গেলেন। জীবনের সুখ তো সহ্যই হয়নি। মৃত্যুর বিলাসিতাও অসহ্য। আমার মাঝেমধ্যে মনে হয়..." তাঁর চোখ যেন চলে গেছে অনেক দূরে, "আমার মনে হয়, ভীষণ নৃশংস ইচ্ছে ছিল ঠাকুমার। তিনি মায়ের মৃত্যু চাননি। আমার সন্দেহ, তিনি মায়ের বৈধব্য চেয়েছিলেন!

"মায়ের মৃত্যুর পর বাবার এদিকের টান বিশেষ ছিল না। তিনি কলকাতাতেই সেটল্‌ড হয়ে গেলেন। সঙ্গে নিয়ে গেলেন আমার দুই ভাইকে। আমায় নিয়ে গেলেন না। আসলে আমি কখনওই কারুর কাছে কাম্য ছিলাম না। সেটা ঠাকুমার তির্যক ব্যবহারে বুঝতেই পারতাম। মায়ের অবর্তমানে একটা দশ বছরের কচি মেয়ে প্রাণপণে তার বাবাকে আঁকড়ে রাখতে চেয়েছিল। মা যে-পরিমাণ কাজ করতেন, তার পক্ষে তা করা সম্ভব ছিল না। তবু সে বাবার হুঁকোটা সাজানোর চেষ্টা করত। বাবা স্নানে গেলে তেল, গামছা, ধুতি এগিয়ে দিত। ক্লান্ত হয়ে বাড়ি ফিরলে জলের গ্লাস এগিয়ে দিত। খাবার বেড়ে দিত। মাথায়, গায়ে তেল মালিশ করে দিত। প্রাণপণে সে প্রমাণ করার চেষ্টা করেছিল যে, বাবার জীবনে তারও প্রয়োজনীয়তা আছে! কিন্তু সব চেষ্টাই ব্যর্থ হল, যখন বাবা পুত্র সন্তান দুজনকে মানুষ করার প্রকল্পে কলকাতায় নিয়ে গেলেন। আর আমাকে রেখে গেলেন ঠাকুমার কাছে। বোধহয় আমার মানুষ হওয়ার প্রয়োজনীয়তা ওঁদের দুজনের কেউই অনুভব করেননি।

"আমি রয়ে গেলাম ঠাকুমার কাছে। রোজ সকালে দেখতাম আমার বয়েসি ছেলেরা স্কুলে যাচ্ছে। আমারও খুব ইচ্ছে ছিল পড়াশোনা করার। আমার দুই ভাই তো কলকাতায় পড়াশোনাই করছে। তবে আমি কেন করব না?

"ঠাকুমাকে বললাম, ও ঠাম্মা, আমায় ইস্কুলে ভর্তি করে দাও। আমিও পড়াশোনা করব।"

"তিনি মুখ ঝামটা দিয়ে বললেন, আঁটকুঁড়ির বেটি বলে কী! ম্লেচ্ছ হয়েছিস— যে, মোজা পরে ইস্কুলে যাবি? মেয়েদের পড়াশোনা করতে নেই। এত বড় ধিঙ্গিটা হয়েছ, আর এটুকু বোঝো না?"

"যেহেতু আমি ধিঙ্গি হয়েছি তাই পড়াশোনার চেয়ে ঘরকন্নার কাজ শেখা জরুরি। ঠাকুমা আমায় যত্ন করে রান্নাবান্না শেখাতে শুরু করলেন। ঘুঁটে দিতে, গুল দিতে শেখালেন। গনগনে উনুনের আঁচে চোখ জ্বালা করত। ধোঁয়ায় দমবন্ধ হয়ে আসত। কাশি পেত। তবু ছুটি নেই। একবার সারা গায়ে গরম তেল পড়ে গিয়ে অনাসৃষ্টি কাণ্ড হয়েছিল। এখন ভাবি, মরে যেতে পারতাম। কিন্তু মরণেরও ছেলেদের প্রতি পক্ষপাত বেশি। দামি জিনিসের প্রতি সকলেরই লোভ, মাটির ঢ্যালার দিকে কারওর নজর নেই।

"গ্রামে থাকতে আমার সময় কাটত ঘরকন্নার কাজ করে। ঠাকুমা নিজে কিছু করতেন না। তবে আমার কাজে ত্রুটি ধরার ক্ষেত্রে তাঁর কোনও খামতি ছিল না। আমারও দোষ ছিল। রান্না চাপিয়ে দিয়ে আমি ঠাকুমাকে লুকিয়ে চু-কিতকিত খেলতে যেতাম। ফলস্বরূপ কোনও দিন শাক পুড়ে ঝ্যাড়ব্যাড়ে! কখনও বা দুধ পুড়ে গেল। তার শাস্তিও জুটল। ঠাকুমা পুকুরে যাওয়ার পথে একদিন আমায় খেলতে দেখে ফেললেন। আমার খেলার ওখানেই ইতি।

"তবু এর মধ্যেও যে কিছু ভাল ছিল না— এমন নয়। রাতে ঠাকুমার কাছেই শুতাম। তাঁর আবার বাতের ব্যথা ছিল। হাত পা মালিশ করে দিতে হত। মালিশ করতে করতে তাঁর মুখে নানারকম গল্প শুনতাম। কখনও সাবিত্রী-সত্যবানের গল্প। কখনও বেহুলা-লখিন্দর। শুনতে শুনতে মনে হত, আচ্ছা— সব সময় কেন মেয়েরাই স্বামী মারা গেলে তাঁকে ফিরিয়ে আনার জন্য তপস্যা করবে? কখনও তো শুনিনি যে, স্ত্রী মারা যাওয়ার পর স্বামী তাকে ফিরিয়ে এনেছে। ঠাকুরদা মারা যাওয়ার পর ঠাকুমা চুল কেটে ফেলেছেন। সাদা থান ছাড়া কিছুই পরেন না। নিরামিষ খান। একাদশীর দিন নিরম্বু উপবাস রাখেন। কঠোর নিয়ম নিষ্ঠা পালন করেন। কই, মা চলে যাওয়ার পর বাবা তো এসব কিছু করেননি! সংসারের দুটো মানুষের জন্য দুরকম নিয়ম! এমন কেন হবে?

"তখন থেকেই কেন জানি না, সংসার নামক জিনিসটার উপর একটা বিতৃষ্ণা এসে গিয়েছিল। আমার একটি বান্ধবী ছিল। বীণা। আমরা আগে একসঙ্গে কিতকিত খেলতাম। পরে সে আমার বাড়িতে আসত। তার বিয়ের খুব শখ ছিল। গ্রামে কারওর বিয়ে হলে দৌড়ে-দৌড়ে বউ দেখতে যেত! নতুন বউয়ের সাজসজ্জা দেখতে তার খুব ভাল লাগত। বলত, 'দেখবি, আমিও এমন লাল বেনারসি পরব। হাতে চুড়ি ঝমঝম করবে। গলায় এই অ্যাত্তবড় হার! নাকে নথ, পায়ে মল— সিঁথিতে টিকলি দেব।...যখন আমার বিয়ে হবে, তখন আমি খুব সাজব... সব থেকে বেশি সাজব। তোরা আমাকে দেখতে আসবি না?'

"আসলে বিয়ে ব্যাপারটা কী সেটা বোঝার বয়েস তার তখনও হয়নি। সে শুধু সাজতে বড় ভালবাসত। তখনই সে একগাদা কাচের লাল-নীল রেশমি চুড়ি পরত। মেলা থেকে পুঁতির হার কিনে আনত। কাজল পরতে খুব ভালবাসত মেয়েটা।"

তিনি আবার কিছুক্ষণের জন্য স্তব্ধ হলেন। একটু থেমে ফের বিড়বিড় করে বললেন, "বীণার বিয়ে হয়েছিল অগ্রহায়ণে। আর মাঘেই সে সিঁদুর মুছে বাপের বাড়িতে চলে এল। তখন ওলাওঠায় গ্রামের পর গ্রাম উজাড় হয়ে যাচ্ছিল। যম বীণার বরকে নিলেন। ওকে নিলেন না। মেয়ের প্রাণের মতো তুচ্ছ জিনিস নিয়ে কী করবেন? সে সাজতে বড় ভালবাসত। কোমর অবধি লম্বা চুল ছিল। সেই চুলে গন্ধতেল মাখত। সেই চুল একেবারে ছোটছোট করে ছেঁটে দেওয়া হল। সাদা থান পরিয়ে দেওয়া হল। দুপুরবেলায় ভাত খেয়ে সেই ভাতের থালায় জল ঢেলে, হাত দিয়ে পিঁড়ির উপরেই শুয়ে থাকত, যদি কোনওমতে সে থালা ছেড়ে উঠে যায়, তবে বিকেলে আর তার খাওয়া জুটবে না!

"বীণা বলত, জানিস, আমায় না রাতের বেলায় নিশিতে ডাকে!

"অবাক হয়ে যাই। 'নিশি'র নামটা শোনা ছিল। কিন্তু তার ডাক কেমন, সে বিষয়ে সম্যক ধারণা ছিল না। বীণার কাছে জানতে চাইলাম। সে বলল, ওই জানলায় কাদের যেন হাত দেখতে পাই। হাত নাড়িয়ে ডাকে আয়...আয়...।

"তুই দেখেছিস নিশিকে?

"বীণা চোখ গোল গোল করে বলে, মরণ! আমি দেখতে যাই! জানিস না, একবার নিশিতে কাউকে ডেকে নিয়ে গেলে সে আর বাড়ি ফেরে না।

"আজ বুঝতে পারি বীণাকে নিশিতে ডাকত না। নিশাচরেরা

ডাকত। সে সুন্দরী ছিল। তাই রাতের বেলায় অনেক শেয়াল, হায়েনা তার জানলার কাছে ঘুরঘুর করত। শেষপর্যন্ত সে নিশির খপ্পরে পড়ল কি না জানার ইচ্ছে ছিল। কিন্তু ভাগ্যের ফেরে আবার আমার কপালে দুর্যোগ দেখা দিল! ঠাকুমা এক রাতের ভেদবমিতে শেষ পর্যন্ত শোক-তাপের পৃথিবী ছেড়ে বৈকুণ্ঠে গমন করলেন। খবর পেয়ে বাবা দুই ভাইকে নিয়ে গ্রামে এলেন। শ্রাদ্ধ-শ্রাস্তি সেরে এবার এখানকার পাট গুটিয়ে আমাকে নিয়ে কলকাতায় চললেন। আমার উন্নতির জন্য নিলেন না! অসহায় মেয়েটাকে ফেলে যাওয়ার উপায় ছিল না বলে বাধ্য হয়েই সঙ্গে নিলেন। যেমন লোক ঘাড়ে বোঝা নিয়ে চলে!

"কলকাতায় এসে দেখি, সে এক এলাহি ব্যাপার! কত গাড়ি ঘোড়া দিনরাত ছোটাছুটি করছে! ঘরঘর করে চলে যাচ্ছে লম্বা-লম্বা গাড়ি! পরে জেনেছিলাম ওর নাম ট্রাম! কত বড় বড় বাড়ি! কোনটা স্কুল, কোনটার নাম কলেজ, কোনটা ইউনিভার্সিটি, কোনটার আবার নাম অফিস। শয়ে শয়ে মানুষ পিল পিল করে সেখানে ঢুকছে আর বেরোচ্ছে।

"আমরা এসে উঠলাম হাতিবাগানের একটা পাকাবাড়িতে। ভাড়া বাড়ি। ভাড়াবাড়ি আর নিজের বাড়িতে পার্থক্য কী, ঠিক জানতাম না। কিন্তু জায়গাটা আমার মন্দ লাগল না! রোজ সকালে আমার দুই ভাই জামাকাপড় পরে স্কুলে যেত। আমি ডাল, ভাত, আলু পটলের তরকারি রান্না করে দিতাম। বাবাও তাই খেয়ে কাজে চলে যেতেন। তারপর আমার অখণ্ড অবসর। আমি পাশের ঘরের বেলার সঙ্গে সই পাতালাম। ওর কাছ থেকে কখনও একটু স্নো পাউডার মুখে মেখে দেখতাম। কখনও চুড়ি পরতাম ভাগাভাগি করে। ওর মুখেই শুনেছিলাম, কলকাতায় মেয়েরাও পড়াশোনা করতে পারে। শোনা অবধি উত্তেজনার শেষ ছিল না!

"সেদিন রাতে বাবা ফিরতেই বায়না ধরলাম, আমিও ভাইদের মতো পড়াশোনা করব। আমাকেও স্কুলে ভর্তি করে দাও।

"বাবা হুঁকোয় টান মারতে মারতে আলগোছে বললেন, দেখি।

"দেখা আর তাঁর হয়ে উঠল না। আমি কী করে বুঝব যে, তাঁর জুটমিল প্রায় বন্ধ হওয়ার মুখে। কয়েক দিন পরে আমাদের মাথার উপরে আর ছাত থাকবে না! পেটে ভাত থাকবে না! ছ'মাসের ভাড়া বাকি হয়েছে। বাড়িওয়ালা রোজই প্রায় তাগাদা দেয়। মুদির দোকানে একরাশ ধার— যা মেটানোর ক্ষমতা বাবার নেই। যখন বুঝলাম, তখন অনেক দেরি হয়ে গেছে। বাড়িওয়ালা বাড়ি থেকে ঘাড়ধাক্কা দিয়ে বের করে দিল। আমরা রাস্তায় এসে পড়লাম। আমার সর্বসাকুল্যে দুটো ফ্রক ছিল। তার একটা ছিঁড়ে কোনওমতে তাঁবুর মতো ছোট্ট একটা ঢাকা দেওয়া আস্তানা তৈরি হল। আর একটা আমি পরেই থাকতাম। স্নান করে ভিজে জামা গায়েই শুকোতাম। বাবা সারাদিন কোথায় কাটাতেন জানি না। অনেক রাতে ফিরতেন। কখনও তাঁর হাতে একটা ঝোলা থাকত, কখনও থাকত না। যেদিন ঝোলা থাকত, সেদিন তার ভিতরে সরু, মোটা খানিকটা চাল মেশানো থাকত, কখনও কলমি শাক, কখনও বা ক'টা আলু। যা পেতাম, ভাগ যোগ করেও চারটে মানুষের পেট ভরত না। বাবা বারবার বলতেন, আমাদের প্রতিপালন করা তাঁর পক্ষে ক্রমাগতই কষ্টকর হয়ে উঠছে। চারটে পেটের ভার বড় ভার! বাবার পক্ষে অতটা দায়িত্ব নেওয়া সম্ভব ছিল না। একদিন রাতে বললেন, তিনি নতুন একটা কাজ পেয়েছেন। পরদিন সকাল সকালই বেরিয়ে পড়তে হবে। নতুন কাজের ঠিকানাটা কী, সেটা অবশ্য বলেননি। শুধু এইটুকু জানলাম, পরদিন সকাল সকাল আমাদের হাওড়া স্টেশনে পৌঁছতে হবে। সেখান থেকে ট্রেন ধরতে হবে। ভদ্রমহিলা আপনমনে কী ভেবে চুপ করে রইলেন কিছুক্ষণ।

আবার শুরু করলেন, "পরদিন খুব ভোরে বাবার হাত ধরে হাওড়া স্টেশনে পৌঁছলাম। ওরে বাবা, সে কত বড় স্টেশন! সারে সারে রেলগাড়ি দাঁড়িয়ে আছে। কোনওটা আবার ভোঁ ভোঁ করে হুইসল দিচ্ছে। কত লোক অত ভোরেও ট্রেনে ওঠার জন্য ব্যস্তসমস্ত হয়ে দৌড়চ্ছে! কী বিরাট বিরাট থাম! কত উঁচু ছাত! আমার চোখে যেন ধাঁধাঁ লেগে গেল!

"তুই এখানে দাঁড়া। বাবা আমায় বড় ঘড়িটার ঠিক নীচে দাঁড় করিয়ে দিয়ে বললেন, আমি দেখি, যদি খাবারদাবার কিছু পাওয়া যায়।

"আমার একা একা থাকতে ভয় লাগছিল। বললাম, ভাইরাও এখানে থাক না!

"ওরা ছোট। এক জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকতে পারবে না। দৌড়োদৌড়ি করবে। বাবা দুই ভাইয়ের হাত শক্ত করে ধরলেন, তুই এখানে দাঁড়া। এখান থেকে কোথাও নড়বি না কিন্তু। একদম এই বড় ঘড়িটার নীচে দাঁড়িয়ে থাকবি। আমি এক্ষুনি আসছি।

"বাবা ভাইদের নিয়ে ভিড়ের মধ্যে হারিয়ে গেলেন। আমি তাঁর কথামতো বড় ঘড়িটার নীচে দাঁড়িয়ে রইলাম।"

ভদ্রমহিলার চোখ বাষ্পাচ্ছন্ন হয়ে এল। "আমি দাঁড়িয়েই রইলাম। বাবা এলেন না! সকাল গড়িয়ে দুপুর হল— দুপুর গড়িয়ে বিকেল। বাবা ভাইদের নিয়ে আর ফিরলেন না! আমি তখনও বড় ঘড়িটার নীচে ঠায় দাঁড়িয়ে! খুব খিদে পেয়েছিল। খুব জলতেষ্টা পাচ্ছিল। তার থেকেও বেশি ছিল ভয়! আমি কী করে জানব বাবা আমায় ওখানেই ফেলে গেছেন! আমি চিরকালীন অপ্রয়োজনীয় ছিলাম। তাই ছেঁড়া জুতোর মতো ওখানেই ফেলে রেখে গেছেন। ভাই দু"জন তাঁর ভবিষ্যৎ গড়ে দেবে, তাই তাদের সঙ্গে নিয়ে গেছেন। আমি তো তা পারতাম না! তাই আমি পড়ে রইলাম ওই বড় ঘড়িটার নীচে... একা। ভয়ে জড়সড়! নিজের আপনজনদের কাছ থেকে প্রত্যাখ্যাত, বেওয়ারিশ...!"

ভদ্রমহিলা মাথা নিচু করে কবরে হাত বোলাচ্ছেন। তাঁর আচরণে নিঃসীম নিঃসঙ্গতা ছিল। যেন এখনও তিনি দাঁড়িয়ে আছেন সেই বড় ঘড়িটার নীচে! যেন এখনও তাঁর দুচোখ খুঁজে বেড়াচ্ছে আপনজনদের! যেন আজও তিনি প্রত্যাখ্যাত! গভীর যন্ত্রণা তাঁর চোখ বেয়ে মিশে যাচ্ছিল আদরের সন্তানের কবরে। মায়ের যন্ত্রণা তরল অশ্রুর মাধ্যমে পৌঁছে গেল মেয়ের কাছে।

প্রদীপ নিঃসঙ্গতার সঙ্গে তাল মিলিয়ে চুপ করে রইল।

তেরো

"কী বলছিস!"

স্নিগ্ধার কথা শুনে আলোর চক্ষু চড়কগাছ। কী বলবে ভেবে পাচ্ছে না! এ কি সত্যি! না স্নিগ্ধার কল্পনা!

একটু আগেই সে ঘুম থেকে উঠেছে। অফিসে যাওয়ার জন্য তৈরি হচ্ছিল। ঘুমে ঢুলু ঢুলু চোখ। টয়লেটের আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে খুব মন দিয়ে ব্রাশ করছে। বেসিনের কলটা থেকে তিরতির করে জল পড়ে যাচ্ছিল। এই হাল্কা জলের তিরতির আওয়াজটা শুনতে বড় ভাল লাগে আলোর। মাঝেমধ্যেই আয়নার দিকে পটলচেরা চোখ করে তাকাচ্ছে! সকালের এই সময়টুকু তার নিজস্ব। কেউ বিরক্ত করবে না। চতুর্দিক শান্ত! কোনও কোলাহল নেই! শুধু রান্নাঘর থেকে ছ্যাঁকছোঁক আওয়াজ আসছে। শ্রীযুক্ত বংশী আজকাল এ বাড়ির হেঁসেলের দায়িত্ব নিয়েছেন। আলোর পক্ষে অফিস আর ঘর সামলানো ক্রমশই কষ্টকর হচ্ছে দেখে বিক্রমদার হঠাৎ নিজেরই ড্রাইভ করার শখ হল! অগত্যা বংশী ও সংসার থেকে এ সংসারে। স্টিয়ারিং ছেড়ে তার নতুন ভেঞ্চার এখন হাতা-খুন্তি!

এর মধ্যেই হঠাৎ সেলফোন বাজতে শুরু করেছে। দাঁত ব্রাশের চোটে টুথপেস্টের ফেনায় ফেনায় তার বেশ সান্টাক্লজের মতো চমৎকার একটা গোঁফ তৈরি হতে যাচ্ছিল। কিন্তু তার আগেই সব ভণ্ডুল। সে ভাল করে কুলকুচি করে, চোখে মুখে জলের ঝাপটা দিয়ে ফোনটা তুলল।

ফোনের ও প্রান্তে স্নিগ্ধা। সে চাপা গলায় যা বলল তাতেই চক্ষু চড়কগাছ আলোর। সে উত্তেজনার চোটে ভেজা টাইলসের মেঝেতে আছাড় খেতে খেতে বেঁচে গেল। কোনওমতে বলল, "কী বলছিস! এ তো ব্রেকিং নিউজ! আগের দিন তো বলিসনি। তখন ফোনটা

এসেছিল?"

ও প্রান্ত থেকে স্নিগ্ধা জানায়, "অনেক আগেই আমি ফোনটা পেয়েছিলাম। কিন্তু তখন ভেবেছিলাম যে, আমারই বোধহয় মাথা খারাপ হয়েছে। কিন্তু কাল যা হল, তারপর তুই কী বলবি? কাল ঋতমও সেই ফোনটা পেয়েছে!"

"এমন কাণ্ডের কথা আমি জন্মে শুনিনি স্নিগ্ধা!" আলো বলে, "ঋতমও যখন ফোনটা পেয়েছে তখন এটা তোর একার ভুল হতেই পারে না। আবার তোরা দুজনেই একই মানসিক রোগের শিকার— এটাও অসম্ভব! সুতরাং আর কিছু হোক, না হোক— ফোনটা বাস্তব, মানতেই হবে।"

স্নিগ্ধা চুপ করে যায়। আলোর কথাটা সে নিজেও বিশ্বাস করে। ফোনটা নিঃসন্দেহে বাস্তব। কিন্তু ফোনের ও প্রান্তের মানুষটি? সে কে?

"দ্যাখ, আমি এ জাতীয় ঘটনার কথা কখনও শুনিনি!" আলো বলে, "হ্যাঁ, বিদেশি সাহিত্যে এমন ঘটনা আছে বটে। গর্ভস্থ ভ্রূণ মা-বাবার সঙ্গে কথা বলছে। কিংবা ফিল্মে দেখেছি— অ্যাবটেড চাইল্ড ভূত হয়ে ধরতে আসছে এটসেট্রা...এটসেট্রা...! কিন্তু সবটাই ফ্যানটাসি। বাস্তবে এমন ঘটনা সম্ভব নয়।"

স্নিগ্ধা খানিকটা নিস্তেজ গলায় বলে, "প্রথমে আমরাও তাই মনে হয়েছিল। কিন্তু আলো, বাচ্চা মেয়েটা আশ্চর্যজনক ভাবে সব কিছু জানে! এমনকী যা শুধুমাত্র আমি জানি, তা তো জানেই। যা জানি না, তাও জানে! একটা থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার নাম্বার জানবে কী করে যে, ঋতমদের মনে কী আছে। ওরা কী মতলব ভাঁজছে। আর সে এ কথাই বা জানবে কী করে যে, আমি কী ভাবছি।"

"হুঁ।" আলো চিন্তান্বিত ভাবে বলে, "দ্যাটস আ মিলিয়ন ডলার কোয়েশ্চেন। ফোনের ও প্রান্তে যে-ই থাক, সে দুইপক্ষের সব কথাই জানতে পারছে কী করে? ভ্রূণহত্যার প্রতিবাদে শিশুকন্যার টেলিফোন। এটা একটা মারাত্মক নিউজ় হতে পারে, জানিস?"

"না...না।" স্নিগ্ধা ঘাবড়ে যায়। "এই জন্যই জার্নালিস্টদের সঙ্গে কথা বলতে ইচ্ছে করে না! তোরা সব সময়েই নিউজ় খুঁজে বেড়াস!"

"ওকে...ওকে!" আলো হেসে ফেলল। "ঠিক আছে। নিউজ়ের কথা বাদ দিলাম। কিন্তু ফোনটা কে করছে সেটা তো জানা চাই!"

"ঋতমরা অলরেডি ট্রাই করেছে।" সে ধীরে ধীরে বলে, "ও আর বাবা— দুজনে মিলে সি এল আই-এর রেকর্ড চেক করেছে। কিন্তু সি এল আই যে-রেকর্ড দেখাচ্ছে, সেটা অসম্ভব!"

"কী বলছে সি এল আই রেকর্ড?"

"সি এল আই রেকর্ড অনুযায়ী যে-ফোনগুলো এসেছে, সেগুলো সবই একতলার হলঘরের ফোনটা থেকে এসেছে। হলঘরের ফোনটা সচরাচর ঋতম আর বাবা ছাড়া আর কেউ ইউজ় করে না!" স্নিগ্ধা উত্তেজিত। "তার মানে বুঝতে পারছিস? এ বাড়ির ফোন থেকেই নন্দিনী আমায় সব ফোনগুলো করেছে!"

"ইম্পসিবল!" আলোর মাথায় সবটাই তালগোল পাকিয়ে যায়। ও বাড়িতে কোনও বাচ্চা নেই! তাহলে বাচ্চার গলাটা আসছে কোথা থেকে? অন্য বাড়ির বাচ্চা ও বাড়িতে ঢুকেই বা ফোন করবে কেন? এ আর যাই হোক, কোনও শিশুর দুষ্টুমি নয়!

"আলো!"

সে অন্যমনস্ক হয়ে গিয়েছিল। সম্বিত ফিরে পেয়ে বলল, "হ্যাঁ, বল।"

"আমার খুব ভয় করছে!" স্নিগ্ধার কণ্ঠস্বর জড়োসড়ো, "আমি কিছুই বুঝতে পারছি না। আগে আমি একাই ফোনটা পেতাম। এখন ঋতমও জেনে গেছে।"

"দাঁড়া।" আলো একটু ভেবে নিয়ে বলে, "ভয় পাস না। টেলিফোনটা যে-ই করুক, সে তোর ক্ষতি চায় না, এটা তো স্পষ্ট।"

"সে জন্য নয়।" সে একটু চুপ করে থেকে বলল, "শাশুড়ি মা বলছেন দুটো ল্যান্ডফোনের নম্বরই পালটে ফেলবেন। নম্বর পালটে গেলে নন্দিনী আমায় আর ফোন করতে পারবে না। আমি আবার একা হয়ে পড়ব।"

আলোর কিছু বলার ছিল না! স্নিগ্ধা ফোন আসাটাকে ভয় পাচ্ছে না। বরং ফোন বন্ধ হয়ে যাওয়াকে ভয় পাচ্ছে! তার মনোভাব সে বুঝতে পারছে। যক্ষপুরীতে আটকে পড়া অসহায় এক নারী! যার সন্তানকে কেড়ে নেওয়ার প্রচেষ্টা সব সময়ই চলছে। একমাত্র যে-অবলম্বনের জোরে সে লড়ে যাচ্ছিল, সেই অবলম্বনটুকুও বোধহয় এবার গেল!

"স্নিগ্ধা, ভাল করে ভেবে দ্যাখ," সে বলে, "যা হচ্ছে তা কিন্তু ইললিগ্যাল। তুই অনায়াসে পুলিশের কাছে যেতে পারিস। তোর যদি মিডিয়া সার্পোট লাগে..."

"নাহ!" স্নিগ্ধা হতাশ স্বরে বলল, "তাতে লাভ কী? তুই কি ভাবছিস, এঁরা আমায় পুলিশের কাছে যেতে দেবেন? ঋতমের বড় কাকা পুলিশের হোমরাচোমরা অফিসার। মেজ কাকা এম এল এ! ছোট কাকা আই এ এস! এফ আই আর করার আগেই ধামাচাপা পড়ে যাবে। পুলিশ সাগ্রহে আমার কথা শুনবে। চা-মিষ্টি খাওয়াবে। তারপর ঋতমের বাবাকে ফোন করে বলবে, স্যার, আপনার পুত্রবধূর সামান্য মিস-আন্ডারস্ট্যান্ডিং হয়েছে... উনি একটু আগেই এসেছিলেন...হ্যাঁ হ্যাঁ স্যার, আপনাদের ফ্যামিলিতে কি এমন ঘটনা ঘটতে পারে ...ছি ছি ছি.... আমরা কিছুই ভাবিনি! আপনাদের ঘরের ব্যাপার... ঘরেই মিটিয়ে নিন। আমরা হস্তক্ষেপ করছি না। নে, তোকে পুলিশে যাওয়ার গোটা সামারি শুনিয়ে দিলাম। এবার বল কী করব? বাড়ি থেকে বেরনোর স্বাধীনতা তো গেছেই— যেটুকু বাকি আছে, তাতেও বেড়ি পড়বে।"

"পড়বে না!" আলো জবাব দেয়, "আমরা হল্লা করব। এই দু"হাজার তেরো সালে শিক্ষিত, অভিজাত বংশে কন্যাভ্রূণ হত্যার চেষ্টা চলছে। এর থেকে বড় খবর আর কী হতে পারে?"

"তুই কি সব সময়ই খবর খুঁজিস?" স্নিগ্ধা বিরক্ত, "তোর কি ধারণা, তুই হল্লা করবি আর রায়চৌধুরী পরিবার মেনে নেবে? প্রতিহিংসা খুব মারাত্মক জিনিস আলো। আমি চাই না, আমার সমস্যার সমাধান করতে গিয়ে তুই কোনও বিপদে পড়িস। তাছাড়া এখন হল্লা করার সময় নয়। ঠান্ডা লড়াই চলছে চলুক। এখনই ম্যাটারটা পাবলিক করতে চাই না। প্রয়োজন পড়লে আমি নিজেই তোর হেল্প চাইব।"

"টিপিক্যাল গৃহবধূ— সর্বংসহা ধরিত্রী!" আলো ভুরু কুঁচকে বলে, "তাহলে ফোনটা করেছিস কী করতে!"

"প্রয়োজন আছে।" উত্তর এল। "ঋতমরা যা চায় না, আমি তা চাই। আমি চাই সেই মানুষটিকে খুঁজে বের করতে যে আমায় ফোন করছে। আর তার দায়িত্ব তোকে দিলাম। তুই ক্রাইম রিপোর্টার। গোয়েন্দাগিরিতে এক্সপার্ট। ঠিক খুঁজে বের করতে পারবি। সেই লোকটিকে আমার খুব প্রয়োজন আলো। আরও একটা কথা...।"

"বল।"

"আরও কয়েক সপ্তাহ আমি খুব বিপদে আছি। আমার মেয়ের বয়েস মাত্র তেরো সপ্তাহ। মানে তিন মাস। আরও চার মাস আমায় টানতে হবে। সাত মাসের পর আর অ্যাবরশন করা যাবে না। এরা আমার জীবনের কোনও রিস্ক নেবে না।"

"এতটা কনফিডেন্ট হচ্ছিস কী করে?"

স্নিগ্ধা হাসল, "তুই এদের কুসংস্কারের লেভেল জানিস না। আমার বিয়ের পরই ঋতমদের বিজনেসে বিরাট বুম এসেছে। কোটি কোটি টাকার বিজনেস করছে ওরা। ওদের কাছে আমি লক্ষ্মী। ওরা আমার কোনও ক্ষতি হতে দেবে না।"

"বাঃ," ব্যঙ্গ মিশল আলোর কণ্ঠে, "বউ লক্ষ্মী, মেয়ে লক্ষ্মী নয়?"

"জানি না," সে হতাশ স্বরে বলে, "যাই হোক, সাত মাসের পর ওরা আমার জীবন বিপন্ন করে অ্যাবর্ট করানোর চেষ্টা করবে না। কিন্তু তত দিন কি চেক-আপ ছাড়া থাকব? আপাতত আমায় ঋতম কোনও ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাবে বলে মনে হয় না। আর ডঃ সিন্‌হার কাছে আমি যাব না। কিন্তু..."

"হ্যাঁ। মাস্থলি চেক-আপ দরকার," আলো বলল, "একটা কথা

বল। তুই বাড়ি থেকে বেরোতে পারবি না। কিন্তু আমি কি তোর বাড়িতে ঢুকতে পারি? অফকোর্স সাংবাদিকের পরিচয়ে নয়, তোর বন্ধুর পরিচয়ে।"

"পারবি। সেই জন্যই তোকে হইচই করতে বারণ করছি। তুই রিপোর্ট লিখলেই স্পটেড হয়ে যাবি। এ বাড়ির লোক তোকে শত্রুজ্ঞানে দেখবে। তখন তুই আমাকে সেই হেল্পগুলো করতে পারবি না, যা এখন পারবি। এখনও তুই এদের কাছে বিপজ্জনক নোস। তাই তোকে আসতে দেবে।" একটু থেমে স্নিগ্ধা আবার বলল, "এই মুহূর্তে প্রতিবাদের চেয়েও বেশি দরকার সহযোগিতা। সেটা আমি হারাতে চাই না।"

"ওকে মাম্মি।"

"আর তুই কিন্তু কিছু জানিস না। তোকে আমি নন্দিনীর ব্যাপারে, বা ফিটাল অ্যাবরশনের ব্যাপারে কিছুই বলিনি। তুই শুধু বন্ধুকে দেখতে আসছিস। গট ইট?"

"গট ইট।" আলো হাসল। "তুই একেবারে পলিটিশিয়ানদের মতো কথা বলছিস ডিয়ার!"

"বাজে বকিস না!" স্নিগ্ধা বলে, "মনে রাখিস, আমরা ইন্দিরা গাঁধীর জাত!"

টেলিফোনে কথা সেরে, কোনওমতে কয়েক বালতি জল গায়ে ঢেলে বেরিয়ে এল আলো। এখন তার অফিস যাওয়ার তাড়া। তার উপর স্নিগ্ধা তার মাথার মধ্যে খানিকটা অতিপ্রাকৃতিক হচপচ ঢেলে দিয়েছে। তোয়ালে দিয়ে ভিজে হাত-পা মুছতে মুছতে ভাবছিল সে, সত্যিই কি এমন সম্ভব! সত্যিই কি গর্ভজাত সন্তান এমন ভাবে আগাম দুর্যোগের আভাস দিতে পারে তার মা-কে? স্নিগ্ধা মুখে যতই বলুক, তার হাবেভাবে স্পষ্ট, নন্দিনীকে সে নন্দিনী হিসাবেই মেনে নিয়েছে। মনে মনে সে অসম্ভব ঘটনাটাকেই বিশ্বাস করতে শুরু করেছে! হয়তো এই দুর্বল মুহূর্তে স্নিগ্ধার পক্ষে সেটাই স্বাভাবিক। কিন্তু আলো কীভাবে মেনে নেয়?

না। এর ভিতরে কোন গড়বড় আছে। ব্যাপারটা খতিয়ে দেখতেই হচ্ছে।

মাথায় একরাশ চিন্তা নিয়ে ব্রেকফাস্ট টেবিলে বসল আলো। কিন্তু শান্তিতে ব্রেকফাস্ট করার উপায়ও নেই। এর মধ্যেই সেলফোনটা আবার বাজতে শুরু করেছে। সে আড়চোখে নম্বরটা দেখল। কোনও ফোনবুথের নম্বর।

"হ্যালো।"

ওপাশ থেকে কাতর কণ্ঠস্বর ভেবে এল, "প্লিজ, ফোনটা কেটে দিও না। আমার কথা শোনো।"

"অজয়!" সে বিরক্ত। "তুমি আবার ফোন করছ কেন? তোমায় ফোন করতে বারণ করেছি না?"

"আলো, তুমি এভাবে তোমার লাইফ থেকে আমায় ছেঁটে ফেলতে পার না!"

"নিশ্চয়ই পারি। কেন পারব না?"

"আমাদের তিন বছরের সম্পর্ক। শুধু সম্পর্ক নয়, ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক। আমরা অগুনতি বার মিলিত হয়েছি। এর পরও তুমি কীভাবে আমায় রিফিউজ় করতে পার?"

"ও, ফাইন!" আলো নিষ্ঠুর কণ্ঠে বলে, "তোমার আমার শরীরের অভ্যেস হয়ে গেছে! সেই জন্যই এত কথা!"

"না, ঠিক তা নয়..." অজয় কী বলবে ভেবে পাচ্ছে না। "আমি তোমাকে ছাড়া থাকতে পারছি না।"

"ফার্নিচার ছাড়া থাকতে পারবে? জুয়েলারি? তোমার মা-বাবার স্বপ্ন? তার কী হবে?"

"তুমি ফের ঘুরে ফিরে একই ইস্যুতে যাচ্ছ। বিক্রমদা তো বলেছেনই..."

"তার মানে তুমি ফার্নিচার আর জুয়েলারিও চাও। আবার আমাকেও চাও।" আলো হেসে ফেলে। "ইউ আর সাচ আ ব্লাডি বাস্টার্ড অজয়!"

"এ—ই শালি!" এবার উল্টো দিকের কণ্ঠস্বরে আর কাকুতি-মিনতি নেই। বরং প্রকট হল গর্জন, "বাস্টার্ড কাকে বলছিস? পাড়ার সবাই জানে যে, তুই আমার এঁটো! আমার সঙ্গে শুয়েছিস, বিছানায় ফুর্তি করেছিস— এখন ছেনালিপনা কাকে দেখাচ্ছিস? তোকে তো আমি ইচ্ছে করলেই..."

আলো ফোনটা কেটে দেয়। তার সামনে ধূমায়িত ভাতের থালা এনে রেখেছে বংশী। ফোনের কথোপকথন সেও একতরফা শুনেছে। ভাতের থালাটা নামিয়ে রেখে কুণ্ঠিত স্বরে বলে, "কোনও সমস্যা হয়েছে ম্যাডাম?"

তার দিকে তাকিয়ে হাসল সে, "নাঃ, কিছু না। একটা ফোন একটু বিরক্ত করছে। আমি ম্যানেজ করে নেব।"

বলতে বলতেই মেসেজ এল। অজয়ের মেসেজ। আলো খুলে দেখল, চূড়ান্ত নোংরা ভাষায় মেসেজ করেছে অজয়। একটা নয়, এর পর ক্রমান্বয়ে একের পর এক টেক্সট ঢুকতে শুরু করল তার মোবাইলে। মোটামুটি বক্তব্য একই। আলো একটা বেশ্যা ছাড়া আর কিছুই নয়। ইচ্ছে করলে সে তার এমন দশা করতে পারে যাতে দুনিয়ায় মুখ দেখানোর উপায় থাকবে না। আলোকে সে দেখে নেবে। ইত্যাদি... ইত্যাদি...

আলো পাত্তা না দিয়ে খাওয়ায় মন দেয়। সে খুব বুঝে গেছে অজয়ের দৌড়। অজয় যখন তার সঙ্গে সম্পর্ক ভাঙতে চলেছিল, তখন সমস্যা ছিল না। কিন্তু আলোর মতো একটা সাধারণ মেয়ে তাকে প্রত্যাখ্যান করেছে, এটা চিরন্তন মেল ইগো সহ্য করতে পারছে না। কোনও পুরুষই নারীর প্রত্যাখ্যান সহ্য করতে পারে না। মেল ইগোয় আঘাত লাগে! তখন সে এভাবেই পচা পাঁকে নেমে কাদা ঘাঁটাঘাঁটি করে। প্রেম চলে যায়, জেদ বজায় থাকে। অজয়ও এর ব্যতিক্রম নয়। তার নির্লজ্জ, অশ্লীল মেসেজগুলো আর কিছুই নয়— অসহায় রাগের বিস্ফোরণ! আলোকে কোনও ভাবে জব্দ করার প্রচেষ্টা। আর সেই প্রচেষ্টায় একটা রকের মাস্তানের সঙ্গে কলেজের লেকচারারের কোনও পার্থক্য নেই।

সে এসএমএস-গুলোকে উড়িয়ে দিল না। বরং সযত্নে সেভ করে রাখে। কোনওমতে ভাতের গ্রাস মুখে তুলতে তুলতে বলল, "বংশী, আমার সঙ্গে একটু লোকাল থানায় যাবে?"

"লোকাল থানায়! কেন ম্যাডাম?" বংশী অবাক।

"একটা লোক খুব বিরক্ত করছে," সে খাওয়া শেষ করে মুখ মুছতে-মুছতে বলে, "অফিস যাওয়ার পথে একটা এফআইআর করে যাব। ডাউরি কেস, প্লাস ফোনে হুমকি, অশ্লীল মেসেজ পাঠানো— সব মিলিয়ে কত ধারা হবে বলো তো?"

বংশী তার দিকে হাঁ করে তাকিয়ে আছে দেখে সে দীর্ঘশ্বাস ফেলে।

"বাদ দাও। মাংসের ঝোলটা চমৎকার হয়েছে।"

"মাংসের ঝোল কোথায় পেলেন ম্যাডাম!" বংশী আকাশ থেকে পড়ল। "ওটা তো এঁচোড়ের তরকারি ছিল।"

আলো পিটপিট করে তার মুখের দিকে তাকায়। বংশী রীতিমত আহত। সে নাক কুঁচকে ক্ষমা প্রার্থনা করে বলল, "সরি।"

মায়ের মুখটা তিনদিন ধরেই বেশ ভার হয়ে আছে। ব্যাগ গোছাতে-গোছাতে আড়চোখে লক্ষ করল আলো, আজও তাঁর মুখটা কেমন থমথম করছে। সে বুকভাঙা শ্বাস ফেলে। মায়ের রাগের কারণ তার অজানা নয়। কিন্তু এই অবুঝ রাগ ভাঙানোর উপায় তার জানা নেই।

"মা, আসছি।" আলো জুতোজোড়া পায়ে গলাতে-গলাতে বলে, "আজ ফিরতে দেরি হবে। চিন্তা কোরো না।"

"তোর চিন্তা কেন করব?" মা এত দিন বাদে মুখ খুললেন। রাগতস্বরে বললেন, "আমার চিন্তার আরও অনেক বিষয়বস্তু আছে। তাছাড়া তুই এখন বড় হয়েছিস। নিজের ভাল-মন্দ খুব ভালই বুঝিস। আমি চিন্তা করতে যাব কেন?"

উত্তর শুনে আলো আপনমনেই হাসে। মায়ের রাগ এখনও

পড়েনি। সে হাল্কা করে মন্তব্য করে, "এত রাগছ কেন মা? মানুষের কি বিয়ে ভাঙে না?"

"না। ভাঙে না।" মা থমথমে মুখে জবাব দিলেন, "অন্তত এভাবে অকারণে ভাঙে না!"

"অকারণে!" আলো এবার বিস্মিত। "তোমার অজয়ের বিহেভিয়ারটা কোনও কারণ বলে মনে হয় না?"

"না!" তিনি বললেন, "অজয় ফার্নিচার আর গয়না চেয়েছে। কী অন্যায়টা করেছে? ও তো আর সবার মতো ক্যাশ, গাড়ি, বাড়ির দাবি করেনি। সব বিয়েতেই তো দেনা-পাওনার ব্যাপার থাকে! এই তো, সুশীলবাবুর ছেলের বিয়ে হল। মেয়েবাড়ি থেকে খাট, ড্রেসিংটেবিল, কালার টিভি, আরও একগাদা ফার্নিচার দিয়েছে। জামাইকে হিরের আংটি দিয়েছে। গাড়ি দিয়েছে। ওরা দশ লাখ নগদ চেয়েছিল— তাও দিয়েছে। কী ক্ষতি হয়েছে? বিয়েও হয়েছে। ওরা সুখেও আছে।"

"ক্ষতি হয়েছে মা।" আলো বলে, "তুমি শুধু সুশীলকাকুর বেয়াইয়ের কথা ভাবছ। ভদ্রলোক ইনকাম ট্যাক্সের বড় অফিসার। টাকা আছে। মেয়ের পিছনে খরচ করতে পারেন। কিন্তু এভাবে উনি দুনিয়ার সব ছেলেদের এক্সপেক্টেশন বাড়িয়ে দিচ্ছেন। এমন বাবা-মাও আছে যাঁদের পক্ষে অত খরচ করা সম্ভব নয়, তাঁরা কি মেয়ের বিয়ে দেবেন না? তাছাড়া পণ দেওয়া, নেওয়া— দুই-ই সামাজিক অপরাধ। সুশীলকাকুর বেয়াই পুলিশে রিপোর্ট না করে অন্যায় করেছেন।"

"হ্যাঁ। উনি অন্যায় করেছেন, পুলিশে যাননি," মা রেগে গিয়ে বলেন, "আর তুমি তো ধর্মাবতার! তাই বিয়েটাই ভেঙে দিলে!"

"শুধু বিয়েই ভাঙিনি," সে জোর গলায় জানায়, "পুলিশেও রিপোর্ট করব।"

মা হাঁ করে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে স্খলিত গলায় বললেন, "তুই অজয়ের নামে পুলিশে রিপোর্ট করবি?"

"নিশ্চয়ই।"

"তাহলে?" তাঁর মাথায় হাত। "বিয়েটার কী হবে?"

কী আশ্চর্য দুনিয়া! কী আশ্চর্য মনোভাব! এত দিন ধরে আলো বলে আসছে যে, সে অজয়কে বিয়ে করবে না! অথচ মা এখন জানতে চাইছেন— বিয়েটার কী হবে!

মায়েরও দোষ নেই। উনি সাধারণ বুদ্ধিতে ভেবেছিলেন নিতান্তই সামান্য একটা সমস্যা ঘোঁট পাকিয়েছে দুজনের মধ্যে। আলো মেয়েমানুষ। মান হয়েছে। অজয় দু'একবার নরম সুরে কথা বললেই গলে গিয়ে বিয়ের পিঁড়িতে বসে যাবে!

"আলো, মা," তাঁর কণ্ঠস্বরে তীব্র কাতরতা, "এমন করিস না মা গো! এর পর সমাজে আমরা মুখ দেখাব কী করে?"

"মা!" আলো বিস্মিত কণ্ঠে বলে, "অজয় আমার নামে পুলিশে রিপোর্ট করছে না! আমি ওর নামে করছি। মুখ দেখানোর সমস্যা আমাদের নয়। ওর।"

"অজয় পুরুষমানুষ। পুরুষদের গায়ে কাদা লাগে না।" তিনি প্রায় কেঁদেই ফেললেন। "তুই মেয়ে। তোর একবার বিয়ে ভাঙলে আর হবে না।"

"কেন হবে না? আর যদি না হয়, তবে করব না।"

মায়ের কান্না এবার রাগের হিংস্র মূর্তি ধরেছে, "বিয়েই যদি না করবি তবে পুরুষটার সঙ্গে ঘেঁষাঘেঁষি করে বেড়ালি কেন? তুই কি ভাবিস কেউ কিছু জানে না! সবাই জানে তোর উচ্ছৃঙ্খলতার কথা! তোদের মধ্যে আর কিছু হওয়ার বাকি নেই। নির্লজ্জ মেয়ে কোথাকার। এত দিন ধরে ফুর্তি করে বেড়ালি। এখন বিয়ে ভেঙে দিবি! আমি লোককে কী বলব! কী করে পাড়ায় মুখ দেখাব। পাপ হয়েছে যে, এমন মেয়ে পেটে ধরেছি। আজ আমার একটা ছেলে থাকলে কোনও জ্বালা ছিল না!"

বলতে বলতেই অদম্য কান্নায় ভেঙে পড়েছেন তিনি। আলোর মনে হল, সে কয়েক মুহূর্তের জন্য কিছু শুনতে পাচ্ছে না। কিছু দেখতে পাচ্ছে না। একটা অদম্য বাষ্পোচ্ছ্বাস তাকে ঘিরে ধরল। বুকের মধ্যে কী যেন একটা মোচড় দিয়ে বেড়াচ্ছে। তবু চোখে জল আসে না। অসম্ভব তীব্র একটা কষ্ট তাকে অসাড় করে রেখেছিল। হ্যাঁ, ছেলে হলে ভাল হত। সুশীলবাবুর ছেলের মতো নিজেকে বিক্রি করে ঘরে আসবাবপত্র-টাকা আনতাম মা! অজয়ের মতো হুমকি দিতে পারতাম। যতই অন্যায় করি না কেন, কেউ আঙুল তুলে দেখাত না। ও বাড়ির রমাপিসির ছেলে ভোলার মতো বউকে নিয়ে আলাদা হয়ে যেতাম। বাড়িতে বুড়ো বাপ-মা অসহায় হয়ে পড়ে থাকত। আমি তাকিয়েও দেখতাম না। ভাল হত, খুব ভাল হত।

আলোর চোখ বেয়ে একফোঁটা গরম জল পড়ল, "আমি জানতাম না তুমি আমার সম্বন্ধে এমন ভাবো। তাই অ্যাম সরি মা... এক্সট্রিমলি সরি!"

চোদ্দো

"তোর কী হয়েছে দীপ?" পাখি বিমর্ষ মুখে বলে, "আমায় কাইন্ডলি একবার বলবি, তোর ঠিক কী হয়েছে? আগে শুধু সকালে শ্মশানে যেতি। আজকাল শুনছি নাকি বিকেলে আবার বাচ্চাদের কবরখানায় যাওয়া শুরু করেছিস? কী ব্যাপার?"

"কী হবে?" প্রদীপ সিগারেটের ছাই ঝাড়তে-ঝাড়তে বলে, "তোর কল্যাণে দু'বেলা দু'মুঠো খেতে পাচ্ছি। ঘরের কুটোটিও নাড়তে হচ্ছে না। অখণ্ড অবসর। সময় তো কাটাতে হবে।"

প্রদীপের কথার মধ্যে এমন একটা রূঢ়তা ছিল, যা পাখিকে ব্যথা দিল। প্রদীপ এমনিতেই একটু কুণ্ঠিত স্বভাবের। নিজেকে সব সময় জাহির করা তার স্বভাব নয়। তবে হঠাৎ এমন কী হল, যাতে সে এমন রূঢ়, রুক্ষ হয়ে উঠেছে!

"সময় কাটানোর জন্য তোর কলম আছে।" পাখি খুব কোমল স্বরে বলল, "লেখ। তোর তো স্বপ্নই ছিল লেখার।"

"ড্যাম ইওর লেখা! ড্যাম ইওর স্বপ্ন!" প্রদীপের মধ্যে আচমকা একটা বিস্ফোরণ হয়। এমন বিস্ফোরণ একদিনে হয় না। বহু দিন ধরে ক্ষোভ, রাগের লাভা জমতে-জমতে অবশেষে বুকের পাঁজর ফাটিয়ে বাইরে বেরিয়ে আসে। একটা অক্ষম অথচ দানবাকৃতি রাগ যেন তাকে দুমড়েমুচড়ে দিয়ে এত দিন ধরে প্রকাশ পেতে চাইছিল। এবার প্রকাশিত হল।

"এই দ্যাখ লেখা...এই দ্যাখ...!"

প্রদীপ যেন উন্মত্ত হয়ে পড়েছিল। সে জন্তুর মতো ঝাঁপিয়ে পড়ল নিজের লেখার টেবিলের উপরে। এত দিন ধরে যা লিখেছিল, যত ছোটগল্প, যত উপন্যাস, সমস্ত লেখার পাণ্ডুলিপি কুটিকুটি করে ছিঁড়ছে।

"কতগুলো আটভাট লিখে সময় নষ্ট করেছি... শা-লা... নিজের লাইফ তো বরবাদ করেই রেখেছি... তোর লাইফও বরবাদ করছি!... কী হবে লিখে!... কোন রাজকার্যটা হবে!...লেখক হতে গেলে গাট্‌স লাগে!...আমার নেই। আমার কিচ্ছু নেই... আই অ্যাম আ গুড ফর নাথিং!" সে রীতিমতো হাঁফাচ্ছে। পাঁজরসর্বস্ব বুক ধড়ফড় করছে! পাখির ভয় হচ্ছিল, প্রদীপ অনর্থ না ঘটিয়ে বসে! সে প্রদীপের এমন রূপ আগে কখনও দেখেনি! দেওয়ালে পিঠ ঠেকিয়ে, ভয়ে সিঁটিয়ে দাঁড়িয়েছিল মেয়েটা!

"এই দ্যাখ... এই হল আমার আসল রূপ!" থুঃ করে কাগজের দলার উপর একগাদা থুতু ছিটিয়ে বলল প্রদীপ, "এগুলো লেখা হয়েছে! কিস্যু হয়নি! কিস্যু না! আই অ্যাম গুড ফর নাথিং! তোর পয়সায় খাচ্ছি, দাচ্ছি— বগল বাজাচ্ছি। আর এসব ভুলভাল লিখে কাগজ আর সময় দুটোই নষ্ট করছি!" সে সজোরে মাথার চুল টেনে ধরে, "পাখি, একটা মজুর, একটা রাস্তার ভিখিরিও তার বউকে পাঁচ টাকার ফুচকা, দশ টাকার আইসক্রিম খাওয়ানোর ক্ষমতা রাখে! নতুন শাড়ি কিনে দিতে পারে! আর আমি! একটা সিগারেট খেতে গেলেও তোর পয়সায় খেতে হয়! কী হবে? কী হবে লেখক হয়ে! তোকে ভালভাবে রাখতে পারব? তোর মাথার ঘাম ভ্যানিশ করে দিতে পারব? তুই একটা অপদার্থকে বিয়ে করেছিস পাখি। কয়েক দিন বাদে

তুই নিজেও সেটা রিয়ালাইজ় করবি! তখন আর আমাকে ভাল লাগবে না! চলে যাবি অন্য কোনও ছেলের সঙ্গে! আমি পারব না। আমি দেখতে পারব না! তার চেয়ে তুই এখনই যা! চলে যা আমায় ছেড়ে!"

পাখির নিজের কানকেই বিশ্বাস হয় না! এসব কী বলছে প্রদীপ! বিয়ের দু'বছরে কখনও তার মুখে এমন কথা শোনেনি পাখি। ছোটখাটো মনোমালিন্য যে হয়নি, তা নয়। কিন্তু সেগুলো কখনওই খুব বড় সমস্যা হয়ে দাঁড়ায়নি। আজ তবে এমন কী হল?

"দীপ...শোন।" পাখি তাকে শান্ত করার চেষ্ট করে। "ধৈর্য ধর। আস্তে আস্তে সব ঠিক হয়ে যাবে। লেখকদের প্রতিষ্ঠা পেতে সময় লাগে।"

"কত সময় লাগবে? কত ধৈর্য ধরব!" সে আরও উন্মত্ত। "আজ তিন জায়গা থেকে রিজেক্টেড হয়েছি, কাল ত্রিশ জায়গা থেকে রিজেক্টেড হব। যখন বুড়ো হয়ে মরার সময় হবে, তখন লেখক হব আমি? লাভ কী পাখি? আমি তোকে কিছু দিতে পারব না। সারাজীবন তোর ঘাড়ে বোঝা হয়ে থেকে যাব। আমি জানি, তোরও বাঁচতে ইচ্ছে করে। আমি দেখেছি, তুই নীচের ফ্ল্যাটের অনির্বাণের সঙ্গে কত খুশি হয়ে কথা বলিস। অনির্বাণ বিজ়নেসম্যান। ওর অনেক টাকা... আমি কি ওর সঙ্গে পাল্লা দিতে পারি!"

"দীপ!"

"বাধা দিস না!" প্রদীপ বলে যেতেই থাকে, "তোর অফিসেও অনেক ঝকঝকে-চকচকে ছেলে কাজ করে। আমি জানি, তোর তাদেরও ভাল লাগে। রোজ কেউ না কেউ তোকে লিফ্‌ট দেয়। ওদের গাড়ি আছে পাখি। অথচ তুই কষ্ট করে বাসে ট্রামে যাস। ওদের কাউকে বিয়ে করলে তুই অনেক সুখী হতি।"

"দীপ!" এবার পাখি চাপা গলায় ফুঁসে ওঠে, "কী সব যা তা বলছিস? তুই কি আমাকে সন্দেহ করতে শুরু করেছিস?"

প্রদীপ নিষ্ঠুর হাসল। "তুই কি ভাবিস আমি কিছু বুঝি না? রোজ জানলা দিয়ে দেখি তোকে একটা কালো গাড়ি ড্রপ করে দিয়ে যায়। গাড়ির মালিক ইয়ং, হ্যান্ডসাম। আমার থেকে অনেক ভাল। তুই এক-একদিন এক একটা পারফিউম গায়ে লাগিয়ে যাস। তোর পারফিউম কখনও শেষ হয় না পাখি? কাল তোর ব্যাগে আমি একটা গিফট প্যাক দেখেছি। একদম নতুন। কে দিল তোকে? ওই গাড়িওয়ালা ছেলেটা? না অনির্বাণ!"

পাখির সারা শরীরে কাঁপুনি ধরছিল। বাঁশপাতার মতো হি হি করে কাঁপছে তার অন্তর। প্রদীপ এসব কী বলছে! সে কী বলছে! সে কি সচেতনভাবে এ কথাগুলো বলছে! অথবা তার মাথা খারাপ হয়ে গেছে।

"আমি বুঝি পাখি। আমি তোকে দোষ দিচ্ছি না।" প্রদীপ বলে, "কোনও মেয়েই অকর্মণ্য স্বামীকে ভালবাসতে পারে না। তোর যোগ্যতা আছে। আমার থেকে অনেক...অনেক ভাল ছেলে ডিজ়ার্ভ করিস।"

দু'হাতে ফের মাথার চুল টেনে ধরে প্রদীপ। "আমার কী মনে হয় বল তো! বুঝতে পারি তোর জীবনে আমার কোনও জায়গা নেই! আমি কোথাও নেই পাখি। শুধু বিছানা গরম করার জন্য আছি! নিজেকে তোর কেপ্ট বলে মনে হয়। মনে হয়... মনে হয়...আই অ্যাম জাস্ট আ ব্লাডি জিগোলো!"

তড়িদাহতের মতো কেঁপে উঠল পাখি। তার হাতেপায়ে জোর নেই। কেউ যেন সমস্ত শক্তি, সমস্ত জোর তার দেহ থেকে শুষে নিয়েছে। অবশ হয়ে বসে পড়ল মাটিতে। মেঝেতে প্রদীপের ফেলে রাখা সিগারেটের টুকরো, আর ভর্তি ছাই! হঠাৎ তার শীত করছে। একটা শীতল নিঃসঙ্গতা আস্তে আস্তে ঘিরে ধরতে শুরু করেছে তাকে!

সেদিন অনেক রাত অবধি বিছানায় এপাশ-ওপাশ করল প্রদীপ। পাখি এখনও শুতে আসেনি। রাতে কিছু খায়ওনি। শুধু প্রদীপকে ডিনার বেড়ে দিয়েছে। যেমন সুন্দর করে সে ভাত সাজিয়ে দেয়, বাটিতে-বাটিতে নানা তরকারি, ডাল, মাছ-মাংস সাজিয়ে দেয়— ঠিক তেমনই দিয়েছে। পরিবেশনে বা রান্নায় কোনও ত্রুটি ছিল না।

তবু কী যেন একটা ছিল না। খেতে বসে প্রদীপ লক্ষ করেছে পাখির দু'চোখের কোলে রক্তিমাভা। যেন চোখের শিরা ফেটে গিয়েছে। নাকের ডগা লালচে হয়ে আছে। পাখি কেঁদেছে। তার সামনে কাঁদেনি। হয়তো বাথরুমে লুকিয়ে কেঁদেছে। প্রদীপের মায়া হয়নি। কাঁদুক। সত্যি কথা শুনে যদি কারও কান্না পায়, তাতে সত্যিটা বদলায় না। প্রদীপ অনেক দিন দেখেছে পাখিকে অনির্বাণের সঙ্গে খোশগল্প করতে। মিষ্টি হেসে-হেসে আড্ডা মারতে! কই, পাখি তো তার সামনে অমন করে হাসে না! কখনও তো বলেনি, 'আয় দীপ, গল্প করি।' কত সুন্দর পূর্ণিমার রাত গেছে। চাঁদের আলোয় উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে তাদের খোলা বারান্দা! কত বার প্রদীপের ইচ্ছে করেছে ওই খোলা বারান্দায় বসে পাখির সঙ্গে গল্প করতে। কিন্তু যত বার সে ইচ্ছে প্রকাশ করেছে, পাখি ক্লান্ত গলায় বলেছে, "দীপ, আই অ্যাম টায়ার্ড। অন্য কোনও দিন হবে রে।" অথচ অনির্বাণের সঙ্গে গল্প করতে তার কোনও ক্লান্তি নেই। কত দিন অফিস থেকে ফেরার সময়ে নিজের ফ্ল্যাটে আসার বদলে অনির্বাণের ফ্ল্যাটে ঢুকে গেছে পাখি। সেখানে বসে চা খেতে খেতে গল্প করেছে। অত গল্প কীসের? অনির্বাণ অবিবাহিত। তার বউ থাকলে না হয় বোঝা যেত যে, দুই মহিলার আড্ডা বসে। কিন্তু সে সম্ভাবনাও নেই!

অন্ধ রাগে প্রদীপ ক্রমশ নিষ্ঠুর হয়ে ওঠে। কী ভেবেছিল পাখি? ল্যাবাবোদা লোকটা লেখা নিয়েই মেতে থাকবে। আর তুই এদিক ওদিক ঘুরে বেড়াবি! অপদার্থ লোকটা তাকিয়েও দেখবে না যে, তুই কোথায় যাচ্ছিস! তাকিয়ে দেখলেই বা কী? 'টু' করারও ক্ষমতা আছে লোকটার? এ সংসার ওর পয়সায় চলে না। এ সংসার তোর পয়সায় চলে। তুই এ বাড়ির মালকিন। সে লোকটা কে?

নিজের মনে মনেই পাখির মনোভাব বুনে নিতে নিতে ক্রমাগত উত্তেজিত হয়ে ওঠে প্রদীপ। তার ইচ্ছে করে এক্ষুনি এ বাড়ি ছেড়ে চলে যেতে। পাখির অনেক অবদান সহ্য করেছে সে। আর নয়! ও থাকুক অনির্বাণকে নিয়ে, ওর হ্যান্ডসাম অফিস-কলিগকে নিয়ে। প্রদীপ কিছু বলতে আসবে না।

সে নিজের মনে নিজেই অনেক ভাবনা ভাবতে ছটফট করতে থাকে। পাখি এলে তাকে জানাবে যে, আর ওদের একসঙ্গে থাকা সম্ভব নয়। প্রদীপ আলাদা হতে চায়। পাখি যদি মিউচুয়াল ডিভোর্সে রাজি থাকে তা ভাল। নয়তো অন্য পথ নিতে হবে। অনেক রকম ভাবে, অনেক ঢঙে কথাটা বলার অভ্যেস করল প্রদীপ। পাখি এলেই ওর মুখের উপরে বলে দেবে...।

কিন্তু পাখি এল না। সারারাত কেটে গেল, তবু এল না!

রাতের অন্ধকারটা বড় আরামদায়ক। অন্ধকার মানুষের অনেক দুর্বলতা ঢেকে রাখতে জানে। কান্না তেমনই একটা প্রবৃত্তি। হলঘরের সোফায় টানটান হয়ে শুয়ে পাখি তার কান্নাকে প্রাণপণ ঢাকার চেষ্টা করছে। যদিও কান্না জিনিসটা এমনই যা মস্তিষ্কের কথা বিশেষ শোনে না। কত বার সে নিজেকে নিজে বলেছে, 'ডোন্ট ক্রাই পাখি, কান্না দুর্বল মানুষের পরিচয়,' কিন্তু তবুও চোখের জল বাধা মানে না। রাত এখন অনেক গভীর। বাইরের স্ট্রিটলাইটের আলো পিছলে পড়েছে জানলার। জানলার কাচে দূরের গাছের ছায়া এসে পড়েছিল। হাওয়ায় গাছের পাতা তিরতির করে কাঁপছে। সঙ্গে সঙ্গে কাঁপছে ছায়াও। আকাশে আজ কোনও রঙ নেই। কালো হয়ে আছে। পাখি আকাশের দিক থেকে চোখ সরিয়ে নেয়। তারপর সোফার একটা কুশন বুকে চেপে ধরে। যেন বুকের ভিতরের শূন্যতাপূরণের ব্যর্থ প্রচেষ্টা।

দীপ তাকে সন্দেহ করে— এই বোধটা যতটা না কষ্ট দিচ্ছিল তাকে, দীপ তাকে বিশ্বাস করে না— এই অনুভূতিটাই কুরে কুরে খাচ্ছিল বেশি। একনিষ্ঠ প্রেম অনেক সময় সন্দেহের সৃষ্টি করে। দুনিয়ায় এমন নারী বা পুরুষ নেই যে, অন্তত এক মুহূর্তের জন্যও তার প্রিয় মানুষটিকে সন্দেহ করেনি। কিন্তু সে সন্দেহকে পরক্ষণেই ভেঙে দিয়েছে পারস্পরিক বিশ্বাস। পাখি কি তবে প্রদীপের বিশ্বাস অর্জন

করতে পারেনি! কেন? কেন? কী এমন কাজ করেছে সে! দীপ তার ব্যাগ ঘেঁটে দেখেছে। যখন গিফট দেখতেই পেলি দীপ, তবে একবার খুলে দেখলি না কেন!

যে-ছেলেটা ওকে রোজ লিফ্‌ট দেয়, সে বয়েসে পাখির চেয়ে অনেকটাই ছোট। পাখিকে দিদির মতো দেখে। সে কখনও ওর কাছে লিফ্‌ট চায়নি। কিন্তু ছেলেটি নাছোড়বান্দা। অনির্বাণের সঙ্গেও পাখি খোশগল্প করে না। অনির্বাণের বাবার পাবলিশিং হাউস আছে। পাখি সে কথা জানতে পেরে অনির্বাণের সঙ্গে কথা বলেছে। এবং প্রদীপের অজান্তেই তার একটা পাণ্ডুলিপি জমা দিয়েছে অনির্বাণের হাতে। ওকে জানাতেই পারত। কিন্তু সারপ্রাইজ় দেওয়ার লোভ সামলাতে পারেনি। গত পরশুই পাবলিকেশনের তরফ থেকে চিঠি এসেছে পাখির কাছে। অনির্বাণই এনে দিয়েছে। ওরা দীপের বই করবে। তার দীপ লেখক হবে। তার স্বপ্ন পূরণ হবে! যখন চিঠিটা অনির্বাণ পাখির হাতে তুলে দিয়েছিল, তখন আনন্দে চোখে জল এসে গিয়েছিল ওর। গর্বে বুক ভরে গিয়েছিল। এ ক'দিন ধরে শুধু অস্থিরভাবে ভেবে এসেছে যে, কীভাবে চমকটা দেবে! অনির্বাণই বুদ্ধিটা দিয়েছিল। বলেছিল, "পাখিদি, এত দিন যখন চেপে গেছ, তখন আর ক'টা দিন চেপে থাকো। সামনেই তোমাদের বিবাহবার্ষিকী না?"

পাখি চমকে গিয়েছিল, "যাচ্চলে! তুই জানলি কী করে বস?"

সে কুলকুল করে হেসে ফ্যালে, "টেনশন নিও না। গোয়েন্দাগিরি করিনি। তোমার ফেসবুক অ্যাকাউন্টেই লেখা আছে ডেটটা।"

"তাই বল। তা তুই কী করতে বলিস?"

"সেদিনের জন্য একটা স্পেশ্যাল প্ল্যানিং করো। দীপদাকে একটা ভাল গিফ্‌ট দাও। রাতে ডিনারে বিরিয়ানি, কাবাব বানাও— সঙ্গে ওয়াইন বা শ্যাম্পেন। শ্যাম্পেনটাই বেটার। তার সঙ্গে যদি ক্যান্ডেল লাইট থাকে তো কথাই নেই।"

প্ল্যানমাফিকই দীপের জন্য ক্যান্ডল লাইট ডিনারের বন্দোবস্ত করে রেখেছিল পাখি। নামী রেস্তরাঁয় মাটন বিরিয়ানি আর কাবাবের অর্ডারও দেওয়া আছে। শ্যাম্পেনের বোতলও এনে ফ্রিজে লুকিয়ে রেখেছে সে। দীপটা যা ভুলো! নির্ঘাৎ ম্যারেজ অ্যানিভার্সারির কথা ভুলে গেছে। ওকে মনে করিয়েও কাজ নেই। সব একা সামলে নেবে পাখি।

পরিকল্পনামতো গত পরশুই দীপের জন্য একটা ঝাঁ চকচকে ঘড়ি কিনেছে সে। দীপের যা রংচটা ঢলঢলে একটা ঘড়ি। আকবরের আমলের ঘড়িটা কিছুতেই সে ছাড়বে না! কিছু বললেই বলবে, "সময় তো ঠিক দেখাচ্ছে! আবার কী!" ঝকঝকে সোনালি ব্যান্ডের ঘড়িটা কিনতে কিনতে পাখি মনে মনে হেসেছিল। দীপকে এবার খুব চমকে দেওয়া যাবে...।

ঘড়িতে বারোটা। চমকে উঠল সে। চোখের জল মুছে সজোরে শ্বাস টানল। দীপ কি এখন ঘুমোচ্ছে? নিশ্চয়ই ঘুমোচ্ছে। সে ধরা গলায় বলল, "হ্যাপি অ্যানিভার্সারি দীপ।"

পনেরো

আলো খুব মনোযোগ সহকারে মিষ্টি আর মোগলাই শেষ করে প্লেটটা সরিয়ে রাখল। রায়চৌধুরী বংশে আর যত খুঁতই থাকুক না কেন, আতিথেয়তায় কোনও ত্রুটি নেই। স্নিগ্ধার শাশুড়ি নিজের হাতে মোগলাই বানালেন। আলো দু-একবার আপত্তি করেছিল। বলেছিল, "কেন এসব করছেন মাসিমা? আমি তো দুপুরে খেয়েই এসেছি।"

"খেয়ে তুমি আসতেই পার আলোলিকা, তার মানে এই নয় যে, বন্ধুর বাড়িতে দুটো ভাজাভুজি মুখে দিতে পারবে না।"

স্নিগ্ধার শাশুড়িকে কেমন যেন অদ্ভুত লাগছিল আলোর। ভদ্রমহিলা ঠিক যেন মানুষ নন। বরং জাপানি পুতুলের সঙ্গে কিঞ্চিৎ সাদৃশ্য আছে। মুখ সব সময়ই ভাবলেশহীন! কোনও অভিব্যক্তি নেই। এমন লোকের সামনে সহজ হওয়া খুব মুশকিল। অথচ বাড়িতেও বেশ সুন্দর সেজেগুজে বসে আছেন। পরনে চওড়া জরিপাড়ের শাড়ি। চোখে কাজল। ঠোঁটে সামান্য লিপস্টিক। গলায় চওড়া সোনার হারের চিকচিক। হাতে কঙ্কণ, চুড়ির ঝমঝম। কানে হিরের দুল। হাতের চাঁপাকলি আঙুলে পান্না, হিরের আংটি ঝলমল করছে। চমৎকার খোঁপা বেঁধেছেন। চুল থেকে শুরু করে পায়ের নখ অবধি সবই ওয়েল মেনটেনড। মহিলা সুন্দরীও। কিন্তু সে সৌন্দর্যে প্রাণ নেই!

এমন মানুষের সামনে বেশিক্ষণ বসে থাকাটাই র‍্যাগিং। মনে হয়, হরর ফিল্মের নায়িকার সামনে বসে আছে! তবু আলো বেশ কিছুক্ষণ ওঁর সঙ্গে কথা বলল। মোগলাইয়ের প্রশংসা করল। ভদ্রমহিলা এইবার মাপা হাসলেন, "এ আর এমন কী। আমার শাশুড়ির রান্না তো খাওনি! অপূর্ব রান্না করতেন। ওঁর স্পেশ্যাল আইটেম ছিল পোলাও আর কচি পাঁঠার ঝোল। যে একবার খেয়েছে, সে কোনও দিন ভুলতে পারবে না।"

"আপনারা কি নিজেরাই রান্না করেন?" আলো আমতা আমতা করে বলে, "না লোক আছে?"

"লোক আছে।" তিনি জানালেন, "এ বাড়ির নিয়ম হল শুধু একটি আমিষ পদ বাড়ির বউ রান্না করবে। তারপর হেঁসেল রান্নার লোকের দখলে। যখন আমি বউ হয়ে এ বাড়িতে এলাম, তখন আমার শাশুড়ি ওই একটি পদ নিজের হাতেই খুব যত্ন করে রান্না করতেন। যত দিন উনি বেঁচে ছিলেন, তত দিন আমার দায়িত্ব ছিল না। ওঁর মৃত্যুর পর এখন আমিই মাছ-মাংস-ডিম যা-ই হোক না কেন, একটা রান্না করি।" বলতে বলতেই উনি ফের হাসলেন, "যত দিন আমি আছি, তত দিন স্নিগ্ধার কিচেনের পাট নেই। আমি না থাকলে তখন ওকেই আবার একটা রান্না করতে হবে।"

"তাহলে আপনি যে এখন খাবার তৈরি করলেন?"

"এটাও রায়চৌধুরী বাড়ির আর একটা নিয়ম। অতিথি এলে মিষ্টি ছাড়া আর বাইরের কোনও খাবার আনা হয় না। অতিথি নারায়ণ। তাকে কি বাইরের খাবার খাওয়ানো যায়? না অন্যের হাতের রান্না দেওয়া যায়?" তিনি আবার হাসলেন, "তখন আমরাই কিছু ভাজাভুজি তৈরি করে দিই।"

আলো আর কথা না বাড়িয়ে চুপ করে যায়। বাবা রে! এ বাড়ির কীসব বিদঘুটে নিয়ম! স্নিগ্ধার মতো শান্ত মেয়ে সামলাতে পারবে তো!

সামনেই স্নিগ্ধা মুখ নিচু করে বসেছিল। একেবারে লক্ষ্মী বউটির মতো মৃদু মৃদু হাসছে। আলো ভাবছিল, অভিনয়ে নামলে এ মেয়েটা নির্ঘাত অস্কার পেত! এ বাড়িতে এমন একটা আন্দোলন চলছে তা বাইরে থেকে দেখলে কেউ বুঝবে! যেমন শাশুড়ি, তেমনি বউমা! দুজনেই অভিনয়ে তুখোড়।

খাওয়ার পর্ব শেষ হলে স্নিগ্ধার শাশুড়ি-মা স্মিত হেসে বললেন, "তোমরা দুই বন্ধুতে এবার গল্প করো। বুড়ো মানুষের কোম্পানিতে অনেকক্ষণ বোর হয়েছ।"

"সে কী! না...না...!"

তিনি স্নিগ্ধার দিকে নিস্পৃহ চোখ দুটো মেলে বললেন, "স্নিগ্ধা, আলোলিকাকে তোমার ঘরে নিয়ে যাও।"

আলো হাঁফ ছেড়ে বাঁচল। জাপানি পুতুলের সামনে বসে থাকা যে কী অস্বস্তিকর। একটু আগেই অবশ্য ঋতমের বাবাকেও দেখেছে সে। স্নিগ্ধার শ্বশুর শুরুতে তাকে বেশ সন্দেহের দৃষ্টিতে দেখছিলেন। ভাবটা এমন ছিল যেন বলতে চাইছেন, ব্যাপারটা কী হে? হাঁড়ির খবর জানার কল করছ না কি! তবে বেশ কিছুক্ষণ কথা বলার পর তিনি অনেক সহজ হয়ে গিয়েছিলেন। আলো তাঁর একটা ইন্টারভিউও চেয়েছে। এমন সফল ব্যবসায়ীর সাফল্যের রহস্য সবার জানা উচিত। বিশেষ করে তরুণ বিজ়নেসম্যানদের কাছে তিনি একটা বড় উদাহরণ।

কথাটা শুনে হো হো করে হেসে উঠেছিলেন ভদ্রলোক। আলো তাঁর জন্য একটা দক্ষিণাকালীর ফোটো গিফট হিসাবে নিয়ে গিয়েছিল। সেটা পেয়ে খুব খুশি হয়ে গেলেন। এমনভাবে আলোর সঙ্গে কথা বলতে শুরু করেছিলেন, যেন ঋতমের কোনও ভাই থাকলে আলোকে পুত্রবধূ করেই ছাড়তেন! সব মিলিয়ে ভদ্রলোককে কিন্তু অতটা জটিল

মনে হয়নি তার। তবে ভয়াবহ কুসংস্কারগ্রস্ত— এটা ঠিক। কথা বলতে বলতে যত বার হাঁচলেন, ঠিক তত বারই থামলেন। তাঁর স্ত্রী এসে নাকের কাছে তুড়ি মেরে, "জীব...জীব..." বলার পর ফের শুরু হল কথা বলা। তার আগে নয়!

"তোর শ্বশুর মালটাকে কিন্তু অত ডেঞ্জারাস বলে মনে হল না। বুঝলি?" স্নিগ্ধার ঘরের বিছানার উপরে আয়েশ করে বসে বলল আলো, "দরজাটা বন্ধ করে দে।"

স্নিগ্ধা ভিতর থেকে দরজা বন্ধ করল, "বাবাকে তুই মাল বলছিস কেন?"

"উউপসসস!" সে জিভ কাটল, "তোরা তো আবার এসব ভাষা শুনে অভ্যস্ত নোস। সরি ফর দ্যাট। কিন্তু অনেস্টলি, তোর শ্বশুর কুসংস্কারে বিশ্বাসী হতে পারেন, তবে খুব কূটবুদ্ধিসম্পন্ন বলে মনে হয় না।"

"কুসংস্কার মানে!" স্নিগ্ধা চাপা গলায় বলে, "তুই ভাবতেও পারছিস না। বিড়াল রাস্তা কাটলে উনি আর সে রাস্তা দিয়ে যাবেন না। বৃহস্পতিবার বেগুন খাবেন না। শনিবার দাড়ি কাটবেন না। মইয়ের তলা দিয়ে হাঁটবেন না, জুতো উলটে থাকলে হাঁকডাক করে বাড়ি মাথায় করবেন... তোকে আর কত শোনাব? সে বিরাট লিস্ট। আর শুধু উনিই নন— ঋতমও সমান সুপারস্টিশাস।"

"শ্রীরাধিকে-চন্দ্রাবলী, কারে রেখে কারে ফেলি! হোয়াট-এভার।" আলো বলল, "এ জাতীয় মানুষ কুসংস্কারে অনেক কিছুই করতে পারে। খেপে গিয়ে খুনও করতে পারে। কিন্তু যা-ই করুক, সেটা হবে ভোঁতা বুদ্ধির কাজ। তোর শ্বশুর সেই টাইপেরই লোক। টিপিক্যাল মধ্যযুগীয় অর্থোডক্স। উনি যে কন্যাভ্রূণ হত্যা করতে চাইবেন তাতে আশ্চর্যের কিছু নেই। ভদ্রলোক যদি তোকে সিঁড়ির উপর থেকে ধাক্কা মেরে নীচে ফেলে দিতেন— তাহলে সেটা ওঁর উপযুক্ত কাজ হত।"

"মানে?"

"মানে উনি এসব নাটক-ফাটকের ধার ধারবেন না। বরং কন্যাসন্তান ভূমিষ্ঠ হলে তাকে গলা টিপে মারবেন। তোর সন্তানকে খুন করার ইচ্ছেটা ওঁরই। কিন্তু এই খেলার মাস্টারমাইন্ড উনি নন। বাচ্চা মারা যাওয়ার ভাঁওতা দিয়ে টুক করে অ্যাবরশন করিয়ে দেওয়া, বা দুধে ঘুমের ওষুধ মিশিয়ে নির্ঝঞ্ঝাটে কাজ সেরে ফেলা... উঁহু...!" সে মাথা নাড়ল, "এত সূক্ষ্ম বুদ্ধির কাজ ওঁর নয়। কেউ ওঁকে প্ল্যান বাতলে দিচ্ছে। সে-ই এ খেলার মাস্টারমাইন্ড। আর ভয়টা তাকেই।"

"কে?"

"ঋতম হতে পারে। কিন্তু আমার মনে হয়, তুই তোর শাশুড়ির থেকে দূরে থাক। মহিলাকে বোঝা যাচ্ছে না। আর সেই জন্যই উনি বিপজ্জনক।"

"এতে আর নতুন কী?" স্নিগ্ধা একটা শ্বাস ফেলে বলে, "মেয়েরাই মেয়েদের সবচেয়ে বড় শত্রু। উনি নিজে মা হয়ে অন্য একজন মায়ের সর্বনাশ করবেন, এতে আর আশ্চর্য কী!"

কথা বলতে বলতেই আলো তার জগদ্দল ওভারনাইট ব্যাগ থেকে টুকটুক করে জিনিসপত্র বের করছে। একটা প্রেশার মাপার যন্ত্র এবং স্টেথোস্কোপ। রক্ত নেওয়ার সরঞ্জাম। ডঃ সুরাল রক্তের যে-রিপোর্টগুলো চেয়েছেন তার জন্য রক্ত নিয়ে যাবে আলো। তারপর তুলে দেবে বিক্রমদার হাতে। বিক্রমদা তাঁর জানাশোনা ক্লিনিক থেকে রিপোর্ট বের করে নেবেন।

"এ জিনিসপত্রগুলো কার?"

"কার আবার? আলো দন্ত বিকশিত করেছে, "বিক্রমদার।"

স্নিগ্ধা সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে তার দিকে তাকায়, "তুই রক্ত নিতে জানিস তো?"

আলো হেসে ফেলল। স্নিগ্ধা তার দিকে ভয়ে ভয়ে তাকিয়ে আছে। আলোর যোগ্যতায় তার বিশেষ বিশ্বাস নেই।

"রিল্যাক্স বেবি। লোকে বলে আমাদের বাড়িটা নাকি বাড়ি নয়, হাসপাতাল। আর সেই হাসপাতালের একমাত্র নার্স আমিই। প্রেশার চেক করতে ওস্তাদ। বাবা আর মায়ের গাদা রক্ত পরীক্ষা হয়েছে। এখনও হয়। সব সময় বাড়িতে লোক ডাকা যায় নাকি? তাই দিদির কাছ থেকে কায়দাটা নিজেই রপ্ত করে নিয়েছি। বাবা-মায়ের রক্ত আমিই নিই। প্রেশার চেক করি। তাদের যখন কোনও অসুবিধে হয় না, তখন তোরও হবে না।"

"তুই শিওর?"

"হান্ড্রেড পার্সেন্ট।" বলতে-বলতেই সে অভ্যস্ত হাতে রীতিমতো দক্ষতার সঙ্গে প্রেশার মেপে নিয়েছে, "চমৎকার! এত চাপ, এত প্রতিকূল পরিবেশের মধ্যেও মাম্মির ব্লাড প্রেশার সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে।"

"ফাজলামি ছাড়।" স্নিগ্ধা এতক্ষণে স্বাভাবিক হাসি হাসল। এতক্ষণ ধরে শাশুড়ির সামনে প্লাস্টিক হাসি হাসতে হাসতে সে ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল। এবার কুলকুল করে হেসে ফেলেছে। আলোর কথাবার্তার মধ্যে সব সময়ই এমন একটা চাপা মজা থাকে যে, না হেসে উপায় নেই। হাসতে হাসতেই বলল, "ফিউচার প্রোগ্রাম কী? পিঁড়িতে কবে বসছিস?"

আলো তার ডান হাতে রাবারের দড়ি বাঁধছে, "এই হচ্ছে তোদের হিংসুটে মনোভাব। পিঁড়ি বলছিস বটে, কিন্তু নিজেরাও জানিস, ওটা আসলে হাড়িকাঠ। তোরা সবাই জবাই হয়েছিস, আর এই ছাগলটা মনের আনন্দে গান গেয়ে বেড়াচ্ছে, কচি ঘাস খেয়ে বেড়াচ্ছে, সেটা সহ্য হচ্ছে না। সম্প্রতি আমি নিজের একটা নতুন পরিচয় বানিয়েছি। ভাবছি, যার সঙ্গেই আলাপ হবে তাকেই এই পরিচয়টা দেব।"

"সে আবার কী!"

আলো দুহাত জোড় করে ফেলেছে, "নমস্কার, আমি আলোলিকা ব্যানার্জি এবং অজয়কে আমি বিয়ে করছি না!"

"যাচ্চলে!" স্নিগ্ধা অবাক। "অজয়ের সঙ্গে তোর ব্রেক-আপ হয়ে গেছে! কবে হল?"

"সে অনেক লম্বা হিস্ট্রি মাম্মি।" আলোর মুখে বিষণ্ণতার ছাপ। "সাতকাণ্ড রামায়ণ বলতে পারিস। সীতার বিলাপ অন্য কোনও দিন শোনাব। উপস্থিত আমি ড্রাকুলার ভূমিকায় আছি। এবং সে ভূমিকা সম্পূর্ণ সফল। এই নে।"

স্নিগ্ধা বিস্মিত হয়ে দ্যাখে কথা বলতে-বলতেই কখন যেন দিব্যি রক্ত নিয়ে নিয়েছে আলো! অত বড় সিরিঞ্জটা কখন তার হাতে ঢুকল, কখন রক্ত টানল, কখনই বা বেরিয়ে এল, সে কিছুই টের পায়নি! আশ্চর্য হয়ে বলে, "সে কী! হয়ে গেল! তোর হাত তো একদম মাখন!"

আলো মুচকি হেসে সিরিঞ্জের রক্ত কনটেনারে ভরছে। অন্যমনস্ক গলায় বলল, "পাঁচ মিনিট হাতটা ভাঁজ করে রাখ। তারপর তোকে একটা মিকি মাউসের স্টিকার দেব।"

বাইরে সে যতই হাসিখুশি থাক না কেন, আসলে ভিতরে ভিতরে একটা বিষণ্ণতা কাজ করে চলেছে। তার সঙ্গে চাপা একটা বিদ্রোহও। দিন কয়েক আগেই সে অজয়ের বিরুদ্ধে পুলিশে কমপ্লেন করেছে। পাড়ার কারওর সেটা জানতে বাকি নেই। পুলিশ অজয়কে গ্রেফতারও করেছে। কিন্তু যত লজ্জা অজয়ের হওয়া উচিত, তার চেয়ে বেশি লজ্জার কারণ হয়েছে আলো নিজে। তাকে দেখলেই পাড়ার মহিলারা কানাঘুষো শুরু করে দেয়, "ওই দ্যাখো, ওই মেয়েটা ওর বয়ফ্রেন্ডের বিরুদ্ধে পুলিশ কেস করেছে। এত দিন ফুর্তি করে বেড়িয়েছে। এখন শখ মিটে গেছে তাই!"

যাঁরা আলোকে চেনেন, তাঁরা আবার সরাসরি এসে প্রশ্ন করছেন, "অজয়কে পুলিশে ধরালি কেন আলো? কিছু অসভ্যতা করেছে?"

তাদের চোখে হায়নার মতো শিকারির দৃষ্টি ধকধক করে জ্বলে। যদি অজয়ের অসভ্যতার বর্ণনার মধ্যে কিছু আমিষ উপাদান জোটে। কী কী অসভ্যতা করেছে শুনে গা গরম করার সুযোগ যদি পাওয়া যায়! যাঁরা তেমন ভালভাবে চেনেন না, তাঁরাও টিপ্পনি কাটার সুযোগ ছাড়ছেন না। নিরীহ গলায় জানতে চাইছেন, "তারপর? বিয়েটা কবে করছ?"

আলো চুপচাপ কনটেনারে স্নিগ্ধার নাম লিখছিল। তার পাথরের মতো মুখে মনের বিষাদ বিশেষ ছাপ ফেলেনি। স্নিগ্ধা তার দিকে মুগ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়েছিল। এই হল মেয়ে! ছেলেদের কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে

চলে! সম্পূর্ণা! স্বয়ংসিদ্ধা! এ নারীকে কোনও পুরুষের নামে দাসখত লিখে দিতে হয়নি, কারওর সঙ্গে মানিয়ে নিতে নিজের অস্তিত্ব কখনও বিসর্জন দিতে হবে না ওকে। এই তো সার্থক নারী!

"আমি যত তাড়াতাড়ি সম্ভব বিক্রমদার কাছ থেকে রিপোর্ট কালেক্ট করে নেব।" আলো এবার সমস্ত কিটস ব্যাগে ঢুকিয়ে ফেলেছে। "ডঃ সুরালের সঙ্গে কথা বলেছি। আপাতত তোর ক্লিনিকে না গেলেও চলবে। আমিই রিপোর্টগুলো নিয়ে জমা দেব। তারপর যদি উনি তোকে নিয়ে যেতে বলেন, তো যেতে হবে।"

"কিন্তু যাব কী করে?" সে একটু অসহায় গলায় বলে, "আমাকে এরা বাড়ি থেকে বেরতেই দেবে না।"

"সেটা ভাবার বিষয়!" আলো একমুহূর্ত ভাবে। "দেখি, কোনওরকম কল খাটিয়ে যদি তোকে নিয়ে যাওয়া যায়। তবে ডঃ সুরালের ফোন নম্বরটা তোকে দিয়ে দিচ্ছি। অসুবিধা বুঝলেই ফোন করবি। আর শাশুড়ির কাছ থেকে যতটা দূরত্ব মেনটেন করা যায় ততটাই করবি। আমার ঠিক ভদ্রমহিলাকে সুবিধের মনে হল না।"

"আমারও কোনও দিন সুবিধের মনে হয় না," স্নিগ্ধা বলল, "এখন তো আমি রীতিমতো ওঁকে এড়িয়ে চলছি। এমনকী বাবুর্চির রান্নাও খাই না। নিজে ভাতে ভাত রান্না করে খাচ্ছি। নিজেই জুসারে ফলের রস করে খেয়ে নিই। কারও এনে দেওয়া খাবার খাই না। জলটুকুও নয়।"

"সে কী! এই যে শুনলাম এ বাড়ির বউরা একটা পদ ছাড়া রান্না করে না! নিয়মানুযায়ী তোর হেঁসেলে ঢোকার কথাই নয়!"

"নিয়মের কথা শুনলে তো অনেক কিছুই করা যায় না।" সে মৃদু হাসল। "নিয়মানুযায়ী তো আমার সন্তানেরও আসার কথা নয়। কিন্তু তাকে আনার জন্যই তো এত তোড়জোড়! এত লড়াই। যদিও নন-কো-অপারেশন সব সময়ই চলছে। চাল খুঁজে পাই না। পেলেও হাঁড়ি খুঁজে পাওয়া যায় না। হাঁড়ি না পাওয়া গেলে এঁটো ডেকচি নিজেই কষ্ট করে মেজে নিই। ধর, দুটো আলু আর একটা ডিম সেদ্ধ করার জন্য বসিয়ে, বা চালে-ডালে খিচুড়ি চাপিয়ে এক মুহূর্তের জন্য বিশ্রাম নিতে গেলাম, এসে দেখি সমস্ত কে যেন সিঙ্কে ফেলে দিয়েছে। অগত্যা রান্না চাপিয়ে আমার কোথাও যাওয়ার উপক্রম নেই। ঠায় দাঁড়িয়ে থাকতে হবে। ফ্রুট জুসের ক্ষেত্রেও তাই। রাতে ঘুমোতে পারি না। যদি ঘুমের মধ্যে এরা কিছু করে! ইজিচেয়ারটায় আধশোয়া হয়ে বসে থাকি। মা হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বোধহয় মেয়েদের সহ্যশক্তি বেড়ে যায় বুঝলি? সব সহ্য হয়ে যায়। এখন আগের মতো ভোঁস ভোঁস করে ঘুমোতেও পারি না। যদি বা একটু চোখ লেগে আসে, সামান্য শব্দ হলেই চটকা ভেঙে যায়।"

আলো হতভম্ব হয়ে তাকিয়ে থাকে। এত কষ্ট করছে স্নিগ্ধা! শত্রুপুরীতে থেকে কীসের জন্য এমন লড়াই! তাও লড়াইয়ের শেষটা কী হবে তা এখনও অজানা।

"তুই এত কিছু সহ্য করে এখানে আছিস কেন?" সে খেপে যায়, "তার চেয়ে চল আমার ফ্ল্যাটে। ওখানে নিশ্চিন্তে খেতে, ঘুমোতে পারবি। তোর দেখাশোনার জন্য কেউ না কেউ থাকবে। সময়মতো চেক-আপ করাবি। ভয়ে কাঁটা হয়ে থাকতে হবে না। একদম নিশ্চিন্ত লাইফ।"

"না রে।" স্নিগ্ধা শান্ত ভাবেই বলে, "তোর নিজের কম সমস্যা নেই। তার উপর আর চাপ বাড়াতে চাই না। তাছাড়া এ বাড়ি ছেড়ে চলে গেলে লড়াইটা আর হল কই? নন্দিনী অন্য কারুর বাড়িতে আসতে চায় না। সে নিজের বাড়িতে, নিজের মহিমায় আসবে। এ বাড়ির লোকের সমস্ত বাধা সত্ত্বেও সে আসবে। তুই প্রতিবাদের কথা বলছিলি না? চেঁচিয়ে, লাফিয়ে, মিডিয়া নিউজ় করে কতটা প্রতিবাদ হবে জানি না। কিন্তু যদি এদের বাড়িতে থেকেই, এদের চোখের সামনেই কন্যাসন্তানের জন্ম দিতে পারি— তবে তার চেয়ে বড় প্রতিবাদ আর নেই।"

আলোর চোয়াল শক্ত হয়ে ওঠে। কী অদ্ভুত মনের জোর স্নিগ্ধার! কী আশ্চর্য জেদ! কষ্ট করতে তার কোনও আপত্তি নেই। কিন্তু এ শত্রুপুরী ছেড়ে কিছুতেই যাবে না! এই বাড়িতেই নন্দিনীকে জন্ম দিতে চায় সে! নিঃশব্দ, অথচ কী কঠিন প্রতিবাদ।

ভাবতে-ভাবতেই আরও একটা আশঙ্কা তার মনের মধ্যে দানা বাঁধে। স্নিগ্ধা বোকামি করছে না তো! শত্রুর নাগালের মধ্যে থেকে প্রতিবাদ করতে চলেছে। এত সহজে কি রায়চৌধুরী পরিবার মেনে নেবে!

"তুই শুধু আমার পাশে থাক আলো। একটু সাপোর্ট দে।"

"আমার একার সাপোর্টে কি কিছু হবে?" সে একটু দ্বিধাগ্রস্ত। "আমি তো তোর উপর চব্বিশ ঘণ্টা নজর রাখতে পারব না। সেই ফাঁকে যদি কিছু হয়। যদি তুই সিঁড়ি দিয়ে পড়ে যাস। অথবা আছাড় খাস! কী হবে তখন?"

সে আরও কিছু বলার আগেই এ ঘরের ফোনটা সজোরে বেজে উঠেছে।

"হ্যালো?" স্নিগ্ধা ফোন রিসিভ করেছে, "হ্যাঁ...হ্যাঁ-রে মা! ভালো আছি... সব ঠিক আছে... আলো মাসি? দেব? কথা বলবি...?"

স্নিগ্ধার মুখে নিজের নামটা শুনে চমকে উঠল আলো! তাকে এ বাড়িতে ফোনে কে চাইছে! সে আবার কার "আলো মাসি!" আলো কিছু বলার আগেই উত্তরটা দিয়ে দিল স্নিগ্ধা, "নন্দিনী ফোন করেছে। তোকে চাইছে!"

আলোর মাথায় যেন হিমবাহ ভেঙে পড়ল। এক ঘণ্টাও হয়নি সে এ বাড়িতে ঢুকেছে। অথচ সেই অতীন্দ্রিয় শক্তি তার নাম জেনে ফেলেছে। তার সঙ্গে নিজের সম্পর্কও জেনে ফেলেছে। এ কী করে সম্ভব! এ কী করে?

স্নিগ্ধাকে ইশারায় ফোনটা কিছুক্ষণ ধরে রাখতে বলে তাড়াতাড়ি দরজা খুলে ফেলল আলো। বিদ্যুৎবেগে দৌড়ে গেল সিঁড়ির দিকে। নন্দিনী নীচের হলঘরের ফোনটা থেকেই ফোন করে। এটা যদি কারওর কারসাজি হয় তবে এখন তার হলঘরেই থাকার কথা! আলো তিন লাফে সিঁড়ি টপকে গিয়ে বিদ্যুৎবেগে সোজা হলঘরে ঢুকল। ফোনটা নিঃসন্দেহে এখান থেকেই যাচ্ছে। অতএব ফোনের ওপ্রান্তের লোকটিকে আলোর দেখা উচিত।

কিন্তু আশ্চর্য! এখানে কেউ নেই! একটা লোক তো দূরের কথা, একটা পিঁপড়েও বোধহয় এ ঘরে নেই! এই সোফায় একটু আগেই বসে ছিল আলো। সোফাটা তেমনই আছে। তার ঠিক পাশে ফোনটাও যথাস্থানেই আছে! দেখলে মনেই হয় না যে, কেউ এখানে একটু আগেও ছিল! রিসিভারটার উপরের তোয়ালেটাও সুন্দরভাবে সাজানো। একফোঁটাও নিজের জায়গা থেকে নড়েনি! অসম্ভব! অসম্ভব ব্যাপার! তবে কি নন্দিনী লাইন ছেড়ে দিয়েছে?

সে তাড়াতাড়ি উপরে স্নিগ্ধার ঘরে ফিরে এল। উত্তেজনায়, দৌড়োদৌড়ির ফলে আলো তখন রীতিমতো হাঁফাচ্ছে! সে কোনওমতে দম নিতে নিতে দেখল স্নিগ্ধা খোশমেজাজে তখনও ফোনে গল্প করে যাচ্ছে। আলোকে দেখে বলল, "কোথায় গিয়েছিলি? নন্দিন তোকে খুঁজছে। কথা বলবি না?"

আলো বিনা বাক্যব্যয়ে ফোনটা নিয়ে নিল। তার বুকের ভিতরটা তখনও দপদপ করছে। কোনওমতে বলল, "হ্যালো।"

"আলো মাসি?" একটা চমৎকার সুরেলা কচি গলা ভেসে এল, "আমি নন্দিনী।"

"বলো।"

"তোমাকে থ্যাঙ্কস জানাতে ফোন করলাম।" কচি গলাটা আধো আধো স্বরে বলে, "কিন্তু রিপোর্টে কিছু পাবে না।"

"তুমি জানলে কী করে?"

"ডঃ সিনহাও এই টেস্টগুলোই করতে দিয়েছিলেন। কিন্তু পাওয়া যায়নি। সে রিপোর্ট বাবা লুকিয়ে রেখেছে।"

আলো হতবাক! কী বলবে ভেবে পাচ্ছে না! কোনও অদৃশ্য টেলিফোন থেকে ফোন করছে নন্দিনী!

"আগামী সপ্তাহে শুক্রবার এ বাড়িতে কেউ থাকবে না।" বাচ্চা মেয়েটা কেটে-কেটে বলল, "দিদুন আর দাদাই একটা পার্টিতে যাবে। বাবা অফিসিয়াল কাজে বাইরে যাবে। বাড়িতে সব সময়ের লোক বুড়ি

মার্থা আর মোটকা গেটকিপার থাকবে মা-কে পাহারা দেওয়ার জন্য। ওরা মাকে বেরতে দেবে না।"

"কী বলতে চাইছ?"

"ওরা খুব গরিব, জানো? মার্থার দশ হাজার টাকার দরকার। আর গেটকিপার খুব মদ খেতে ভালবাসে। সুযোগ পেলেই লুকিয়ে লুকিয়ে খায়। তাই তো ওর অত বড় ভুঁড়ি।"

এতক্ষণে বুঝল আলো। নন্দিনী ভীষণ বুদ্ধিমান মেয়ে। বাচ্চা মেয়ে নয়, এ কোনও বড় মাথা, অথবা কোনও অলৌকিক শক্তি! সে আস্তে আস্তে বলল, "চিন্তা কোরো না। ওইদিনই তোমার মাম্‌মামের চেক আপের ব্যবস্থা করছি। তুমি যেভাবে বললে, ঠিক তেমন ভাবেই হবে। ডঃ সুরাল অনেক রাত অবধি পেশেন্ট দেখেন। মাম্‌মামকে দেখে দেবে।"

"থ্যাঙ্ক ইউ মাসি।"

ফোনটা কেটে গেল! আলো স্তম্ভিত হয়ে রিসিভার হাতে নিয়ে ভাবছিল— এটা কী করে সম্ভব! এ কি বাস্তব? না অন্য কিছু!

"কোথা থেকে প্লটটা ঝেড়েছেন বলুন তো?" লোকটা ভুরু কুঁচকে কী যেন চিন্তা করছে— "খুব চেনা চেনা লাগছে। কোনও ইংলিশ নভেল? না কোনও ফিল্ম?"

"চেনা চেনা লাগছে আপনার?" এবার আমিও একটা সিগারেট ধরাই, "অসম্ভব নয়।"

"তাহলে স্বীকার করছেন যে, ঝেড়েছেন।"

"একেবারেই না।" আমি মুখের ধোঁয়াটা গিলে ফেলে বললাম, "আমি বলেছি আপনার চেনা-চেনা লাগাটা অসম্ভব নয়। কিন্তু কখনওই এ কথা বলিনি যে, গল্পটা ঝাড়া। যদি সে অর্থে বলেন, তাহলে অবশ্যই গল্পটা মৌলিক নয়। কারণ এ ধরনের ঘটনা আমাদের সমাজে আকছার ঘটে। হয়তো তেমন কোনও ঘটনা আপনি জেনে থাকবেন বা দেখে থাকবেন।"

সে ভুরু দুটো কপালের উপর জড়ো করে আরও কিছুক্ষণ ভাবল, "নাঃ, তেমন কিছু মনে পড়ছে না!"

"গল্পটা শুনতে শুনতে হয়তো মনে পড়ে যাবে।"

"আচ্ছা, সত্যি করে বলুন তো..." লোকটা কৌতূহলী স্বরে বলে, "নন্দিনী আসলে কে? আদৌ কোনও মানুষ? না কোনও প্রেতাত্মা!"

"প্রেতাত্মা!" হেসে ফেললাম। "প্রেতাত্মা মানুষের দেহে ঢুকতে পারে বলে শুনেছি, কিন্তু টেলিফোনে ঢুকতে পারে— এই প্রথম শুনছি!"

"কেন পারে না?" সে রীতিমতো জেদি গলায় বলে, "দুনিয়ার সবচেয়ে জটিল যন্ত্র কী বলুন তো? মানুষের শরীর। যদি তার ভিতরে প্রেতাত্মা ঢুকতে পারে, তবে টেলিফোনে কেন নয়?"

"কিন্তু নন্দিনী কোনও প্রেতাত্মা নয়!"

"আবার সেই একই কথা!" লোকটা অধৈর্য হয়ে মাথা ঝাঁকায়, "তবে নন্দিনী কে? সে ঠিক কী?"

"ধৈর্য ধরুন। সবে তো গল্পের প্রথম পর্ব শেষ হল।" আমি আরাম করে সোফায় গা এলিয়ে দিয়েছি, "শেষ পর্বেই নন্দিনীর রহস্যভেদ হবে। শুধু আর কিছুক্ষণের অপেক্ষা।"

"গল্পের আর একটা পর্বও আছে!"

"আছে বইকি!"

শেষ পর্ব

পাতা ঝরার মতো সময় চলে যায়। অথবা উপন্যাসের পাতা উলটানোর মতো দিনের পর দিন, মাসের পর মাস। কবে যে আয়ুর নির্দিষ্ট কয়েকটা দিন থেকে খসে-খসে পড়ে এক একটা মুহূর্ত, তা টের পাওয়া মুশকিল। চলমান শহরের বুকে উজ্জ্বল আলোর বিন্দুর মতো দিনগুলোও সাঁৎ সাঁৎ করে সরে যায়। পড়ে থাকে কিছু স্মৃতি।

স্নিগ্ধা এখন শরীরে তার মেয়ের অস্তিত্ব টের পায়। প্রথমে চুমুমুমু বুড়ো আঙুল চুষত। তারপর একটু একটু করে পাশ ফিরতে শিখল। প্রথম দিনটায় তার মনে হত পেটের ভিতরে যেন প্রজাপতি উড়ছে! এখন প্রজাপতির ওড়াউড়ি ছেড়ে রীতিমতো গোঁত্তা মারতে শিখেছে মেয়ে। সময়ে-অসময়ে হাত-পা ছুড়ে আড়মোড়া ভাঙছে। বাইরে থেকে কোনও জোরালো আওয়াজ পেলেই তার নড়ানড়ি শুরু হয়ে যায়। শুরুতে স্নিগ্ধার বেশ অস্বস্তি লাগত। কথা নেই বার্তা নেই, হঠাৎ করে পেটের ভিতরে একখানা কনুইয়ের খোঁচা! এখন অবশ্য তার ভারি মজা লাগে। মনে হয়— হ্যাঁ, সে আছে বটে!

আলো দরোয়ান আর বুড়ি মার্থার সঙ্গে সেট আপ করে ফেলেছে। অর্থাৎ টাকা-পয়সা ঘুষ দিয়ে ভালই ম্যানেজ করে ফেলেছে। কবে এ বাড়ির লোকরা কেউ বাড়িতে থাকবে না— তা নন্দিনীই আগে ফোন করে জানিয়ে দেয়। সেই নির্দেশ মতো আলো ট্যাক্সি নিয়ে চলে আসে, এবং ডঃ সুরালের কাছে স্নিগ্ধাকে চেক-আপের জন্য নিয়ে যায়। দু'ঘরের ল্যান্ডলাইনের নম্বর তার শাশুড়ির অর্ডারে পাল্টেছে ঠিকই, কিন্তু নন্দিনীর ফোন করা বন্ধ হয়নি। সে কী অদ্ভুত কৌশলে নম্বর জেনে ফেলেছে কে জানে। যেদিন ল্যান্ডফোনের নম্বর পাল্টে দেওয়া হল, সেদিন বিকেলেই ফোন এল।

"মা, আমি নন্দিনী।"

স্নিগ্ধা ঠিক তার আগের মুহূর্তেই ভীষণ অসহায় বোধ করছিল। ফোনটা পেয়েই উত্তেজিত হয়ে বলে, "নন্দিন... তুই এ নম্বর কোথা থেকে পেলি!"

নন্দিনী খিল খিল করে হেসে ওঠে, "তুমি জানলে তো আমিও জানব। আমি তো তোমার মধ্যেই আছি!" বলতে বলতেই তার কণ্ঠস্বর চাপা হয়ে আসে, "কিন্তু আমি যে আবার ফোন করেছি, এ কথা আর কাউকে জানিও না কিন্তু। আলোমাসিকে বলতে পার। কিন্তু দাদাই, দিদুন বা বাবাকে একদম বলবে না। কেমন?"

"আচ্ছা।"

"আর শোনো, তুমি আজ তোমার পার্সোনাল টয়লেট ইউজ় কোরো না।" মেয়েটার কণ্ঠস্বর এবার যেন খানিকটা বিষণ্ণ, "দিদুন তোমার টয়লেটে মার্বেলের উপরে অনেকটা তেল ঢেলে রেখেছে। তুমি গেলেই আছাড় খাবে, আর আমি মরে যাব।"

"একদম যাব না সোনা।"

কথা রেখেছিল স্নিগ্ধা। তার বেডরুমের অ্যাটাচড টয়লেটটা ইউজ় করেনি। বরং বাইরের জেনারেল টয়লেটটাই ব্যবহার করেছিল সেদিন। কিন্তু ঋতম এত কিছু জানত না। সে বাড়ি ফিরেই টয়লেটে ঢুকেছিল। ফলস্বরূপ একটা প্রকাণ্ড আছাড় খেয়ে তার পায়ের হাড়ে চিড় ধরেছে!

স্নিগ্ধা অবাক হয়ে দেখেছিল তার শাশুড়ির এত দিনের সভ্যতা-ভদ্রতার মুখোশ যেন হঠাৎ করে খসে পড়েছে। হিসহিস করে বলেছিলেন, "প্রথমে বিজনেসে লস! তারপর বাবার পায়ের হাড় ভাঙল! কী রাক্ষসীই পেটে ধরেছ স্নিগ্ধা! আমাদের সবাইকে না খেয়ে ওর শান্তি নেই। এখনও সময় আছে। কথা শোনো। ডঃ সিনহার কাছে চলো!"

"না।" সংক্ষিপ্ত জোরালো উত্তর দিয়ে সেখান থেকে চলে এসেছিল সে। মনে মনে ঘৃণা করেছিল শাশুড়িকে। আশ্চর্য! উনিও তো সন্তানের মা! মা হয়ে এমন নিষ্ঠুর হতে কীভাবে পারেন!

কখনও কখনও মনের মধ্যে আশঙ্কা ঘনিয়ে আসে। পারবে তো নন্দিনীকে জন্ম দিতে? যতই দিন যাচ্ছে— ততই এ বাড়ির লোকদের চোয়াল শক্ত হচ্ছে। বেড়ে যাচ্ছে মা-বাবা-ছেলের মিটিংয়ের বহর! সে বুঝতে পারছে, চতুর্দিক দিয়ে একটা ষড়যন্ত্রের জাল তাকে ঘিরে ধরছে। এ বাড়ির কেউ চায় না নন্দিনী এ বাড়িতে আসুক।

যখন মন খারাপ হয়, তখন নিজের ঘরের জানলায় গিয়ে দাঁড়ায় স্নিগ্ধা। আজকাল তার চোখে একটা নতুন জিনিস পড়েছে। যক্ষপুরীর বাগানে লাল লাল গোলাপের মধ্যে গর্বিত স্পর্ধায় মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে কিছু সাদা ঘাসফুল! এ বাগানে লালের জায়গা। সাদার স্থান নেই। তাই মালি রোজ ছেঁটে দেয় ঘাসফুলগুলোকে। কিন্তু আশ্চর্য! পরের দিন যেন সংখ্যায় তারা দ্বিগুণ হয়ে ফোটে। অদ্ভুত আগ্রাসী

মনোভাব তাদের। যেন লালের একাধিপত্যে জবরদখল বসাতে চায় তারা!

আরও অদ্ভুত ব্যাপার। চিরকালের বাঁজা আমগাছটায় এ বছর নতুন মুকুল হয়েছে! মা হতে চলেছে গাছটা! আজ পর্যন্ত এ বাগানে কোনও বেনিয়ম ঘটেনি। অথচ এখন ঘটছে!

সেদিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতেই স্নিগ্ধার মনে পড়ে যায় ডঃ সুরালের কথাগুলো। "বেবি একদম রেডি। দুরন্ত বাচ্চা তোমার। যা নড়াচড়া করছে না! একদম মাঠে নামার জন্য তৈরি। পুরো ম্যাচিওর! আমার মনে হয় না ও দশ মাস অবধি সময় নেবে। ন'মাসেই এল বলে তোমার ছানা।"

আলো লাফিয়ে উঠে বলে, "দেখতে কেমন হয়েছে ডক্? স্নিগ্ধার মতো?"

"না।" গম্ভীর মুখে জবাব দিলেন তিনি, "ও ওর মতো হয়েছে। আট-ন মাসের বাচ্চা যেমন হয়।" বলতে বলতেই তাঁর মুখে একটা মজাদার হাসি ফুটে ওঠে। স্নিগ্ধার দিকে তাকিয়ে বলেন, "এখনই মাসির যা অবস্থা দেখছি তাতে অলরেডি আধপাগল হয়েই গেছে। ছানা এলে ফুলপাগল তো হবেই, তোমাকেও পাগল করে ছাড়বে।"

"আর চেক-আপের প্রয়োজন আছে ডক্?"

"আপাতত ক্লিনিকে আর এসো না," ডক্টর বলেন, "যদি বাই এনি চান্স পেটে পেন ওঠে বা নড়াচড়া বন্ধ করে দেয় তবে ডাইরেক্ট আমার নার্সিং হোমে চলে এসো। এমনিতে কোনও কমপ্লিকেসি নেই। আর যা হওয়ার মনে হচ্ছে একেবারে ফাইনাল স্টেজে হবে। তবু, বি কেয়ারফুল।"

ভাবতেই তার মুখে একটা মিষ্টি হাসি ভেসে ওঠে। হঠাৎ করে নন্দিনীও পেটের মধ্যে ধমাস করে এক লাথি মারে।

"নন্দিনী...আমার নন্দিন্, মাঠে নামার কথা শুনেই খুব আনন্দ হয়েছে না? দাঁড়া, আর কিছু দিন পরেই মাঠে নামবি তুই। সোনা খুকু... নন্দিন্... আমার নন্দিন।"

আলো এখনও যথারীতি আগের মতোই বিন্দাস। দিব্যি অফিস করছে আর পাখির সঙ্গে টক্কা মারছে। তবে নন্দিনীর কথা সে কাউকে বলেনি। নন্দিনীর বিষয়টা নিয়ে সে নিজের উৎসাহেই গোপনে গোপনে খোঁজ চালিয়ে যাচ্ছে। তাদের এডিটর একদিন কথায় কথায় বলেছিলেন, "ভূত আসলে অতীতের নাম। তাই যেখানেই দেখবে অলৌকিক বা ভৌতিক কাণ্ড ঘটছে, সেখানেই অতীতের ধুলো ঝেড়ে দেখবে। ভূতের উৎস সেই অতীতেই আছে।"

কথাটা খুব মনে ধরেছিল আলোর। সে কাজের ফাঁকে ফাঁকে স্নিগ্ধার কাছে যক্ষপুরীর ইতিহাসের কথা শুনেছে। ঋতমদের কোনও এক পূর্বপুরুষ প্রথম সোনার বিজনেসে নামেন। তাও এক সাধুবাবার নির্দেশে! সাধুবাবা কিছু নিয়ম মেনে চলতে বলেছিলেন। যেমন প্রতি পূর্ণিমায় ও বৃহস্পতিবার নিয়ম করে লক্ষ্মীপুজো করতে হবে। বাড়ির মেয়েরা অভুক্ত থেকে পুজোর নিয়ম পালন করবে। সাধুবাবা দেহত্যাগ করেছেন, কিন্তু আজও সেই নিয়ম চলছে। বাড়ির প্রতিটি বংশের প্রথম সন্তানটিকে পুরুষ হতে হবে। যে কোনও সুন্দরী মেয়েই এই ফ্যামিলিতে পুত্রবধূ হয়ে আসার যোগ্যতা রাখে না। সুন্দরীকে প্রথমত শঙ্খিনী হতে হবে, মুকুট-কপাল যুক্তও হওয়া জরুরি। দ্বিতীয়ত, সৌন্দর্যের বাইরে তার গুণ থাকতে হবে। নাচ্য, বাদ্য, সঙ্গীত প্রেফারেবল। এত কিছু হওয়ার পরে তাকে রন্ধনপটিয়সী হতে হবে। অর্থাৎ রন্ধনে অন্নপূর্ণা!

এবং সবচেয়ে বড় যোগ্যতা, সুন্দরীর হাত ও পা মা লক্ষ্মীর মতো হতে হবে। লম্বা লম্বা, চাঁপাকলির মতন আঙুল। বিশেষ করে তার পায়ের দ্বিতীয় আঙুলটি যদি বুড়ো আঙুলের চেয়ে বড়ো হয়— তাহলে তো কথাই নেই! সেই মেয়েই মালক্ষ্মীর প্রতিরূপ।

এত কিছু যোগ্যতা বিচার করে তবেই এ বাড়ি অভিভাবকেরা ছেলের বউ আনেন। বউ কোন ঘরের, গরিব কি বড়লোক— সেটা বড় কথা নয়। উপরোক্ত যোগ্যতাগুলো থাকলেই যথেষ্ট।

"বাপ রে!" শুনে আলো মন্তব্য করে, "তোর শ্বশুর-শাশুড়ি কি জানলায় বাইনোকুলার নিয়ে বসে থাকতেন! যখনই এক মুকুট-কপাল, শঙ্খিনী, রন্ধন-পটিয়সী, নটী, সঙ্গীত শিল্পী বা বীণাবাদিনী, অপরূপ হস্ত-পদ যুক্তা বিবাহযোগ্যা বিনোদিনী রাস্তা দিয়ে যাবেন তখনই তাকে ক্যাঁক করে পাকড়াও করতে হবে। আশা করি বাইনোকুলার দিয়ে দেখেই ওঁরা তোকে পছন্দ করেছিলেন।"

স্নিগ্ধা হেসেছে। কোনও উত্তর দেয়নি। আলো জানতে চায়, "তুই ভাল সেতার বাজাতে পারতিস। তোর শাশুড়ি মা কী বাজান? নিজের না অন্যের ব্যান্ড?"

সে আবার হেসে ফেলে, "না, উনি বাদ্যের মধ্যে নেই। উনি নটী। জীবনের শুরুতে থিয়েটারে অভিনয় করতেন। পরে গোটা দুয়েক ফ্লপ ফিল্মে অভিনয় করে ক্ষান্ত দেন। মানে, তার পরই ওঁর বিয়ে হয়ে যায়।"

"সে কী! এমন অর্থোডক্স ঘরে তখনকার দিনে অভিনেত্রী পুত্রবধূ হিসেবে এল! মানে তোর শ্বশুরের মা-বাবা আনলেন!"

"আনলেন।" স্নিগ্ধা বুঝিয়ে বলে, "আমার শ্বশুরের বাবা, মানে আমার দাদাশ্বশুর ফিল্ম দেখতে গিয়ে আবিষ্কার করলেন যে, ফিল্মের পর্দার নায়িকাটি অবিকল সেই সব দৈহিক গুণসম্পন্না যা তারা খুঁজে খুঁজে হয়রান হচ্ছিলেন। অর্থোডক্স হলে কী হবে, সাধুবাবার নির্দেশ বলে কথা! যেমন বলেছেন, তেমনই আনতে হবে। এজন্য তাঁরা ডোম-চাঁড়ালের ঘরের মেয়ে আনতেও প্রস্তুত ছিলেন। অভিনেত্রী সেই তুলনায় তুচ্ছ ব্যাপার!"

"বুঝলাম। তোর শাশুড়ির নামটা কী?"

"কল্যাণী রায়চৌধুরী।"

"বিয়ের আগের সারনেম?"

"নট সো শিওর," স্নিগ্ধা জানায়, "তবে ঋতমের কাছে শুনেছি ওর মায়ের পদবি ছিল গুপ্ত।"

"কল্যাণী গুপ্ত। ওকে, থ্যাঙ্কস," আলো হেসে বলে, "এখন উনি রিয়েল লাইফে অভিনয় করছেন। ভ্যাম্প চরিত্রে।"

ওদের অফিসের এন্টারটেনমেন্টের পাতার চিফ সাগ্নিকদা বেশ বয়স্ক লোক। গত চল্লিশ বছর ধরে ফিল্ম ও থিয়েটারের দুনিয়া চষে-চষে প্রাচীন পাপী হয়েছেন। ফিল্ম আর থিয়েটারের দুনিয়ায় এমন কোনও ব্যক্তিত্ব নেই, যাঁর সম্পর্কে সাগ্নিকদা জানেন না। সুযোগ পেয়ে তাঁকেই কল্যাণী গুপ্তর সম্পর্কে প্রশ্ন করে বসল আলো। নামটা শুনে উনি নড়েচড়ে বসলেন, "কল্যাণী গুপ্ত। নামটা খুব চেনা চেনা লাগছে। থিয়েটারে অভিনয় করতেন কি?"

"হ্যাঁ দাদা।"

"সে তো বহু বছর আগে!" তিনি অবাক। "বেশিদিন অভিনয়ও করেননি। তবে ভদ্রমহিলার জীবনে কিছু মিষ্টি আছে।"

"মিষ্টি?"

সাগ্নিকদা চোখ বুজে মনে করার চেষ্টা করলেন, "এখনই গোটা ঘটনাটা মনে করতে পারছি না। কিন্তু এইটুকু মনে পড়ছে যে, উনি একবার ওঁদের থিয়েটার দলের এক ইয়ং অভিনেত্রীকে সুকৌশলে বিষ খাইয়েছিলেন!"

"সে কী! বিষ খাইয়েছিলেন! কেন?"

"সে ঘটনাটাই তো পরিষ্কার মনে পড়ছে না!" তিনি মাথা ঝাঁকালেন। "একটু পুরনো পঞ্জিকা ঘাঁটতে হবে। তোমার কি খুব দরকার?"

"ভীষণ দরকার দাদা।"

"আমার হাতে একদম সময় নেই। নয়তো আমিই খুঁজতাম।" সাগ্নিকদা একটু ভেবে নিয়ে বললেন, "ওয়েল আলোলিকা, তোমাকেই একটু কষ্ট করতে হবে। যত দূর মনে আছে, ইনসিডেন্টটা ছ'য়ের দশকে হয়েছিল। তুমি উনিশশো ষাট সালের খবরের কাগজ দিয়ে শুরু করো। মনে হয় পাঁচ-সাত বছরের কাগজ ঘাঁটলেই ইনসিডেন্টটা পেয়ে যাবে।"

'পাঁচ-সাত বছরের খবরের কাগজ' শব্দটা উনি এমনভাবে বললেন, যেন কোনও ব্যাপারই নয়। অথচ আলোর খবরের কাগজের

স্তূপ দেখেই হাত-পা ঠান্ডা হয়ে আসার জো! তবু সে হাল ছাড়েনি। গত একমাস ধরে প্রাণপণে রিসার্চ করে যাচ্ছে।

পাখি সচরাচর ডোমেস্টিক ভায়োলেন্সের দিকটা দেখে। তাই আলো ওকেও একটা দায়িত্ব দিয়ে রেখেছে।

"ঋতম রায়চৌধুরীকে চিনিস?"

কাঁটা চামচ দিয়ে চাউমিন তুলতে তুলতে বলে পাখি, "ধনলক্ষ্মী জেমস অ্যান্ড জুয়েলারির ঋতম রায়চৌধুরী?"

"হ্যাঁ, ঠিক তাই।" আলো পরোটা আর মাংসে মনোনিবেশ করেছে। "ওদের ফ্যামিলি সম্পর্কে কিছু জানিস?"

"কিছু বলতে কী?" সে চিলি সস আরও খানিকটা মিশিয়ে হুশহাশ করতে করতে খাচ্ছে, "বাপ আর ছেলে দশ আঙুলে কুড়িটা আংটি পরে ঘোরে। এইটুকুই জানি।"

"তার থেকে আরও একটু বেশি কিছু? ওদের বউদের ব্যাপারে?"

"ডোমেস্টিক ভায়োলেন্সের কথা জানতে চাইছিস?"

আলো প্রশ্নটাকে আরও টু দি পয়েন্ট করে দেয়, "জানতে চাইছি, ওদের ফ্যামিলিতে বধূহত্যার কোনও রেকর্ড আছে কি না।"

পাখির চোখ কুঁচকে যায়। "ঠিক জানি না। তবে ঋতম রায়চৌধুরীর একটিই বউ আছে। আই মিন, ওঁর যখন বিয়ে হয়েছিল তখন পেজ থ্রিতে খবরটা বেরোয়। যত দূর জানি সেই মেয়েটি বহাল তবিয়তে বেঁচে রয়েছে।"

আলো মনে মনে ভাবে, কী তবিয়তে আছে সে তার ভালই জানা আছে।

"একটু পতা লাগা পাখি।" আলো বলে, "একটু ফ্ল্যাশব্যাকে যা। ঋতম রায়চৌধুরী না হোক, ওর বাবার লাইফে এমন কোনও ঘটনা আছে কি না, কিংবা ঠাকুরদা...!"

পাখি তার দিকে তীক্ষ্ণ চোখে তাকায়, "কী ব্যাপার? একেবারে বাপ-ঠাকুরদাকে ধরে টানাটানি করছিস? এনি গড়বড়?"

কাজের ব্যস্ততায় অজয়কে প্রায় ভুলেই গেছে আলো। যখন কেউ সে প্রসঙ্গ তোলে তখন মুচকি হেসে বলে, "ওসব থাক। অন্য কথা বলি?"

নিজেকে এখন সবচেয়ে বড় অপদার্থ বলে মনে হয় প্রদীপের। আসলে সে যে পাখিকে ব্যথা দিতে চেয়েছিল, ঠিক তা নয়। সে যে তার সঙ্গে সত্যিই বিচ্ছেদ চেয়েছিল ঠিক তাও নয়। আসলে নিজের অকর্মণ্যতার জ্বালা, হতাশার বেদনা অন্য কোথাও একটা ঢেলে দিতে চেয়েছিল। হতাশা জিনিসটা খুব খারাপ। অনেকটা ছাইচাপা আগুনের মতো। ধিকিধিকি জ্বলে। আবার সুযোগ পেলেই চূড়ান্ত জ্বালা উদ্গীরণ করে। সে জ্বালা তখন হতাশাগ্রস্ত মানুষটিকে কেন্দ্র করে ভূমিকম্পের মতো চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ে। তাতে কেন্দ্রীয় মানুষটি তেমন ক্ষতিগ্রস্ত হয় না। কিন্তু তার আশেপাশের মানুষ এবং তাদের অনুভূতিগুলো জ্বলে পুড়ে খাক হয়ে যায়। কথায় আছে, অলস মস্তিষ্ক শয়তানের কারখানা! অকর্মণ্যতার সবচেয়ে বড় সাইড এফেক্ট হল হীনমন্যতায় ভোগা। হীনমন্যতায় ভুগতে-ভুগতে প্রদীপ অবধারিত ভাবে নানারকম কল্পনা করেছে। পাখির আশেপাশে তার চেয়ে যোগ্যতর পুরুষের আনাগোনা সহ্য হয়নি তার। মনে হয়েছে, পাখি সফলতার দিকে ঝুঁকছে। মেয়েদের তো তেমনই নিয়ম। তারা সফল পুরুষ ভালবাসে। পাখিও নিশ্চয়ই ব্যতিক্রম নয়।

সেদিন রাতে পাখি আর বিছানায় আসেনি। সারারাত হলঘরের সোফায় শুয়েছিল। পরদিন সকালে নিয়মমতো ব্রেকফাস্টও দিয়েছে, প্রদীপ নিষ্ঠুর আনন্দে দেখেছিল, তার চোখেমুখে রাত্রি জাগরণের ছাপ স্পষ্ট। পাখি কোনও কথা বলেনি। ব্রেকফাস্ট রেডি করে দিয়ে চুপচাপ তৈরি হয়ে বেরিয়ে গিয়েছিল অফিসের পথে।

পাখি ব্যথা পেয়েছে ভেবে বড় শান্তি পেয়েছিল প্রদীপ। বেশ হয়েছে। পাখিকে আনন্দ দেওয়ার ক্ষমতা নেই তার। কিন্তু কষ্ট দেওয়ার ক্ষমতা আছে। অন্তত এক জায়গায় তার জোর খাটানোর অধিকার আছে। প্রদীপ অত্যন্ত নিষ্ঠুরতার সঙ্গে উপলব্ধি করেছিল— এই একটা জায়গায় সে আছে। তার অস্তিত্ব আছে। সে ছাড়া আর কেউ পাখিকে কাঁদাতে পারে না।

অথচ আনন্দটা বেশিক্ষণ থাকল না। ব্রেকফাস্ট খেয়ে শ্মশানের পথে চলেছে, এমন সময় বিল্ডিংয়ের নীচে দেখা হয়ে গেল অনির্বাণের সঙ্গে। ছেলেটার মুখোমুখি সে হতে চায় না। নিজে ব্যর্থ, তাই সাফল্যের ঝলক ভাল লাগে না। বলা ভাল, সহ্য হয় না!

প্রদীপ অনির্বাণকে এড়িয়েই যেতে চেয়েছিল। কিন্তু হতভাগা একেবারে ঘাড়ে এসে পড়ল, "দীপদা, হ্যাপি ম্যারেজ অ্যানিভার্সারি।"

চমকে উঠল সে। আজ তাদের ম্যারেজ অ্যানিভার্সারি নাকি? একদম ভুলেই গিয়েছিল। কিন্তু এ ব্যাটা জানল কী করে?

"তোমার নির্ঘাৎ মনে নেই!" অনির্বাণ হো-হো করে হেসে ওঠে, "পাখিদি একদম ঠিক বলেছিল! তুমি এক নম্বরের ভুলো!"

কী বলল? পাখিদি! প্রদীপ তবু ভ্রূকুটি করে তাকায়। আর কী বলেছে তার সম্বন্ধে অনির্বাণের পেয়ারের পাখিদি! নিষ্কর্মার ধাড়ি, অপদার্থ একটা লোক!

"তোমার নভেলটা দুর্দান্ত!" অনির্বাণ বলল, "বাবা বলছিল, বইটাকে ঠিকমতো প্রজেক্ট করতে পারলে লেখক হিসাবে তোমার নাম ফাটবেই-ফাটবে। পাখিদি আর বাবার কাছে তোমার লেখার এত প্রশংসা শুনে আমিও পাণ্ডুলিপিটা পড়ার লোভ সামলাতে পারিনি। দারুণ লিখেছ দীপদা। আমি আর একটা সম্ভাবনার কথা ভাবছিলাম। আমার এক বন্ধু ফিল্ম প্রোডিউসর করবে বলে গল্প খুঁজছে..."

প্রদীপের মাথা ঝিমঝিম করতে থাকে। কী ভাষায় কথা বলছে অনির্বাণ! পাণ্ডুলিপি! নভেল! বই!

"পাখিদি তোমায় কিছু বলেনি!" অনির্বাণ তার স্তম্ভিত মুখের দিকে কয়েক মুহূর্ত তাকিয়ে থেকে বলল, "দীপদা, তুমি কিছু জান না? আমার বাবার পাবলিশিং হাউসে পাখিদি তোমার উপন্যাসের পাণ্ডুলিপি জমা দিয়েছিল। সেটা সিলেক্টেড হয়েছে। সে চিঠিও পাখিদির কাছে আছে।"

প্রদীপের নিজেকে অসুস্থ বলে মনে হতে থাকে। তাহলে অনির্বাণের সঙ্গে এত গুজুর গুজুর ফুসুর ফুসুর এই জন্যই করছিল পাখি! র‍্যাপে মোড়া গিফটটা তবে পাখিকে কেউ দেয়নি! ম্যারেজ অ্যানিভার্সারি উপলক্ষে তার জন্যই গিফট এনেছিল পাখি।

মাথার ভিতরে একটা জোকার হো হো করে হেসে উঠল। হাততালি দিতে দিতে বলল, "পাখি তোমায় সারপ্রাইজ় দিতে চেয়েছিল। কিন্তু তুমি তার আগেই তাকে সারপ্রাইজ় দিয়ে দিয়েছ। কাল রাতেই চমৎকার উপহার দিয়েছ! সত্যি প্রদীপ... ইউ আর গ্রেট!...ইউ আর রিয়েলি গ্রেট...!"

সেদিন আর শ্মশানে যাওয়া হল না প্রদীপের।

"পাখি, আই অ্যাম সরি।"

রাতে পাখি অনেক দেরিতে বাড়ি ফিরেছিল। বাড়ি ফিরে একটিও কথা বলেনি প্রদীপের সঙ্গে। নিঃশব্দে সান্ধ্যস্নান করে ঢুকে গিয়েছিল কিচেনে। বাইরের ঘরে বসে প্রদীপ টের পাচ্ছিল রান্নাঘরের ঠুংঠাং আওয়াজ। তার ইচ্ছে করছিল তখনই পাখির কাছে ছুটে যায়। কিন্তু কী বলবে? কীভাবে ক্ষমা চাইলে পাখি তাকে ক্ষমা করবে, সে ভেবে পাচ্ছিল না। উঁকি মেরে দেখেছে পাখি বাঁধাকপি গ্রেট করেছে। মুখে পাষাণপ্রতিমার মতো কঠিন স্থিরতা। সে মুখে কোমলতার মৃদু আভাসও পায়নি।

ডিনারেও একা বসেছিল প্রদীপ। পাখি তাকে খাবার বেড়ে দিয়েছে। কিন্তু নিজে বসেনি। এই প্রথম মুখ খোলার সুযোগ পেল প্রদীপ।

"তুই খাবি না?"

পাখি একবার তাকে কঠিন দৃষ্টিতে মেপে নেয়। তারপর আস্তে আস্তে জবাব দেয়, "আমি খেয়ে এসেছি।"

"ও!" মরিয়া হয়ে বলল সে, "পাখি, আই অ্যাম সরি... কাল রাতে যা হয়েছে...আই অ্যাম রিয়েলি সরি!"

পাখি কোনও জবাব দেয় না। সে মন দিয়ে সাদা ধবধবে ভাতের

কণাগুলোকে ঠিকমতো সাজিয়ে দিচ্ছে। প্রদীপের ক্ষমাপ্রার্থনায় কোনও কাজ হল বলে মনে হয় না। পাখির মুখের একটি রেখাও কোমল হয়নি।

"আমি একটা ইডিয়ট!" সে পাখির হাত জড়িয়ে ধরেছে। "আমি ভেবেছিলাম...আমি ভেবেছিলাম..."

"কী ভেবেছিলি?" শান্ত গলায় বলল পাখি, "ঠিকই ভেবেছিলি দীপ। আমাদের বোধহয় আলাদা হয়ে যাওয়াই উচিত।"

"পাখি!" প্রদীপ কাতরোক্তি করে ওঠে, "আমি এমন বলতে চাইনি। বিশ্বাস কর। আমি তো এমনিই...।"

"এমনি এমনি কিছু হয় না দীপ," শীতল কণ্ঠে বলল সে, "তুই কাল যা করেছিস তা এমনি-এমনি করিসনি। আজ যা করছিস, তাও এমনি-এমনি করছিস না।"

প্রদীপ মাথা নিচু করে। এই মুহূর্তে সরাসরি পাখির দিকে তাকানোর সাহস নেই। নিচু স্বরে বলল, "তুই আমায় এবারের মতো ক্ষমা করে দে। আর কখনও এমন হবে না।"

"না, আর কখনও হবে না," পাখি বলে, "হবে না, কারণ তুই এখন জানিস যে, তোর বই পাবলিশ হতে চলেছে। জানিস যে, আর তোকে কেউ অকর্মণ্য বলবে না। কয়েকদিন পরেই লেখক হবি। হয়তো একদিন বিখ্যাত মানুষও হয়ে যাবি। তোর খ্যাতির পিছনে আমি চাপা পড়ে যাব। তুই একের পর এক নভেল লিখবি, পুরস্কার পাবি। তোর নাম ক্রমশ বড় হবে। তখন আমি তোর সংসার সামলাব। সন্তান সামলাব। হয়তো সংসার সামলানোর জন্য চাকরিটাও ছেড়ে দেব।" সে একটু থামল। তারপর একটা শ্বাস টেনে বলল, "তখন যদি আমার মনে হয়ে যে, আমি তোর কেপ্ট! যদি মনে হয়, সংসারে আমার আসল ভূমিকা শুধু বিছানা গরম করার, আসলে আমি নাথিং বাট আ ব্লাডি প্রস্টিটিউট— তখন কী করবি দীপ?"

দু'জনেই বুঝল, ওরা এক ছাতের তলাতেই থাকে বটে— কিন্তু মাঝখানের তারটা কেটে গেছে।

"মেয়েদের জীবনে সব সময়ই একটা খুঁটি লাগে। সমাজ তাদের স্বাবলম্বী দেখতে অভ্যস্ত নয়। কোনও না কোনও পুরুষের সম্পত্তি হিসেবে তারা সমাজে প্রতিষ্ঠা পায়। বিয়ের আগে বাবার সম্পত্তি। বিয়ের পরে স্বামীর সম্পত্তি। আর বুড়ো বয়সে ছেলের দায়। আর কোনও নারী যদি উপরোক্ত কোনও ক্যাটাগরির মধ্যে না পড়ে— তবে সে বেওয়ারিশ। এবং সেই সঙ্গে বারোয়ারিও বটে। বারোয়ারি মেয়েদের ভাগ্য সম্পর্কে বেশি না বলাই ভাল। তাদের জীবন নিজেদের মতো করে গড়ে তোলার উপায় নেই। তারা সেই সব মাংসের টুকরোর মতো, যা কসাই অপ্রয়োজনীয় ভেবে ছেঁটে রাস্তায় ফেলে দিয়েছে। যে-কোনও কুকুর ইচ্ছেমতো সেই মাংসের কামড় বসাতে পারে। আসলে নারীর জীবনই খাদ্যের। কখনও খাদকের সংখ্যা এক, কখনও একাধিক। ভাগ্যবতী নারীর জীবনে একটিই খাদক জোটে। এবং সে পরিচিত। বারোয়ারি নারীদের কপালে অপরিচিত খাদক। তারা একাধিক। পার্থক্য শুধু এইটুকুই।"

এইটুকু বলেই চুপ করলেন ভদ্রমহিলা। আলগোছে একবার কবরের উপরে হাত বোলালেন। তারপর ফের বলতে শুরু করলেন, "আমার জীবনও বেওয়ারিশ হতে পারত। বাবা অন্তত তেমন ব্যবস্থাই করে গিয়েছিলেন। সকাল থেকে রাত অবধি ঠায় দাঁড়িয়েছিলাম হাওড়া স্টেশনের বড় ঘড়িটার কাছে। কোনও নারীমাংসের দালালের হাতে পড়তেই পারতাম। কোনও লম্পট এগিয়ে আসতেই পারত। জীবনের সবচেয়ে কদর্য অভিজ্ঞতা হতেই পারত। কিন্তু আমার সৌভাগ্য, তেমন কিছু ঘটল না!

"আমি তখন ভীষণ ক্লান্ত! সারাদিন ধরে কেঁদে-কেঁদে গলা দিয়ে আর স্বর বেরোচ্ছে না। ভয়ে-ভয়ে দেখছি, আমার চতুর্দিক দিয়ে কত রকম মানুষ চলে যাচ্ছে। তাদের চোখে কখনও বিস্ময়। কখনও বা হায়নার খিদে। আমি দেখছি, আর কুঁকড়ে যাচ্ছি! ভীষণ খিদে পেয়েছে। জলতেষ্টা পেয়েছে। স্টেশনে দু'-একটা খাবারের দোকান ছিল। লোলুপ চোখে দেখছি, লোকে লুচি-তরকারি কিনে খাচ্ছে। আমার খাওয়ার উপায় নেই। হাতে একটা পয়সাও নেই।

"এমন সময় একজন কালো কোট পরা লোক এগিয়ে এলেন। সম্ভবত টিকিটচেকার। তীক্ষ্ণ চোখে আমার দিকে দেখলেন। খসখসে গলাকে যথেষ্ট নরম করে জিজ্ঞাসা করলেন, "তুমি কার সঙ্গে এসেছ খুকি? কোথায় যাবে?"

"পরে শুনেছিলাম উনি সকাল থেকেই আমার উপর লক্ষ রেখেছিলেন। আমি যে সকাল থেকেই বড় ঘড়িটার নীচে দাঁড়িয়ে আছি, তা তাঁর নজর এড়ায়নি। ডিউটির মধ্যে এগিয়ে আসতে পারেননি। ডিউটি শেষ হতেই অসীম কৌতূহলে ব্যাপারটা কী দেখতে চলে এলেন।

"আমার গলা দিয়ে তখন আওয়াজ বেরচ্ছে না। টিকিটচেকারকে দেখে আরও ভয় পেয়ে গিয়েছি। আমার কাছে তো টিকিটও নেই। লোকটা যদি আমায় জেলে দেয়।

"ভদ্রলোক আমার অবস্থা দেখে বললেন, "তুমি কোথায় যাবে মামণি? কার সঙ্গে এসেছ?" কোনওমতে বলি, জানি না।

"আমার অবস্থা দেখে তাঁর দয়া হল। বললেন, "খিদে পেয়েছে? খাবে কিছু?"

"গলা দিয়ে স্বর বেরচ্ছিল না। তবু অতি কষ্টে বললাম, "একটু জল।"

"তিনি আমায় জল খাওয়ালেন। খাবার খাওয়ালেন। আমার সহজাত নারীর ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় বলছিল, মানুষটি ভাল। এঁকে আমি বিশ্বাস করতে পারি। সব কিছু বলতে পারি। তিনিও একটু-একটু করে সমস্ত বৃত্তান্ত জেনে নিলেন। আমার মতো তিনিও বুঝতে পেরেছিলেন যে, বাবা আমায় ফেলে গেছেন। কিন্তু বুঝতে দিলেন না, বললেন, "হয়তো বাবা তোমায় হারিয়ে ফেলেছেন। খুঁজে পাননি। তুমি আমার সঙ্গে যাবে?"

"আমার হাত শক্ত করে ধরলেন তিনি। বুঝলাম এ হাতের উপর বিশ্বাস করা যায়। আস্থা রাখা যায়। তাঁর হাত ধরে হাওড়া স্টেশন থেকে ফের জীবনের স্রোতে ফিরলাম আমি। আমার জীবনের নতুন অধ্যায় শুরু হল। আজীবন চেকারবাবুকে মনে রাখব আমি। মাথার উপরে তাঁর হাত ছিল বলেই নষ্ট হয়ে যাইনি। তিনি আমার জীবনে ঈশ্বররূপে এসেছিলেন।"

তিনি একটু থামলেন। আপনমনেই হাসলেন। তাঁর চোখে সুদূর অতীত আবার ভেসে উঠল। "চেকারবাবুর কোনও ছেলে-মেয়ে ছিল না। তাঁর স্ত্রী ও তিনি— দুটি প্রাণীরই সংসার ছিল। আমি হলাম তৃতীয়জন। আমার জীবনে এই প্রথম সুখ এল। চেকারবাবুর স্ত্রীকে আমি 'ছোট মা' বলে ডাকতাম। নিজের মায়ের কাছে যে-স্নেহ পাইনি, ছোট মা আমাকে তা দিয়েছিলেন। তিনি বিরক্ত হতেই পারতেন। জাত-পাতের ঠিক নেই, বংশের ঠিক নেই, কোথা থেকে আবার একটা উপদ্রব ঘাড়ে এসে জুটল— ভেবে আমাকে 'দূর ছাই' করতেই পারতেন। কিন্তু তা করেননি। সন্তানহীনা নারীর অন্দরমহল অনেক দিন শূন্য ছিল। আমি এসে তার গোটাটাই জুড়ে বসলাম। এই প্রথম জানলাম— আমারও মূল্য আছে।"

তাঁর চোখে আনন্দাশ্রু চিকচিক করে উঠল। "চেকারবাবু ঠিক করলেন, আমায় মেয়েদের স্কুলে ভর্তি করে দেবেন। সেই পরিকল্পনামতো বাড়িতেই আমাকে পড়াতে শুরু করলেন। আমি একটু একটু করে অক্ষর চিনতে শুরু করলাম। তারপর পড়তে, লিখতেও অসুবিধা হত না! সে যে কি বিস্ময়ের দেশ! চেকারবাবু খবরের কাগজ নিয়ে আসতেন। খবরের গুরুত্ব তখন আমার মাথায় ঢুকত না। কিন্তু যেদিন বুঝলাম, যা এত দিন হিজিবিজি কয়েকটা দাগের বেশি কিছু ছিল না, তা একটু একটু করে বোধগম্য হচ্ছে, আমি পড়তে পারছি, সেদিন আনন্দের শেষ ছিল না। তখন পড়ার নেশা পেয়ে বসেছিল। হাতের কাছে যা পেতাম, পড়ে ফেলতাম। চেকারবাবু আমার জন্য বইও কিনে এনেছিলেন। এত দিন যা মুখে মুখে শুনেছি, সেসব এবার কাগজের অক্ষরে পড়তে শুরু করলাম। একটু একটু করে কবে যে

লেখাপড়ায় পাকা হয়ে উঠেছি বুঝতেই পারিনি। রামায়ণ, মহাভারত প্রায় মুখস্থ হয়ে গেছে। চেকারবাবু একদিন জানালেন, স্কুলে ভর্তি হওয়ার সময় হয়েছে।

"এর মধ্যেই আর একটা জিনিস বুঝতে পারতাম। আমি যেমন সমাজের কাছে মূল্যহীন ছিলাম, তেমন ছোটমাও মূল্যহীন। পথেঘাটে, পড়শিরা তাঁকে দেখলেই মুখভঙ্গি করতেন। কোনও অনুষ্ঠানে তাঁকে নেমন্তন্ন পেতে আমি কখনও দেখিনি। বিয়ে, অন্নপ্রাশন, বা কারওর জন্মদিনে তাঁকে কেউ আমন্ত্রণ করত না। একটা পাপ কাজই তিনি করেছিলেন। মা হতে পারেননি। বন্ধ্যা নারী সমাজের চোখে অশুভ। সন্তানহীনা নারী হয়তো অন্য কারওর সন্তানের উপর নজর দিতে পারে, এই আশঙ্কায় আশেপাশের সমস্ত বাচ্চা ছেলেমেয়ের মা তাদের সন্তানদের সামলে রাখতেন। ছোটমার কাছে আসতে দিতেন না। অথচ ছোটমা কী পরিমাণ স্নেহময়ী ছিলেন, তা আমার চেয়ে ভাল কেউ জানত না। বাচ্চারা তো অত বুঝত না। তারা অশুভ দৃষ্টি বোঝে না। শুধু বোঝে স্নেহ আর আদর। আর এই দুটো জিনিসই ছোটমার প্রকৃতিতে ঈশ্বর উজাড় করে দিয়েছিলেন।

"পড়শিদের বাচ্চাদের মধ্যে একটি বড় দুরন্ত ছিল। দত্তদের ছেলে সুকু। ছোট্ট হলে কী হবে, দুরন্ত দি গ্রেট। সে সুযোগ পেলেই ছোটমার কাছে ছুটে আসত। বলত, কাকিমা, ভাত খাব। ছোটমা হেসে বলতেন— 'হ্যাঁ রে, তোদের এত বড় বাড়ি, এত বড় পুকুর, রোজ বাড়িতে পুলি-পোলাও, মাছ-মাংস হয়। তাই ফেলে আমার বাড়িতে খেতে আসিস কেন? আমার বাড়িতে তো শুধু আলুসিদ্ধ আর ভাত!' সুকু বিছানার উপরে গুরুঠাকুরের মতো বাবু হয়ে বসে বলত, 'আমি আলুসিদ্ধ ভাতই খাব।' অগত্যা ছোটমা তাকে ভাত বেড়ে সযত্নে খাইয়ে দিতেন। খুবই সামান্য খাওয়া-দাওয়া। কিন্তু সুকু যে নিজের বাড়ির রাজভোগ ছেড়ে এই সামান্য খাবারে কী আনন্দ পেত, তা চোখে না দেখলে বিশ্বাস করা সম্ভব নয়। একদিন সে এসে আর যাওয়ার নাম করে না। খালি বলে, 'কাকিমা, আমি তোমার কাছে শোব।' ছোটমা বার বার বারণ করলেন। কিন্তু সেদিন সে নাছোড়বান্দা। কাকিমার সঙ্গেই শোবে।

"আমরা কেউ বুঝিনি তার ওই উদ্ভট আবদারের কারণ। আসলে তার খুব শীত করছিল। সে কথা সুকু একবারও বলেনি। কিন্তু তার ছোট্ট দেহটাকে যে কালজ্বরে অধিকার করে নিতে চলেছে এ কথা তখন শুধু ঈশ্বরই জানতেন। ছোটমা তার উৎপাতে শেষ পর্যন্ত তাকে কোলে করে বিছানায় শোওয়ালেন। মিনিট পাঁচেকের মধ্যেই দেখলেন তার ছোট্ট দেহটা হি-হি করে কাঁপছে। ঘরের সমস্ত লেপকম্বল তার গায়ে চাপিয়ে দেওয়ার পরেও কাঁপুনি থামল না। তখন ছোটমা প্রাণপণ তাকে জাপটে ধরে, নিজের বুকের উষ্ণতাটুকু দিয়ে ছোট ছেলেটাকে চাঙ্গা করার চেষ্টা করলেন। তবু কাঁপুনি থামল না।

"যখন তার মা জানতে পারলেন, তখন অশ্রাব্য গালিগালাজ আর শাপশাপান্ত করে সুকুকে একরকম কাকিমার বুক থেকে কেড়ে নিয়েই গেলেন।

"সেই যে সুকু গেল, আর এল না। তিন দিনের জ্বর-বিকারে সে চলে গেল। সুকুর মায়ের কাছে তখন দুজনই অপরাধী ছিলেন। প্রথম জন ঈশ্বর। তাঁকে বিশেষ নাগালে পাওয়া যায় না বলে সমস্ত রাগ গিয়ে পড়ল দ্বিতীয়জনের উপরে। ছোটমাকে যা নয় তাই বলে অপমান করলেন। তাঁকে শাপশাপান্ত করেও তার রাগ কমল না। চেঁচাতে চেঁচাতে বললেন, 'ছেলেটাকে খেয়ে ফেললি! আমার জ্যান্ত ছেলেটাকে খেয়ে ফেললি রাক্ষুসী। তোর কী ক্ষতি করেছিল আমার সুকু? ডাইনি... কলজেখাগী...! আমার ছেলেটাকে দেখলেই জিভ লকলক করত। তোর কোনও দিন ভাল হবে না... কোনও দিন ভাল হবে না।'

"ছোটমা'র কিছু বলার ছিল না। তিনি দরজার আড়ালে দাঁড়িয়ে মুখে আঁচলচাপা দিয়ে কাঁদছিলেন। দত্তগিন্নির চেঁচামেচিতে ক্ষিপ্ত জনতা তখন উন্মত্ত। বারান্দায় বড়-বড় ইটের টুকরো এসে পড়ছে। তার মধ্যেই একটা ইটের টুকরো সরাসরি লাগল এসে তাঁর কপালে। আমি দেখলাম তাঁর মাথা থেকে গলগল করে রক্ত পড়ছে! কিন্তু মুখে একটাও শব্দ নেই। তাঁর কপাল থেকে রক্তের ধারা চোখ বেয়ে নেমে এল। মিশল অশ্রুর সঙ্গে। কয়েক মুহূর্তের জন্য মনে হল, চোখ দিয়ে জল পড়ছে না ছোটমা'র! রক্ত পড়ছে!

"রাত্রে চেকারবাবু এসে অবস্থা দেখে রেগে গেলেন। আমি যতখানি সম্ভব রক্ত-টক্ত মুছে কপালে আয়োডিন লাগিয়ে পট্টি করে দিয়েছিলাম। কপালটা অনেকখানি কেটে গিয়েছিল। সে ক্ষতের বেদনা যতখানি ছিল, তার চেয়ে বেশি ছিল সুকুর মৃত্যুর যন্ত্রণা! খুকু যখন অসুস্থ ছিল, তখন ছোটমা ঠাকুরঘরে হত্যে দিয়ে পড়েছিলেন। আমি জানি, তিনি একবিন্দু জলও স্পর্শ করেননি! কিন্তু তাঁর অন্তরের যন্ত্রণা বোঝার মতো কেউ ছিল না। চেকারবাবুও বুঝলেন না। বরং রেগে গিয়ে বললেন, 'কী দরকার পরের ছেলেকে আদর করতে গিয়ে দুর্নাম কুড়োনোর! কতবার তোমাকে বলেছি, একটা বাচ্চাকেও এ ঘরে ঢুকতে দেবে না। আদর যত্ন করে খাওয়াবেও, গালও শুনবে। হল তো?'"

"ছোটমা কোনও উত্তর দেননি। চুপ করে মড়ার মতো পড়েছিলেন। মাথায় ক্ষত নিয়েই সংসারের কাজকর্ম করেছিলেন। আমাদের খাওয়া-দাওয়ায় কোনও ত্রুটি হল না। যথাসময়ে ঘুমিয়েও পড়লাম।

"হঠাৎ মধ্যরাত্রে চাপা কান্নার শব্দ শুনে ঘুম ভেঙে গেল। তাড়াতাড়ি উঠে দেখি ছোটমা ঠাকুরঘরের সিংহাসনটার সামনে পড়ে আছেন। বিকৃত গলায় বলছেন, 'আমি তো এমন চাইনি মা! আমি সত্যিই সুকুকে খেতে চাইনি। তবে কেন? কেন আমার ভিতরের ডাইনিটার ক্ষিদে মেটে না? কেন আমার মরণ হয় না গো! সুকুর বদলে তুমি আমায় কেন নিলে না?'

"বলতে বলতে উনি মাটিতে মাথা ঠুকতে শুরু করলেন। আমি অবাক হয়ে দেখলাম, সমাজের সঙ্গে সঙ্গে তিনিও স্বয়ং নিজেকে ডাইনি ভাবছেন।"

তিনি একটু থেমে প্রদীপের দিকে তাকালেন, "ছোট মা'র দোষ ছিল না। আসলে বন্ধ্যাত্বের কলঙ্ক সব সময় মেয়েদের মাথাতেই পড়ে। হয়তো ছোটমার কোনও ত্রুটি ছিল না। হয়তো সমস্যা চেকারবাবুরই ছিল। কিন্তু সমাজ সে কথা শুনবে না। সন্তান ধারণ করতে গেলে যে শুধু নারী নয়, সক্ষম পুরুষেরও প্রয়োজন হয়— এ যুক্তি কোনও দিন সমাজের মাথায় ঢোকেনি। অথচ অদ্ভুত ব্যাপার দেখো, তোমাদের বিজ্ঞান বার বার বলে আসছে যে, সন্তানের লিঙ্গ মায়ের উপর নির্ভর করে না। এর দায় সম্পূর্ণভাবে বাবার! তোমরা টেস্টটি বুকে পড়ছ। পরীক্ষার জন্য মুখস্থ করছ। কিন্তু যথাসময়ে ভুলে মেরে দিচ্ছ।"

প্রদীপ অনেকক্ষণ ধরে এই প্রশ্নটা করার জন্য উশখুশ করছিল। এবার সুযোগ পেয়ে প্রশ্নটা করল, "আপনার জীবনে কখনও এমন সমস্যা হয়েছে?"

ভদ্রমহিলা একটু অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিলেন। মুখ তুলে বললেন, "উঁ? কীসের সমস্যা?"

"পুত্রসন্তান, কন্যাসন্তান জন্ম দেওয়ার?"

তাঁর চোখ জ্বলজ্বল করে উঠল। "তোমার কী মনে হয়? আমি রোজ এই কবরখানায় এসে খুকুর কাছে বসে থাকি কেন?"

প্রদীপ নিরুত্তর তাকিয়ে থাকে।

সতেরো

"বিক্রম, আমি কি বাচ্চা মেয়ে?"

"বাচ্চা মেয়েই তো! সবাই কী বলে জান না? বিক্রমবাবুর এক ছেলে আর এক মেয়ে!"

"ভেরি ফানি!"

"নট ফানি, মেনে নাও, আমি তোমার ন্যানি।"

"মোজো দেখলে কী বলবে?"

"মোজো আমার ছেলে। আমার কাছ থেকেই শিখবে যে, সুন্দরী বউকে কীভাবে প্যাম্পার করতে হয়।"

"বুড়ো বয়েসে আদিখ্যেতা!"

"বুড়ো কে? বয়েস তো কমে গেছে। এসো...এসো!"

আলো আজ সকাল সকাল দিদির বাড়ি এসে হাজির হয়েছে। শ্রীযুক্ত বংশী চমৎকার ধোঁকার ডালনা বানিয়েছেন। দিদি খুব ভাল খায়। তাই অফিস যাওয়ার পথে টিফিন কেরিয়ারে ধোঁকার ডালনা নিয়ে দিদির বাড়ি পৌঁছে দিতে এসেছে। আর ঘরে ঢুকতে না ঢুকতেই এই অদ্ভুতুড়ে সংলাপ কানে এল। তার সঙ্গের দৃশ্যটিও ভারি মজাদার। দিদি সারা ঘরময় নেচে বেড়াচ্ছে, আর পিছন পিছন ভাতের থালা হাতে বিক্রমদা! আলোকে দেখেই হইহই করে উঠলেন, "এসো ছোট গিন্নি। তোমার দিদি খেতে চাইছে না। আর তিন গোনার মধ্যে যদি ভাতের গ্রাস মুখে না যায়, তবে এই দলাটা তোমার জন্য অপেক্ষা করছে। কে খাবে? আমার শেরনি খাবে— হালুম!"

আলো খিল খিল করে হেসে ওঠে, "ব্যাপারটা কী? আজ বিক্রমদা ছুরি, কাঁচি ছেড়ে ভাতের থালা ধরেছেন!"

"কী করব?" বিক্রমদা ভাত মেখে নেঙ্কট দলাটা তৈরি করতে করতে বললেন, "আমাদের কুক মহোদয়া আজ সকালে ডুব মেরেছেন। অগত্যা তোমার দিদি বাঁধাকপির কাচুম্বর বানাতে গিয়ে নিজের আঙুলকে দ্বিখণ্ডিত করে ছেড়েছে! ডান হাতের বুড়ো আঙুলটা অনেকটা কেটে গেছে। তাই আপাতত আমিই এ বাড়ির কুক কাম ন্যানি।"

আলো টিফিন কেরিয়ারটা টেবিলের উপরে রাখল, "শ্রীযুক্ত বংশী ধোঁকার ডালনা রেঁধেছেন। দিদির জন্য দিয়ে গেলুম।"

"গেলুম বললেই তো যাওয়া হয় না।" তিনি ফের এক গ্রাস দিদির নাকের সামনে ধরেছেন, "কিচেনে দেখো ইলিশমাছের ঝোল আছে। একটু টেস্ট করে দেখো। যা বানিয়েছি না। তোমার দিদি খেয়ে সেকেন্ডবার আমার প্রেমে পড়ে যাচ্ছে।"

অদ্ভুত গভীর প্রেম এই দুজনের! বিক্রমদা দিদিকে এখনও বাচ্চা মেয়ে ভাবেন। দিদির উপরে কোনও পরিশ্রমের কাজ বা দায়িত্ব চাপিয়ে দিলেই হাঁ হাঁ করে ওঠেন, "আরে, ও পারবে না! ও পারবে না!"

আলো কিচেন থেকে একটুকরো ইলিশমাছ নিয়ে এসে সোফায় বসল। খেতে খেতে বলল, "দিদি তো তবে আজ ডিউটিতে যেতে পারবে না।"

বিক্রমদা মুখ ব্যাজার করে বললেন, "নাঃ। আজ পারবে না।"

সে দীর্ঘশ্বাস ফ্যালে। বিক্রমদার মতো জীবনসঙ্গী পাওয়াই জীবনে দুর্লভ। একখানা নমুনা যা দেখেছে, তাতে বিয়ের নামে এখন ভয় হয়। আলো চিন্তাক্লিষ্ট মুখে বলে, "ওদিকে অজয় আবার বেলে ছাড়া পেয়েছে।"

বিক্রমদার মুখে চিন্তার ছাপ, "সে কী! কবে ছাড়া পেল?"

"কয়েক দিন আগেই," সে বলে, "তারপর থেকেই মোবাইলে আননোন নাম্বার থেকে নোংরা নোংরা মেসেজ আসছে।"

তিনি উত্তেজিত, "তাহলে ফের পুলিশে জানাচ্ছ না কেন?"

"কী জানাব?" আলো কাঁটা বাছছে। "আগেরবার অজয় নিজের মোবাইল থেকেই মেসেজ পাঠিয়েছিল। এবার নানান নম্বর থেকে মেসেজ আসছে। ক"টা ফোনকে ট্রেস করব? তাছাড়া ওকে আমি খরচের খাতাতেই ফেলে রেখেছি। এমনিতেই অনেক চিন্তা আছে। নতুন করে আর মাথা ঘামাতে চাই না।"

"ছোটগিন্নি, যদি তেমন বোঝো তবে ঠিকানাটা কিছু দিনের জন্য পাল্টাও। আমাদের বাড়ি চলে এসো। এই এলাকার সিকিউরিটি যথেষ্ট কড়া। অজয় এখানে কিছু করার সাহস করবে না।"

"অজয়ের সাহস ছিল কবে?" আলো হেসে ওঠে। "বুকের পাটা নেই বলেই তো পিছন থেকে ঘেউ ঘেউ করছে।"

"ঘেউ ঘেউ অবধি ঠিক আছে।" বিক্রমদা চিন্তিত। "কিন্তু পিছন থেকে কামড়ে দিলেই সমস্যা। তুমি সমস্যাটাকে হাল্কা ভাবে নিচ্ছ না তো? আমার মনে হয় ব্যাপারটা আর একটু সিরিয়াসলি নাও। আমাদের বাড়িতে কয়েক দিনের জন্য চলে এসো। এমনিতে অফিসের কাজে গাড়ি ছাড়া বেরিও না। আর সকালে আমি নিজেই ড্রাইভ করে তোমাকে অফিসে ছেড়ে দিয়ে আসব। ফেরার পথে নিয়েও আসব।"

"বিক্রমদা! আপনি এবার দিদির সঙ্গে সঙ্গে আমাকেও কোলের মেয়ে করে রাখার তাল করছেন। আমি বাচ্চা মেয়ে নই।"

"বাচ্চা মেয়ে নও বলেই তো চিন্তা করছি। সিদ্ধান্ত তোমার। তবে তেমন কিছু বুঝলে জানাতে ভুলো না। জাস্ট গিভ মি আ রিং! আমি তোমাক পত্রপাঠ এ বাড়িতে নিয়ে আসব। তখন কিন্তু কোনও আপত্তি করতে পারবে না।"

"শিওর।"

অফিসে সেই আলো পুরনো কাগজপত্র নিয়ে পড়ল। একখানা লম্বা মইয়ে চড়ে সে উপরের তাক থেকে ধুলো ঝেড়ে ঝেড়ে কাগজের বাণ্ডিল নামাচ্ছে। মইটা মাঝেমধ্যেই নড়বড় করে উঠছে। আলোর ডাস্ট অ্যালার্জি আছে। নাকে মুখে ধুলো ঢুকে বেশ কয়েকবার জোরে জোরে হেঁচেও ফেলল। নাক দিয়ে জল পড়ছে। কিন্তু কিছুতেই ভ্রূক্ষেপ নেই। সে এখন নিজের রিসার্চেই মগ্ন। এত দিন ধরে বহু বিবর্ণ কাগজের পাতা ঘেঁটেঘুঁটেও খবরটা পায়নি আলো। তবু তার চেষ্টার শেষ নেই। স্নিগ্ধার শাশুড়ির অতীতটা জানা জরুরি। ভদ্রমহিলা যদি এর আগে কারওর উপর বিষ প্রয়োগ করে থাকেন, তবে স্নিগ্ধাও খুব নিরাপদে নেই। যদিও স্নিগ্ধা যথেষ্ট সাবধানে থাকে। তবু সাবধানের মার নেই।

আজ সকালে ঘুম থেকে উঠে বংশীর মুখ দেখেছিল সে। মানতেই হবে যে, বংশী ভীষণ পয়া। পুরনো কাগজের স্তূপ ঘাঁটতে ঘাঁটতেই ঈপ্সিত খবরটা পেয়ে গেল আলো। হলদে হয়ে যাওয়া কাগজের একপাশেই খবরটা রয়েছে। প্রায় চল্লিশ বছর আগের ভাষায় লেখা রিপোর্ট। হেডলাইনে বড় বড় করে লেখা: মঞ্চাভিনেত্রীর বিষ প্রয়োগে সহ অভিনেত্রীকে খুন করিবার ব্যর্থ প্রচেষ্টা। খুব মন দিয়ে রিপোর্টটা পড়ছিল আলো। পড়তে-পড়তেই তার চোখ বড় বড় হয়ে ওঠে। বিস্ময়াভিভূত হয়ে সে কী করবে বুঝে পায় না। বার বার লেখাটা পড়ছে সে। তার মনের মধ্যে তখন চলছে প্রচণ্ড আন্দোলন। উত্তেজনায় বুকের ভিতরটা গুড়গুড় করে ওঠে। কী সর্বনাশ! স্নিগ্ধা বা ঋতম এত কিছু জানে না। তার শ্বশুর নিশ্চয়ই জানেন, কিন্তু সময়ের সঙ্গে সঙ্গে সব ভুলে গেছেন! এত দিন পরে আবার পুরনো ইতিহাস ফিরে এসেছে। স্নিগ্ধাকে বলতেই হবে!

সে একটা শ্বাস টেনে নিয়ে স্নিগ্ধাকে ফোন করে। স্নিগ্ধা হয়তো মোবাইল ছেড়ে অন্য কোথাও গিয়েছিল। অনেকক্ষণ রিং হওয়ার পর ফোনটা তুলল, "বল আলো।"

"স্নিগ্ধা!" আলো উত্তেজিত হয়ে বলে, "আমি কিছু জানতে পেরেছি। আই ডোন্ট থিঙ্ক, ইউ আর গোয়িং টু বিলিভ দিস! আমার নিজেরই চক্ষু চড়কগাছ হয়ে গেছে।"

"কী এমন জানলি তুই?" স্নিগ্ধা কৌতূহলী, "এখন জানাতে পারবি না?"

"না, ফোনে নয়," আলো বলল, "আমি আজ বিকেলে তোর বাড়ি যাব। তখন সামনাসামনি সব কথা হবে। লক্ষ রাখিস, তখন যেন তোর শাশুড়ি, শ্বশুর বা ঋতম— কেউ ধারে কাছে না থাকে।"

স্নিগ্ধা একটু বিস্মিত হয়ে বলে, "নিশ্চয়ই। বাট...!"

"নো বাটস! আর একটা কথা বল। তোদের হলঘরের ফোনটার কি কোনও এক্সটেন্ডেড লাইন আছে?"

"এখন নেই। তবে আগে ছিল। আমার বিয়ের আগে বাবার পা ভেঙেছিল। তখন একটা এক্সটেন্ডেড লাইন দেওয়া হয়েছিল ওঁর ঘরে। বিয়ের পরও বেশ কয়েক মাস ওটাকে দেখেছি। এখন অবশ্য ফোনটা আর নেই।"

"পুরো লাইনটা খুলে দেওয়া হয়েছে? না হ্যান্ডসেটটা?"

"লাইনটা আছে। তবে হ্যান্ডসেট খুলে দেওয়া হয়েছে।"

"ফাইন।" আলো প্রায় লাফিয়ে উঠেছে। "শোন, নন্দিনী এর মধ্যে ফোন করলে ও যা যা বলে মাইনুটলি ফলো করিস। তোর শাশুড়ি ডেঞ্জারাস লোক। আমি তোর বাড়ি গিয়ে সব খুলে বলছি। তার আগে খুব সাবধানে থাকবি। গট ইট?"

স্নিগ্ধা চরম কৌতূহলকে কোনওমতে গিলে নিয়ে শান্তস্বরে বলে, "গট ইট।"

সকাল থেকেই আকাশ মুখ ভার করেছিল। বিকেল থেকেই জোরদার বৃষ্টি নামল। প্রথমে মোটা-মোটা ফোঁটা কিছুক্ষণ উদ্ভ্রান্ত গতিতে এদিক ওদিকে ছিটকে পড়ছিল। তারপর তির্যক ধারায় চতুর্দিক ঝাপসা করে ঝমঝমে বৃষ্টি! বর্ষণের প্রারম্ভে আলো অফিসে ছিল। তাই বিশেষ কিছু টের পায়নি। সমস্ত কাজ শেষ করে যখন সে অফিস থেকে বেরোল, ততক্ষণে রাস্তায় একহাঁটু জল জমে গেছে। বেশ কিছুক্ষণ অফিসের রিসেপশনে বসে বৃষ্টি থামার অপেক্ষা করল আলো। কিন্তু বৃষ্টি থামারই নাম নেয় না। ওদিকে রাতও হয়ে আসছে। তাকে স্নিগ্ধার বাড়ি হয়ে যেতে হবে। তাই আর বেশিক্ষণ বসে থাকতে পারল না। ছাতা মাথায় দিয়ে গুটিগুটি পায়ে বেরিয়েই পড়ল। রাস্তায় নেমে তার চক্ষু চড়কগাছ! রাস্তা কোথায়! এ তো সমুদ্র! চতুর্দিকে ঘোলা জলের স্রোত কলকল ছলছল করে ছুটে চলেছে। বাসস্ট্যান্ড ফাঁকা! রাস্তায় যান চলাচলও কমে গেছে। এক হাতে ছাতা ধরে, আর এক হাতে ব্যাগ নিয়ে প্রায় অষ্টাবক্রমুনির মতো হাঁটতে হাঁটতে চলল আলো। অবস্থা দেখে মনে হয়, নারায়ণের মত চতুর্ভুজ হলে ভাল হত। আলো কোনওমতে রাস্তা পার হয়ে বাসস্ট্যান্ড অবধি এল। বাসস্ট্যান্ডের মাথার ছাউনিটা আবার বেমালুম লোপাট হয়ে গেছে। বৃষ্টির দাপটে ছাতা পেন্ডুলামের মতো একবার এদিক একবার ওদিকে যাচ্ছে। এইটুকু আসতে আসতেই সে ভিজে আমসত্ত্ব! তাতে আপত্তি নেই। বরং আলো ভেবে দেখল ছাতাটা না থাকলেই বোধহয় বেশি ভাল হত। একটা হাত অন্তত মুক্তি পেত। প্রকৃতির যে-আশীর্বাদ অনাবিল ধারায় ঝরে পড়ছে তাকে গ্রহণ করতে চিরদিনই আগ্রহী। ছোটবেলা থেকেই সে বৃষ্টিতে ভিজতে ভালবাসে। শৈশব বড় সুন্দর। হিসেবমত যৌবনও সুন্দর হওয়া উচিত ছিল। খুব বেশি তো তার চাহিদা কোনও দিনই ছিল না। একটু আনন্দ, একটু বন্ধুত্ব, একটু নেচে কুঁদে বেড়ানোর মতো সময় স্বাধীনতা— আর একটু প্রেম। এর বেশি তো কিছুর প্রয়োজন হয় না। সবই তো ছিল এক সময়। অজয় যদি একটু মানুষ হত, তাহলে আজ আলোর কত আনন্দে থাকার কথা।

সে আস্তে আস্তে ছাতাটা বন্ধ করে দিল। এখন বৃষ্টির বড় বড় ফোঁটাগুলো তার মুখের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ছে। নরম চুলে গড়িয়ে পড়ে অনাবিল কৌতুকে খেলা করে চলেছে। সে তার ঘন কালো চুল খুলে দিল। শীতল স্ফটিককণার মতো সুখ ধুইয়ে দিচ্ছিল তার সব অবসাদ। সব গ্লানি ধুয়ে দিয়ে জলের ঢল নেমেছে দেহে! চুলে, কপালে, ঠোঁটে জলের অভ্রকণা! বৃষ্টির মধ্যেই আগের মতোই দুহাত বাড়িয়ে দিল সে। যেন কিছু চাইছে...

ফিরিয়ে দিতে পার আমায় সেই দিনগুলো! আর্থিক কষ্ট ছিল— তবু সুখ ছিল। লোকে যতই বলুক, আমি অপবিত্র— আমি জানি আজও আগের মতোই পবিত্র আছি। আমার আত্মা আজও পবিত্র আছে। স্নিগ্ধার নন্দিনী যতটা পবিত্র ঠিক ততটাই শুদ্ধ আমি। নারীদের জীবনে সমাজ তার দেহকে বেশি মূল্য দেয়। আমি দিই না। তাই যেমন সরলতায় দেহ নিজের প্রিয় মানুষকে নিবেদন করেছিলাম, তেমন শুদ্ধতায় তোমায় দিলাম। ফিরিয়ে দিতে পার আমার শৈশব? ধুয়ে নাও এই বিরক্তিকর যৌবন। এ যৌবন চাই না আমি! চাই না!

কতক্ষণ দুহাত মেলে ওভাবেই দাঁড়িয়েছিল সে ঠিক খেয়াল নেই। হঠাৎ বাসের হেডলাইট চোখে এসে পড়তেই সম্বিৎ ফিরল। নাঃ, এখন অনেক কাজ। বাড়ি যেতে হবে। তার আগে স্নিগ্ধাকে জানাতে হবে তার নন্দিনীর রহস্য। বাসটা অন্যান্য দিনের চেয়ে ফাঁকাই ছিল। লাফ মেরে উঠে পড়ল আলো। কপালগুণে বসার সিটও পেয়ে গেল। একদম জানলার ধারের সিট। সম্ভবত এই জানলাটা বন্ধ করা যায় না। বৃষ্টির জল সেই সুযোগে সিট ভিজিয়ে দিয়েছে। তাই এই সিটটা খালি। কেউ আলোর মতো শখ করে ভিজতে চায় না। তাই শাপে বর হল। সে দিব্যি মৌজ করে জানলার পাশের সিটটায় বসল। বৃষ্টির ফোঁটা এসে তাকে ভিজিয়ে দিচ্ছে।

আঠারো

পাখি নিজের ফ্ল্যাটের বারান্দায় দাঁড়িয়ে বৃষ্টি দেখছিল! বৃষ্টি হলে তার মন খারাপ হয়, না তার মন খারাপ হলেই বৃষ্টি নামে— কে জানে! নিজেকে সে অতিমানবী ভাবে না। কিন্তু সাধারণ নারীর তুলনায় নিজেকে একটু আলাদা ভাবত। তাই কোনও রকম অগ্রপশ্চাৎ না ভেবেই একটা বেকার-বাউন্ডুলে লোককে জীবনসঙ্গী করে নিতে অসুবিধা হয়নি। ভেবেছিল, প্রদীপ হয়তো আর পাঁচটা পুরুষমানুষের থেকে আলাদা! হয়তো দীপ তাকে বুঝবে। সে তো কথাশিল্পী। কথাশিল্পীরা সাধারণ মানুষের থেকে অনেক বেশি সহানুভূতিশীল হয়। অনেক বেশি অনুভূতিপ্রবণ হয়।

কিন্তু এখন বুঝতে পারছে, দীপ পরে কথাশিল্পী। আগে পুরুষ! সে অন্যের অনুভূতি বুঝে বেড়ায়। অনুভূতির মধ্যে উপন্যাসের মেটিরিয়াল খুঁজে বেড়ায়। অথচ নিজের স্ত্রীকে বোঝার চেষ্টা কখনওই তার ছিল না। চাকুরে স্ত্রীর সামনে তার ইগো ফণা তোলে! পাখি দীর্ঘশ্বাস ফেলে। এর নাম বিবাহ! পুরুষেরা কখনওই বোধহয় যোগ্য স্ত্রী চায় না। যে-নারী যোগ্যতায়, ব্যক্তিত্বে, আর্থিক স্বাধীনতায় তার প্রায় সমান, তাকে বীরপুরুষেরা পছন্দ করে না। মেয়ের কনসেপ্ট হল একটি ন্যাকা ন্যাকা, বোকা বোকা, বোবা-কালা দামি পুতুল। যাকে শোকেসে সাজিয়ে রাখা যায়। যখন ইচ্ছে করল, কোলে নিয়ে আহ্লাদ করল। যখন ইচ্ছে হল রমণ করল। তার নিজের কোনও ইচ্ছে থাকতে নেই। তার স্বাধীন সত্তা নেই।

সে বারান্দায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বোর হচ্ছিল। তার এই ঘ্যানঘ্যানে বৃষ্টি ভাল লাগছে না। আজ অফিস থেকে পাখি একটু তাড়াতাড়িই ফিরে এসেছে। দীপ এখনও বাড়ি ফেরেনি। হয়তো কবরখানায় গিয়ে বসে আছে। আগে হলে চিন্তিত হত। এখন আর চিন্তা করে না। মনে একটু যে উদ্বেগ জমে না, তা নয়। কিন্তু এখন দীপের সম্বন্ধে সমস্ত অনুভূতি মুছে ফেলতে চায় সে। দীপ জীবনের সারবত্তা বুঝেছে। সে নিজেকে যখন পাখির জীবনে একটা ব্লাডি জিগোলো মনে করে তখন তাই হোক। যে নিজের উপর আস্থা রাখতে পারে না, নিজের কাছের মানুষটার কাছেও নিজেকে শ্রদ্ধেয় মনে করে না— তার কথা ভেবে

লাভ কী!

সে অলসভাবে নিজের বিছানায় এসে শুয়ে পড়ে। মোবাইলটা হাতে নিয়ে নাড়াচাড়া করছে। আলোকে একটা ফোন করলে হত। এই বৃষ্টির মধ্যে বাড়ি ফিরতে পেরেছে কি না খোঁজটা নেওয়া দরকার। আজ বেরনোর সময়ে আলোর সঙ্গে দেখা হয়নি। সে আবার আজকাল বেশির ভাগ সময়টা লাইব্রেরিতেই কাটায়। কী ভূতে তাকে পেয়েছে কে জানে! পুরনো কাগজপত্র ঘেঁটে বেড়াচ্ছে। হঠাৎ করে রায়চৌধুরী পরিবার নিয়ে পড়েছে। হয়তো কোনও লিড পেয়েছে— কোনও স্কুপ...।

ভাবতে ভাবতে ফোনটা করেই ফেলল পাখি। আলোর কণ্ঠস্বর, "ইয়েস পাখি ম্যাডাম, বলুন।"

"কোথায় আছিস?" পাখির মনে হল, আলো এখনও বাড়ি পৌঁছয়নি। তার কণ্ঠস্বরের পিছনে জোরালো বৃষ্টির আওয়াজ আসছে। আলো খিক খিক করে হাসল, "বৃষ্টিতে ভিজছি।"

"বৃষ্টিতে ভিজছিস মানে? বাড়িতে পৌঁছসনি?"

"না রে, একটা দরকারে যাচ্ছি আমার এক বন্ধুর বাড়ি। বড় বটতলাটা চিনিস? আগেরবার তোকে যে-বাসস্টপে ফুচকা খাইয়েছিলাম, সেখানেই দাঁড়িয়ে আছি।"

"একা?"

"আমার তো আর তোমার মতন বাঁধানো কপাল নয় সোনা। তোদের ওদিকে আমাদের অফিসের অনেকেই থাকে বলে লিফট পাওয়া সহজ। এদিকে তো কেউ থাকে না। তবে একলা গান গাওয়ার আনন্দটাও তুই পেলি না!"

"আলো!" পাখি ধমকের সুরে বলে, "তুই কি রাস্তায় দাঁড়িয়ে একগাদা লোকের মধ্যে চিৎকার করে গান গাইছিস?"

"বাসস্টপে কেউ নেই বস। পু-রো ফাঁ-কা!" সে বলল, "আমার গান কয়েকটা কুত্তা ছাড়া আর কেউ শুনছে না।"

"চুপ করে শুনছে। আশ্চর্য— তুই গাইছিস, অথচ ব্যাকগ্রাউন্ডে কুকুর ঘেউ ঘেউ করছে না।"

"ঘেউ ঘেউ না করলেও কুঁই কুঁই করছে। গায়ে জল পড়েছে কি না। শুনবি?"

কুকুরের কুঁইকুঁই শোনার আগেই আচমকা অন্য একটা গলার স্বর শুনতে পেল পাখি। একটা কর্কশ স্বর পিছন থেকে বলল, "পেয়েছি শালিকে।"

পাখি কিছু বোঝার আগেই শুনতে পেল আলোর বিস্মিত কণ্ঠস্বর। "অজয়! তুমি?"

পুরুষ কণ্ঠস্বরটা বলল, "কী ভেবেছিলি? তুই শালি আমায় লাথ মারবি, জেলে পাঠাবি, আর আমি চুপ করে বসে থাকব? চুড়ি পরে বসে আছি— খানকি...!"

আলো ধমকে উঠল, "মাইন্ড ইওর ল্যাঙ্গোয়েজ অজয়!"

"চোখ কাকে দেখাচ্ছিস রে শালি? তেজ দেখাচ্ছিস? তোর সব তেজ আজ বের করে ছাড়ব... কুত্তি...!" বলতে বলতেই চেঁচিয়ে উঠল গলাটা, "এই, ধর তো মাগিকে। আজ দেখি, তেজ কত!"

পাখির রক্ত হিম হয়ে আসে। সে নিজের অজান্তেই চেঁচিয়ে ওঠে, "আ-লো!...আ-লো...পা-লা!"

সে কথা আলোর কানে গেল কিনা কে জানে! একটা ধস্তাধস্তির শব্দ! পরক্ষণেই ফোনের ভিতরে আলোর পরিত্রাহি চিৎকার!

ফোনটা কেটে গেল!

পাখির ভিতরটা কাঁপছিল। সে কী করবে বুঝতে পারছে না। ফাঁকা বাসস্টপ! বৃষ্টির জন্য হয়তো লোকজনও ধারেকাছে নেই। এর মধ্যে আলোর সঙ্গে অজয়ের সাক্ষাৎ যে খুব সুখকর হবে না তা বুঝতে তার বাকি ছিল না। এবং যতটুকু সংলাপ ফোনে শুনেছে তাতে স্পষ্ট— অজয় একা আসেনি। সঙ্গে আরও কেউ আছে। সে দাঁতে দাঁত পেষে। আলোর মোবাইলে রিংব্যাক করে। কিন্তু ফোন শুধু বেজেই যাচ্ছে। কেউ তুলছে না!

পাগলের মতো সে সিঁড়ি দিয়ে ছুটে গেল নীচের দিকে। উত্তেজনায় লিফটের কথা ভুলেই গেছে। কোনওমতে হাঁফাত হাঁফাতে ছুটে গেল অনির্বাণের ফ্ল্যাটে। উন্মত্তের মতো দরজায় জোরে জোরে নক করছে।

অনির্বাণ তখন সবে ফিরেছে। চেঞ্জ করে ফ্রেশও হতে পারেনি। তার মধ্যেই দরজায় প্রবল করাঘাত শুনে অবাক হয়ে বেরিয়ে এল।

"কী ব্যাপার? পাখিদি!" সে পাখির অবস্থা দেখে স্তম্ভিত। "কী হয়েছে? অ্যাঁ?"

"অনির্বাণ..." পাখি হাঁফাচ্ছে, "বিপদ...ভীষণ বিপদ। তুই এক্ষুনি আমার সঙ্গে চল। যেতেই হবে।"

"এই বৃষ্টির মধ্যে কোথায় যাবে! কী হয়েছে বলো তো? দীপদার কিছু হয়েছে?"

"যেতেই হবে... যেতেই হবে।" পাখি বলতে বলতেই প্রবল কান্নায় ভেঙে পড়ল, "মেয়েটাকে ওরা মেরে ফেলবে... মেরে ফেলবে অনি... সময় নেই...একদম সময় নেই..."

"কে কাকে মেরে ফেলবে?" অনির্বাণের মাথায় কিছু ঢোকে না। "কী বলছ?"

পাখি তার দু"পা জড়িয়ে ধরতে যায়, "তোর পায়ে পড়ছি। তুই এক্ষুনি তোর গাড়িটা বের কর... সময় নেই...সময় নেই...!"

"এ কী! কী করছ!" অনির্বাণ তাকে দুহাতে চেপে ধরে। "ছি ছি...পায়ে পড়ছ কেন? তুমি দু মিনিট বোসো...একটু শান্ত হও!"

সে উন্মাদিনীর মতো চেঁচিয়ে ওঠে, "ড্যাম ইট! বলছি না তোকে... সময় নেই। এক্ষুনি...এক্ষুনি পৌঁছতে হবে।"

"কোথায়?"

"ঠিকানা বলছি। তুই গাড়ি বের কর... হারি আপ...!"

পাখির উত্তেজনা এবার অনির্বাণকেও স্পর্শ করে। সে প্রায় দৌড়ে গাড়ির চাবি নিয়ে নীচের দিকে ছুটে যায়। পাখিও তার পিছন পিছন দৌড়ল। সে বার বার আলোর ফোনে ট্রাই করে যাচ্ছে। কিন্তু ফল যথারীতি একই। ফোন বেজে বেজে কেটে যাচ্ছে। কেউ তুলছে না।

সে ফোন কেটে দিয়ে আলোদের লোকাল পুলিশ স্টেশনে ফোন করে। সেখানেও একই পরিস্থিতি। কেউ ফোন তুলছে না। এই বর্ষার মধ্যে সকলেই বোধহয় তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরে গেছে। অথবা বৃষ্টি মাথায় নিয়ে বেরনোর আশঙ্কায় ফোনটা ধরছেই না!

"পাখিদি..." অনির্বাণ গাড়িতে স্টার্ট দিয়ে বলে, "এই বৃষ্টির মধ্যে কিন্তু রাস্তায় জ্যাম হবে।"

"বাইপাস ধর!" পাখি কোনওমতে উচ্চারণ করল, "দরকার পড়লে সব ট্র্যাফিক সিগন্যাল ভাঙবি। কাম অন... হারি আপ... হারি আপ...!"

সে পাগলের মতো তখনও একবার আলোর ফোনে আর একবার পুলিশ স্টেশনের নম্বরে ফোন করে যাচ্ছে। মনে মনে বলে যাচ্ছে, "আমি আসছি আলো... কিচ্ছু হবে না তোর... বি ব্রেভ... আমি আসছি... আমি আসছি...!"

বেশ কিছুক্ষণ দুটো নম্বরে চেষ্টা করে অবশেষে হাল ছেড়ে দিল পাখি। তৃতীয় একটা নম্বর ডায়াল করল। কিছুক্ষণ রিং হওয়ার একঘেয়ে শব্দ। কয়েক সেকেন্ড পরেই ওপ্রান্ত থেকে কেউ ফোন তুলল।

সে কাঁপা কাঁপা গলায় বলে, "হ্যালো...? লালবাজার?"

অজয় একটা বড় ছুরি আলোর গলায় ধরল— "এবার? খুব তেল হয়েছিল না তোর? আজ যদি তেল না বের করেছি...!"

অজয় একা আসেনি। তার সঙ্গে আরও চারজন ছিল। এদের দেখলে গুন্ডা বলেই মনে হয়। পাঁচজন মিলে তাকে টেনে এনেছে বড় বটতলা ছাড়িয়ে একটু দূরে শুনশান প্রান্তরে। সামনে বুনো ঝোপের আড়াল। তার পিছনে কয়েকজন নারীখাদকের সঙ্গে অসম যুদ্ধ করছিল আলো। তারা টেনে টেনে ছিঁড়ে ফেলেছে তার সমস্ত আবরণ। তবু হাল ছাড়ছিল না আলো। বুনোবিড়ালের মতো আঁচড়ে কামড়ে একসা করছিল।

"গুরু, তোমার মাল যখন ফার্স্ট চান্স তোমারই।" একজন দাঁত বের করে বলল, "তারপর আমরা।"

"বড্ড লাফালাফি করছে!" অজয় ছুরিটা জোরে চেপে ধরল, "ব্লাডি বিচ...!"

আলো ধস্তাধস্তি করে নিজের ডান হাতটা কোনওমতে ছাড়াতে পেরেছিল। সমস্ত শক্তি এক করে সে খামচে ধরল অজয়ের মুখ! ধারালো নখে প্রাণপণে আঁচড়ে দিল জানোয়ারটাকে। অজয় যন্ত্রণায় চিৎকার করে উঠে তার তলপেটে ছুরির কোপ বসিয়ে দিল। একটা... পরক্ষণেই আর একটা। প্রচণ্ড যন্ত্রণায় ককিয়ে উঠল আলো। চেঁচানোর উপায় নেই। একজন শক্ত হাতে চেপে ধরেছে তার মুখ।

"আমার নামে পুলিশে রিপোর্ট করবি! তোর এত সাহস! এত সাহস তোর যে, আমাকে ডিচ করবি! আমায় রিফিউজ করবি! এত ক্ষমতা তোর! শা—লি!" অজয় প্যান্টের বেল্ট খুলতে খুলতে বলে, "আজ দেখাচ্ছি তোকে! আজ আমার ক্ষমতা দ্যাখ! কে তোকে বাঁচাতে আসে দেখব। এই... হাত শক্ত করে ধর। আর পা দুটে ফাঁক করে ধর হারামজাদির।"

এর পর আর কথা নেই। বন্য জন্তুরা কথা বলে না। তাদের পৈশাচিক উল্লাস সহজে থামে না! একের পর এক মাংসখণ্ডের উপরে লাফিয়ে পড়তে থাকে তারা। আলোর কিছু করার ছিল না। একজন...দুজন...তিনজন...! বিষব্যথায় তার শরীর অবশ হয়ে আসে। মনে হল, সে হয়তো মরে যাচ্ছে। তলপেটে প্রচণ্ড ব্যথা! যন্ত্রণায় সারা শরীর কুঁকড়ে যাচ্ছে। আলো কি মরে যাবে! এই তো, একটু আগেই বৃষ্টিতে ভিজেছিল। আর এখন রক্তে ভেসে যাচ্ছে। উরুর কাছে কতগুলো অমানুষের চটচটে ক্লেদ। সে আস্তে আস্তে চেতনার শেষ সূত্রটুকুও হারিয়ে ফেলে। তার রক্তাক্ত, অচেতন শরীরের উপর অত্যাচার চালাতে থাকে কতগুলো জন্তু। একবার...দুবার...তিনবার...!

কতক্ষণ অজ্ঞান হয়েছিল আলো নিজেই জানে না! যন্ত্রণাকাতর গোঙানিও থেমে গিয়েছিল একসময়। প্রতিরোধশক্তিও জবাব দিয়েছিল। কতক্ষণ লড়বে মেয়েটা! দেহে যতখানি শক্তি ছিল, যতখানি লড়ার ছিল— লড়েছে। পাঁচটা জন্তু তাকে খুবলে খুবলে খেয়েছে! এতক্ষণে মরে যাওয়ার কথা। তবু ঈশ্বরের কী ইচ্ছে ছিল কে জানে! কিছুক্ষণ পরে আলো ফের চোখ মেলল। সে চোখে দৃষ্টি ছিল না। শূন্য দৃষ্টিতে শেষবারের মতো বাঁচার ইচ্ছে ছিল। মরণাপন্ন পাখি যেমন শেষবারের মতো ডানা ঝটপটায়! প্রদীপ নিভে যাওয়ার আগে যেমন শেষবারের মতো দপ করে জ্বলে ওঠে!

তখন তার নগ্ন দেহের উপরে ভারী পিস্টনের মতো অজয় জান্তব রোষে ওঠানামা করছে। এখন আর যন্ত্রণাবোধ নেই। গোটা দেহ অবশ! শুধু একটা তীক্ষ্ণ বোধ যন্ত্রণার মতো মাথায় ফুটছে।

"শুরু তাড়াতাড়ি করো। খালাস করতে হবে না?"

"হয়ে গেছে।" অজয় এবার আলোকে ছেড়ে উঠে দাঁড়ায়। ফ্যাঁসফ্যাঁস করে বলল, "খালাস তো করতেই হবে। নয়তো পুলিশের কাছে ছুটবে না হারামজাদি! পুলিশে যাওয়াচ্ছি!"

আলো তখন শূন্য দৃষ্টিতে আকাশের দিকে তাকিয়েছিল। তবে মন শূন্য ছিল না। অজয়ের অবারিত পুরুষাঙ্গটা তার সামনে। সে ভাবছিল, লোকটার ক্ষমতা আজ দেখা হয়ে গেছে। জানোয়ারটার সব ক্ষমতা, সব জোরের উৎস দু পায়ের ফাঁকে থাকা ওই অঙ্গটা! ওই অঙ্গের জোরেই ওর এত অহঙ্কার! কিন্তু একটা মেয়েকে জব্দ করার জন্য যে রাস্তা সে নিয়েছে, তা নপুংসকেরা নেয়। ওই অঙ্গটা তো নপুংসকের থাকার কথা নয়! নাঃ!

সে আড়চোখে দেখল অজয় নিজের অজান্তেই ছুরিটা তার পাশে রেখে দিয়েছে। হয়তো ভেবেছিল, মেয়েটা মরে গেছে। অথবা মরার পথে। তাই বিশেষ গুরুত্ব দেয়নি।

আলো ছুরিটার দিকে লোলুপ দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে। ওটা কি হাত বাড়িয়ে নিতে পারবে? বুকের পাঁজরে যম-যন্ত্রণা! কাঁধ অসাড়। তবে সে দাঁতে দাঁত পিষল। এত সহজে হার মানব কেন? আমি নারী। পুরুষের চেয়ে আমার জীবনীশক্তি, সহ্যশক্তি অনেক বেশি! স্লিগ্ধাই তার জ্বলন্ত উদাহরণ! আমি নিজেও অনেক রিপোর্ট কভার করতে গিয়ে আক্রান্ত হয়েছি। পুলিশের লাঠি সহ্য করেছি। কিন্তু হার মানিনি। তবে আজ হার মানব কেন?

"গলার নলিটা কেটে দিলেই মাল খালাস।" অজয়ের সঙ্গোপাঙ্গদের মধ্যে একজন বলে, "কাজটা তুমি করবে গুরু? না আমরা করব?"

"আমিই করব।" সে যেখানে ছুরিটা রেখেছিল সেদিকে তাকাল। কিন্তু ছুরিটা সেখানে নেই! আর কিছু বোঝার আগেই প্রচণ্ড যন্ত্রণায় বুনো শুয়োরের মতো চিৎকার করে উঠল অজয়। মরণাপন্ন শূলবিদ্ধ শুয়োর যেভাবে চিৎকার করে তেমন ভাবেই চেঁচাচ্ছে সে! তার সঙ্গীরা অবাক হয়ে দেখল, তার দুপায়ের ফাঁকে সরাসরি গেঁথে গেছে লম্বা ছুরিটা! ছুরিটার শুধু বাঁট দেখা যাচ্ছে। বাদবাকিটা এফোঁড় ওফোঁড় করে দিয়েছে তার পুরুষাঙ্গ। আলো কখন যেন সুযোগ পেয়ে নিজের দেহের সবটুকু শক্তি নিংড়ে বিদ্যুৎবেগে অস্ত্রটা বসিয়ে দিয়েছে যথাস্থানে!

আলোর দেহের শক্তি নিঃশেষ হয়ে গিয়েছিল। সে অবশ হয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়ল। চোখের সামনে আবার অন্ধকার। সমস্ত দৃশ্যের উপরে কে যেন কালির দোয়াত ঢেলে দিয়েছে। অচেতন হয়ে যাওয়ার আগে সে টের পেল তার গলায় একজোড়া হাত চেপে বসেছে! প্রচণ্ড শক্তিতে গলার নলি মুচড়ে ধরেছে।

মেয়েটা একটু আগেও বৃষ্টিতে ভিজেছিল!

পাখি যখন অকুস্থলে পৌঁছল, তখন আবার মুষলধারে বৃষ্টি নেমেছে। মাঝখানে কিছুক্ষণের জন্য থেমেছিল। আকাশ যেন কিছুক্ষণের জন্য গুম মেরে ছিল। পাখির বুক গুড়গুড় করে ওঠে— বেশি দেরি হয়ে যায়নি তো! সে পাগলের মতো বার বার আলোর ফোনে ট্রাই করেছে। কিন্তু এখন আর ফোনে রিং হচ্ছে না। বরং অপারেটার বার বার জানাচ্ছে— ফোন সুইচড অফ। অবশেষে নির্দিষ্ট বাসস্টপে পৌঁছে তার ধৈর্য আর বাঁধ মানল না। তাদের গাড়ি আসার আগেই পুলিশের গাড়ি চলে এসেছে। পাখি সভয়ে দেখল বাসস্টপের অনতিদূরে একটা ফাঁকা মাঠে দাঁড়িয়ে রয়েছে পুলিশের জিপ।

সে লাফ মেরে গাড়ি থেকে নেমে উন্মাদিনীর মতো দৌড়তে

দৌড়তে সেদিকেই যায়। সবিস্ময়ে দেখল ছিন্ন লতার মতো আলোর দেহটা পড়ে রয়েছে মাঠের উপর। তার গায়ে একটা চাদর চাপা দেওয়া। সম্ভবত পুলিশই ঢেকে দিয়েছে তার ক্ষতবিক্ষত শরীর। পাখি আকুল ভাবে জড়িয়ে ধরল আলোর দেহটাকে। কান্নাব্যাকুল কণ্ঠে বলল, "আলো... আলো...আমি এসেছি... চোখ মেলে দ্যাখ... আমি এসেছি... একবারটি তাকা আমার দিকে... কিচ্ছু হবে না তোর... কিচ্ছু হবে না... আমি আছি তো...!"

দু'জন মহিলা পুলিশকর্মী তাকে টেনে সরিয়ে দিল। পাখি প্রবলভাবে বাধা দেওয়া সত্ত্বেও তাকে একরকম টেনে হিঁচড়ে সরিয়ে নেওয়া হল আলোর কাছ থেকে। পাখি মহিলা দু'জনের কবল থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য প্রাণপণে লড়ছিল। কিন্তু শত চেষ্টাতেও নিজেকে মুক্ত করতে পারল না!

"ম্যাডাম, অত ব্যস্ত হবেন না," দায়িত্বপ্রাপ্ত পুলিশকর্মী নিস্পৃহ মুখে বলে, "আমরা অ্যাম্বুল্যান্সে ফোন করেছি। ভিকটিম এখনও বেঁচে আছে। এক্ষুনি অ্যাম্বুল্যান্স এসে পড়বে। তার আগে বডি ছোঁবেন না।"

"বডি!" পাখি চেঁচিয়ে ওঠে, "বডি বলছেন কাকে? ও আলো। ও আমার বন্ধু!"

পুলিশকর্মীটি তার মুখের দিকে একবার তাকিয়ে নিয়ে বলল, "আপনিই পুলিশে ফোন করেছিলেন না?"

"হ্যাঁ।"

"দেখুন তো।" লোকটা জিপের দিকে নির্দেশ করে, "ওই লোকটাকে চিনতে পারেন কি না।"

পাখি সবিস্ময়ে দেখল জিপের ভিতরে শায়িত আছে আর একটা রক্তাক্ত দেহ! সে দেহটাকে খুব ভালভাবেই চেনে। আলোর সঙ্গে অনেকবার দেখেছে। অজয়!

"ব্লাডি বাস্টার্ড!" আসুরিক ক্ষোভে, অন্ধ রাগে সে নির্জীব দেহটার উপরে লাফিয়ে পড়ে লাথি ঘুসি মারতে থাকে, "মেরে ফেলব... খুন করে ফেলব... শুয়োরের বাচ্চা!"

"ম্যাডাম...ম্যাডাম...!" আবার তাকে চেপে ধরেছে মহিলা পুলিশের দল। থুঃ করে একদলা থুতু ছিটিয়ে দিল পাখি অজয়ের মুখে। ভীষণ ঘৃণায় চিৎকার করে বলতে থাকে, "ওকে শুইয়ে রেখেছেন কেন? এক্ষুনি পিটিয়ে পিটিয়ে মারুন। গ্রেফতার করুন। জিজ্ঞাসা করুন— আর ক'টা হায়না সঙ্গে এনেছিল। ওকে ফাঁসি দিন!"

"শান্ত হোন ম্যাডাম।" পুলিশ অফিসারটি বলে, "আমরা এখনও শিওর নই— এটা রেপ কেস কি না!"

"মানে!" বজ্রাহতের মতো বলল পাখি। সে নিজের কানকেই বিশ্বাস করতে পারছে না!

"আপনিই বলেছিলেন ছেলেটি মেয়েটির বয়ফ্রেন্ড। এটা কনজুগাল সেক্সও হতে পারে।"

"কনজুগাল সেক্স!" পাখি ভেবে পায় না কী বলবে। তার পুলিশকর্মীটিকেই খুন করার ইচ্ছে হচ্ছিল। সে হিসহিস করে বলে, "কনজুগাল সেক্সে মেয়েরা অজ্ঞান হয়ে যায়! এত ব্লিড করে! আমি নিজে ফোনে শুনেছি ওর চিৎকার!"

"সেটা এনজয়মেন্টের চিৎকারও হতে পারে। আপনি হয়তো ভুল ইন্টারপ্রেট করেছেন।"

পাখি স্তম্ভিত! লোকটা কি মানুষ! ওকে কী বলা উচিত!

পুলিশ অফিসারটি সর্বজ্ঞের মতো বলল, "যতক্ষণ না ফরেনসিক বলছে, ততক্ষণ শিওর হওয়া যাচ্ছে না যে, এটা রেপ কেস! ছেলেটির পুরুষাঙ্গে একটা ছুরি আগা মাথা বিঁধে আছে। হয়তো মেয়েটি তৃপ্ত হয়নি। তাই রেগে গিয়ে ছুরিটা বসিয়ে দিয়েছে! ছেলেটিও তখন মেয়েটিকে মেরেছে!"

পাখির মুখে কোনও উত্তর জোগায় না! এর নাম ইনভেস্টিগেশন!

লোকটা বলতেই থাকে, "তাছাড়া যদি রেপ কেসও হয় তবে অনেক প্রশ্ন ওঠে। মেয়েটি এত রাতে একলা বাসস্ট্যান্ডে দাঁড়িয়ে কী করছিল। তার বয়ফ্রেন্ডই বা এল কোথা থেকে? আপনারা কী ভাবেন ম্যাডাম? বৃষ্টিতে আপাদমস্তক ভিজে দেহের সমস্ত জিওগ্রাফি স্পষ্ট করে, রবিনা টন্ডন হয়ে প্রেমিককে লোভ দেখাবেন, আর সে ছেড়ে দেবে? সিডিউসও করবেন, আবার রেপড হলে চেঁচাবেনও!"

পাখির মধ্যে একটা অদ্ভুত বিবমিষা কাজ করছিল। সে বমি চেপে হিসহিস করে বলে, "তাহলে কী করব বলুন?"

"মানে?"

"কী করব?" তার মাথায় যেন রক্ত চড়ে গেছে। উন্মত্তের মতো চেঁচিয়ে বলল, "বাড়ি ছেড়ে বেরতে পারব না— বাড়ির বাইরের লোক রেপ করবে! বাড়িতে থাকতে পারব না, বাবা-কাকা-জ্যাঠা-কাজিন রেপ করবে!"

"ম্যাডাম!"

"রাতে বেরব না— নিশাচর রেপ করবে, দিনের বেলা বেরব না— রকের ছেলে ইভটিজিং করবে। বাসে উঠব না— বাসের প্যাসেঞ্জার শ্লীলতাহানি করবে, ট্যাক্সিতে উঠব না— ট্যাক্সি ড্রাইভার রেপ করবে, প্রাইভেট গাড়িতে চড়ব না— প্রাইভেট গাড়ির ড্রাইভার রেপ করবে, সবার আগে বাড়িতে ফিরব না, একা পেয়ে প্রতিবেশী, দারোয়ান, লিফ্‌টম্যান— যে কেউ রেপ করতে পারে, দেরি করে বাড়ি ফিরলে পাবলিক রেপ করবে, শাড়ি পরলে পিঠ, পেট দেখা যায়, পুরুষ উত্তেজিত হবে, মিনিস্কার্ট পরলে আরও বেশি উত্তেজিত হবে, বালিকা না হওয়াই ভাল— কচি মাংসে লোভ বেশি, বয়স্ক হলেও সমস্যা— অনেকেই বয়স্কা মহিলার প্রতি অ্যাট্রাকটেড হয়, বিয়ে করলে বর রেপ করবে, বিয়ে না করলে যে কেউ রেপ করবে, পড়াশোনা করব না— টিচার রেপ করতে পারে, অফিসে যাব না— বস রেপ করবে... কী পেয়েছেন আপনারা?"

উন্মত্ত পাখি চিৎকার করে বলল, "রেপ করার সমস্ত অধিকার আপনাদের আছে? অ্যাঁ? যখন খুশি আপনারা উত্তেজিত হতে পারেন! কী বলে আপনাদের আইন? কোথায় আমাদের এক্সিস্ট্যান্স? না আইন বলে— ডোন্ট এক্সিস্ট? তবে কন্যাভ্রূণহত্যা লিগ্যাল করে দেয় না কেন আপনাদের আইন? মেয়েরা না থাকলে রেপ কেসও থাকবে না! রাইট?"

"ম্যাডাম! আবেগকে সংযত করুন। আপনি পুলিশ অফিসারের সঙ্গে কথা বলছেন!"

অনির্বাণও বলে, "পাখিদি, একটু দাঁড়াও... পুলিশ অফিসারের সামনে..."

"ড্যাম ইওর পুলিশ অফিসার!" লাল লাল অপ্রকৃতিস্থ চোখে আগুন জ্বেলে তাকাল পাখি, "আপনিও আফটার অল পুরুষ। তাই এত সহজে বললেন, কনজুগাল সেক্স! এত সহজে বলতে পারলেন, মেয়েটি সিডিউস করেছে। সিডিউস করেছে—তাই না?" বলতে বলতেই সে পাগলের মতো ছিঁড়ে ফেলল ওড়না। ছিঁড়ে ফেলল তার সালোয়ারের সামনের অংশ। এখন তার ব্রা বেরিয়ে পড়েছে। ব্রায়ের পিছনে উত্তাল নগ্ন বুক। সেই নগ্ন বুকে আঘাত করতে করতে পুলিশ অফিসারের দিকে এগিয়ে গেল সে। পাগলের মতো, কান্তজ্ঞানহীনের মতো চিৎকার করে উঠল, "কাম অন ...রেপ মি... রেপ মি-ই-ই-ই!"

মহিলা পুলিশ দুজন সভয়ে দেখল এক উন্মাদিনী আলুলায়িত চুলে নিজের বুক নগ্ন করে এগিয়ে যাচ্ছে পুলিশ অফিসারটির দিকে। তার চোখে ধক ধক করে আগুন জ্বলছে! নিজের বুক দুহাতে পিটতে পিটতে সে বলছে—"রেপ মি...রেপ মি!"

পুলিশ অফিসারটির মাথা নিচু হয়ে গেছে! সে ভয় পাচ্ছে! ওই পাগলিনীকে সে এখন ভয় পাচ্ছে!

উনিশ

"বিয়ের আগে চেকারবাবুর কাছে আমি খুব আনন্দে নিজের কুমারী জীবনটুকু কাটিয়েছি। বিবাহিত জীবন কিন্তু এত আনন্দের হল না।"

বৃষ্টির মধ্যেও ভদ্রমহিলা এসেছেন কবরখানায়। প্রদীপ ভেবেছিল, আজ হয়তো তিনি আসবেন না। তবু অপেক্ষায় ছিল। ভেবেছিল, নির্দিষ্ট সময়ের থেকে একঘণ্টা বেশি অপেক্ষা করবে। কিন্তু অতক্ষণ

অপেক্ষা করতে হল না। ভদ্রমহিলা ভীষণ পাংচুয়াল। এই মারকাটারি বৃষ্টির মধ্যেও, সন্ধে নামার পরেও, যথাসময়েই এসে হাজির হয়েছেন। আজ সঙ্গে জুঁইফুল নিয়ে এসেছেন। মেয়ের কবরের উপর সুন্দর করে জুঁইফুল সাজিয়ে দিলেন।

কবরখানার পাশেই একটা চালাঘর ছিল। তার ছাউনিতে বসে কথাবার্তা চলছিল দুজনের।

"বিয়ের আগে আমি স্বাধীন ছিলাম। বিয়ের পর পায়ে বেড়ি পড়ল। বুঝলাম, সংসারে টিকে থাকতে হলে সবার মন জুগিয়ে চলতে হবে। চেষ্টাও করেছিলাম জান? কিন্তু বছরখানেকের মধ্যেই বুঝলাম— পরের মেয়ে যতই খেটে মরুক, যতই সবাইকে সন্তুষ্ট করার চেষ্টা করুক— কেউ সন্তুষ্ট হয় না! শ্বশুর যদি রান্নার প্রশংসা করেন, তবে শাশুড়ির রাগ হয়। ভাবেন তাঁর এক্তিয়ারে হস্তক্ষেপ করছি আমি। শাশুড়িকে সন্তুষ্ট করার জন্য যদি তাঁর সেবাতেই মন প্রাণ ঢেলে দিই, তবে স্বামীর মুখ ভার হয়। ভাবেন, তাঁকে অবহেলা করছি। স্বামীকে সময় দিতে গিয়ে দেখি গোটা সংসার চটে যায়। নারীর বলিদানকে কেউ মর্যাদা দেয় না। সবাই ভাবে, এটাই তো ওর কর্তব্য! তোমরা প্রায়ই একটা কথা বলো না? টেকেন ফর গ্রান্টেড। সংসারে মেয়েরা চিরকালই 'টেকেন ফর গ্রান্টেড'। তাদের আলাদা কোনও অস্তিত্ব নেই। চিরকালই তারা একা! সংসারে তাকে সবার প্রয়োজন আছে, কিন্তু তার প্রয়োজনে কেউ নেই।

"এই সত্যি ঘটনাটা আমার মাথায় ঢুকতে এক বছর লেগেছিল। এই এক বছর আমি বড় কুণ্ঠিত হয়ে ছিলাম। কী করব আর কী করব না— বুঝেই উঠতে পারিনি। কিছু করলেও মুশকিল, না করলেও মুশকিল। কাজ না করলে বলা হয় 'পটের বিবি'। আর কাজ করলে শুনতে হয়, আমি ঠিকমতো কাজ করতে শিখিনি। কী করে শিখব? ছোটমা কখনও আমাকে ঘরের কাজ করতে দেননি। আমি শুধু মন দিয়ে পড়াশোনা করেছি। বারো ক্লাস অবধি পড়েছি। তারপরই চেকারবাবু আমাকে বিয়ে দিয়ে দিলেন। মনে-মনে ভীষণ অভিমান হত চেকারবাবু উপরে। যখন এত আহ্লাদে মানুষ করারই ছিল, পড়াশোনা করানোরই ছিল— তবে এত অল্প বয়েসেই বিয়ে দিয়ে দিলেন কেন আমাকে? মেয়েদের পড়াশুনোর কি তবে কোনও মূল্যই নেই!

"অভিমান শুধু মনেই জমে থাকে। জীবনের অভিজ্ঞতা দিয়ে শিখেছি, মেয়েদের অভিমান প্রকাশ করতে নেই। জগৎ তাতে হাসে। ভাবে, মস্ত তো মেয়েমানুষ! তার আবার অভিমান! তাই কাউকে কখনও আমি কিছু বলিনি। এক বছর পরে ছবিটা অবশ্য পাল্টাল। যখন প্রথম জানতে পারলাম, আমি মা হতে চলেছি! তার আগে এ বিষয়ে ভয় ছিল। শ্বশুর-শাশুড়ির নাতির জন্য বড্ড তাড়া ছিল। তাঁদের তাড়া দেখে ভয় হত। ভাবতাম, যদি আমারও কপালে ছোটমার মতো বাঁজা সার্টিফিকেট জোটে! কিন্তু ভাগ্য সুপ্রসন্ন ছিল। ঈশ্বর তাড়াতাড়িই আমার কোল ভরার বন্দোবস্ত করলেন।

"জীবনে প্রথমবার মা হওয়ার অভিজ্ঞতা! ভীষণ আনন্দের সঙ্গে একটা অদ্ভুত ভয় আমায় গ্রাস করল, যদি আমি মা হতে গিয়ে মরে যাই। যদি ব্যথাতেই আমার হার্টফেল হয়ে যায়। পরক্ষণে নিজেকেই নিজে বোঝালাম— দুনিয়ায় কত মেয়ে রোজ মা হচ্ছে! তারা কি মরে যায়! ঈশ্বর আমার জীবনকে পূর্ণতা দিতে চলেছেন। তাঁর করুণাকে নির্ভয়ে স্বীকার করে নেওয়াই ভাল। এর পর মাতৃত্ব সম্পর্কে আমার আর কোনও ভয় ছিল না। কিন্তু শাশুড়ি মা আমাকে আবার ভয় দেখিয়ে দিলেন। বললেন, ছেলের জন্ম দিতে হবে কিন্তু বউমা। একটা নাতি দাও আমাদের। স্বামী রাতে বিছানায় শুয়ে কানে কানে বললেন, একটা ছেলে দাও আমাকে— তোমায় রানি করে রাখব।

"দাসী থেকে রানি হওয়ার সৌভাগ্য আমার দরজায় কড়া নাড়ছিল। আর আমি নির্বোধের মতো ভাবছিলাম, কী করে ছেলের জন্ম দিতে হয়! এত দিনে শিখেছি কী করে রান্না-বান্না করতে হয়, কী করে স্বামীর হাতে নিজেকে নিবেদন করতে হয়, কী করে সেলাই-ফোঁড়াই করতে হয়। কিন্তু কেউ তো শেখায়নি, কীভাবে বেছে বেছে পুত্রসন্তানের জন্ম দিতে হয়। আমার আশঙ্কা ছিল— মেয়ে হবে। আমি স্বপ্নে নিজের মেয়েকে দেখতাম। বললে বিশ্বাস করবে না— আমি তাকে অনুভব করতে পারতাম। সে আমার সঙ্গে কথা বলত! বলত, মা, আমি আসছি। তুমি আমাকে অবহেলা কোরো না কিন্তু। আমি বলতাম, না মা আমার, তোমায় আমি সুন্দর করে সাজিয়ে রাখব। ঠিক করেছিলাম, যদি কন্যাসন্তান হয়, তাহলে আমি তাকে ফেলে পালাব না! পরিবারের বিরুদ্ধে গিয়েও আমি তাকে আপন করে নেব। যা যা নিজে পাইনি, আমার মেয়ে সব পাবে। সে আমার অস্তিত্বের দোসর হবে। তাকে আমি যত্ন করে মানুষ করে তুলব। বাড়ির লোকেরা আমাকে ডাক্তার দেখাতে নিয়ে গেল। ডাক্তারবাবু পেট টিপেটুপে বেশ খুশি হলেন, বললেন টুইনস হবে। যমজ সন্তান আসছে। বাড়ির লোকেরা অসম্ভব খুশি। জোড়া খোকা আসবে! আমিও খুশি। বাড়ির লোকের কথাও থাক। আমার ইচ্ছেও থাক। এক ছেলে এক মেয়ে হবে। বেশ হবে!

"অবশেষে সময় ঘনিয়ে এল। প্রসব যন্ত্রণায় আমি ছটফট করছিলাম। সে যন্ত্রণা তোমরা পুরুষেরা বুঝবে না। তেমন যন্ত্রণা তোমরা মরার সময়েও অনুভব করতে পার না! একটা বিরাট প্রাণ গর্ভের মধ্যে ছটফট করছে। কিছুক্ষণের জন্য মনে হয়, প্রাণটা এসে গলার কাছে আটকে আছে। ডাক্তার বলেন, "ব্রিদ... ব্রিদ... জোরে জোরে নিঃশ্বাস নিন... নিঃশ্বাস নিন...!" কিন্তু সে যম যন্ত্রণায় নিঃশ্বাস নেওয়াও প্রাণান্তকর মনে হয়... মনে হয় কোমরের তলা থেকে সমস্ত অঙ্গ ফেটে যাচ্ছে। এই মুহূর্তেই আমি টুকরো টুকরো হয়ে যাব। আমার পেট ফেটে যাবে... অথবা আমার হৃৎপিণ্ডটাই দড়াম করে বার্স্ট করবে...! কিন্তু আমিও লড়ে গেলাম। একটা তীব্রতম যন্ত্রণা আমার নিঃশ্বাসকে কিছুক্ষণের জন্য বন্ধ করে দিল। পরক্ষণেই শুনতে পেলাম একটা তীক্ষ্ণ কচি গলার কান্না! এসেছে— সে এসেছে! সে ওঁয়া ওঁয়া করে কাঁদছিল। নার্স হেসে বললেন, মেয়ে হয়েছে!"

"আমার প্রাণের ভিতর পর্যন্ত জুড়িয়ে গেল। এসেছে... আমার সোনা এসেছে! এত দিনে সে কল্পনা থেকে বাস্তবে পা রেখেছে। এর

পর মায়ের কোল জুড়ে থাকবে আমার আদরিণী। আমি তার রক্তমাখা লাল টুকটুকে হাত দেখলাম। ঝাপসা চোখে তার রক্তমাখা মুখ দেখলাম! আমার নন্দিনী... আমার সোনা এসেছে! মায়ের কাছে...! নন্দিনী... আমার নন্দিনী...!

"ভাবতে ভাবতেই দ্বিতীয়বার আবার সেই প্রচণ্ড ব্যথা। আরও কিছুক্ষণ ব্যথা সহ্য করার পর দ্বিতীয় চিৎকারটা শুনলাম। আমার চেতনা প্রায় জবাব দিয়ে দিয়েছিল! এতক্ষণের সমস্ত যন্ত্রণা প্রশমিত হতেই টানটান স্নায়ু হাল ছেড়ে দিল। হাত-পা অবশ হয়ে আসছে। আমি আর কিছু দেখতে বা শুনতে পাচ্ছিলাম না। আমার সামনে তখন শান্ত, শমিত অন্ধকার। তবু আবছা ভাবে কানে এল নার্সের গলা— 'ছেলে হয়েছে দিদি...!' আর কিছু মনে নেই! আমি ভাবলাম, এই শেষ! আমি মারা যাচ্ছি! অন্ধকার... চতুর্দিক ঘিরে অন্ধকার... অন্ধকার সে মৃত্যুগহ্বর!

"মেয়েদের জীবন অত সহজে শেষ হয় না। কতক্ষণ পরে আবার জীবনে ফিরলাম জানি না। ঠিকমতো জ্ঞান হতেই দেখলাম, আমি হাসপাতালের বিছানায় শুয়ে আছি। আর আমার পাশে আমার সন্তান ঘুমিয়ে আছে! কিন্তু এ কী! একজন কেন? আর একজন কই? অ্যাঁ! আমি ভাল করে দেখলাম। হ্যাঁ— এ তো আমার পুত্রসন্তান! কিন্তু আমার নন্দিনী! আমার বুকের ধন! সে কোথায়! আমি পাগলের মতো সবাইকে জিজ্ঞাসা করে বেড়াতে লাগলাম। শরীরের শক্তি ছিল না! তবু উঠে বসতে চাইলাম! কোথায় লুকিয়ে রেখেছে আমার নন্দিনীকে এরা! কোথায় সে!

"যাকেই জিজ্ঞাসা করি, সে-ই মুখ নিচু করে চলে যায়। আমি তখন প্রায় উন্মত্ত! নার্সকে, ডাক্তারকে আঁকড়ে ধরে জিজ্ঞাসা করছি, আমার মেয়ে কোথায়? তারা কোনও উত্তর দেয় না। আশেপাশের সদ্য প্রসূতিরা অবাক হয়ে আমায় দেখছে। ভাবছে— আমি পাগল! ভাবুক, কিন্তু আমার মেয়েকে চাই! আমার নন্দিনীকে চাই! শেষ পর্যন্ত শাশুড়ি মা জানালেন, আমার মেয়ে নাকি মারা গেছে। সে বেঁচে নেই! মিথ্যে কথা! সম্পূর্ণ মিথ্যে কথা! আমি নিজের কানে শুনেছি... জন্মের পর সে 'মা' বলে কেঁদে উঠেছিল!

"আমি জানতাম ওরা সবাই মিথ্যে কথা বলছে। নন্দিনী প্রথমে এসেছিল! তার কান্না শুনে আমি আনন্দে কেঁদে ছিলাম। আমি... আমি নিশ্চিত জানি... সে এসেছিল। কিন্তু এরা... নিষ্ঠুর কতগুলো পশু তাকে মেরে ফেলেছে! আমি পাথর হয়ে গিয়েছিলাম। যখন নার্স আমার হাতে পুত্রসন্তানটিকে তুলে দিল, তখন তার জন্য কোনও মায়া অনুভব করিনি। ও আমার স্বপ্ন নয়, আমার ইচ্ছে নয়। ও এ বংশের ইচ্ছে। আমার দায়! ওদের ছেলেকে বড় করে তোলার দায়! এর বেশি কিছু নয়!"

ভদ্রমহিলা কাঁদছিলেন। দুর্দম ব্যথায় তাঁর চোখ বেয়ে অঝোরে জল পড়ছে! প্রদীপ তাঁকে সময় দেয়। বুক ফাটা কান্নায় ভেঙে পড়েছেন তিনি! এ কান্না অভিজাত নয়! এ কান্না একমাত্র কোনও মা-ই কাঁদতে পারে। যখন কোনও মা কাঁদে, তখন ঈশ্বরের বুকও ফাটে। সমাজের বুক ফাটে না!

"আমি জানি..." তিনি কান্না জড়ানো গলায় বললেন, "আমার নন্দিনী ফিরে আসবেই... ফিরে আসতেই হবে ওকে... আমি ওর অস্তিত্ব নিজের ভিতরে টের পাই। সে আসবে! ওই পশুগুলোকে মুখের মতো জবাব দেওয়ার জন্য আসতেই হবে নন্দিনীকে... নন্দিনী আসবে... আসবে!"

ঠিক তখনই প্রদীপের মোবাইলটা বেজে উঠল।

পাখি মুখ নিচু করে পুলিশ স্টেশনে বসেছিল। সে নিজের সালোয়ার ছিঁড়ে ফেলেছে দেখে অনির্বাণ তাকে পরনের জ্যাকেটটা পরিয়ে বসিয়ে রেখেছে। আলোকে হসপিটালাইজড করা হয়েছে। তবে তার অবস্থা সম্বন্ধে এখনও কিছু জানে না সে। আপাতত পুলিশ স্টেশনে বসে ও নিজের বয়ান দিতে প্রস্তুত হচ্ছে। অজয়ের বিরুদ্ধে পাখিই একমাত্র সাক্ষী। পুলিশ অফিসার তাকে সতর্ক করেছেন, "ভেবে নিন ম্যাডাম। এ ঝামেলা কিন্তু অনেক দূর চলবে। আপনার কোনও ধারণা নেই আদালতে রেপ কেস উঠলে কী হয়।"

"জানি," পাখি দৃঢ় গলায় বলে, "দ্বিতীয়বার রেপ হয়। ভিকটিমকে নোংরা নোংরা প্রশ্ন করা হয় যাতে সে ভেঙে পড়ে। সাক্ষী যদি মহিলা হয় তবে তারও ওই একই অবস্থা হয়। আমি জানি কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়ে একটা মিথ্যেবাদী উকিল আমায় নোংরা নোংরা প্রশ্ন করবে। জিজ্ঞাসা করবে, আমার দাম্পত্যজীবনে স্বাভাবিক যৌনতা আছে কি না, অযথা ফ্রাস্ট্রেটেড হয়ে রেপের কল্পনা করে উত্তেজিত হচ্ছি কি না!"

"যখন সব জানেনই, তখন ঝামেলা ঘাড়ে নিচ্ছেন কেন? আপনার স্বামী জানেন কিছু এ বিষয়ে? তাঁর সমর্থন আছে?"

পাখির নাকের পাটা ফুলে ওঠে, "আমি স্বেচ্ছায় বয়ান দিচ্ছি। যা ঘটেছে তার সাক্ষী আমি, আমার স্বামী নন। তবে তাঁর সমর্থন করা বা না করায় কী আসে যায়?"

"আসে যায় ম্যাডাম।" অফিসার বেশ মুরুব্বিয়ানায় বললেন, "রেপ কেস তো কম দেখছি না। এর পর আপনার স্বামী এসে আমাদের দিকে আঙুল তুলবেন। বলবেন, আমরা জোর করে আপনাকে এই কেসে জড়িয়েছি। তারপর আপনি স্বামীর চাপে পড়ে ডিগবাজি খাবেন। বয়ান বদলে ফেলবেন। এই তো হয়! ইন্ডিয়ান পতিব্রতা উইমেন!"

পাখি উত্তেজিত হয়ে কিছু বলতে যাচ্ছিল। তাকে বাধা দিল অনির্বাণ। বলল, "বেশি কচকচ করে লাভ নেই পাখিদি। তার চেয়ে দীপদাকে ডেকেই নিই।"

সে কোনও উত্তর দেয়নি। তার নীরবতাকে সমর্থন ভেবেই প্রদীপকে ফোন করল অনির্বাণ। প্রদীপ তখন কবরখানায় ছিল। ফোন পেয়েই ত্রস্তব্যস্ত হয়ে এসে হাজির হল। তুমুল বর্ষণে সে ভিজে গেছে। তবু কোনওমতে এসে পৌঁছল। অনির্বাণ তাকে মোটামুটি গোটা ঘটনাটা ফোনেই বলে রেখেছিল। তা সত্ত্বেও পুলিশ স্টেশনে এসেই তার প্রথম প্রশ্ন, "এসব কী পাখি?"

পাখি টানা টানা চোখে দেখল প্রদীপকে। অবিকল ভিজে কাকের মতো দেখাচ্ছে ওকে। হাবভাবের মধ্যে একটা অব্যক্ত শঙ্কা।

"তুই এখানে কী করছিস?" প্রদীপ যেন পাখির গার্জিয়ান, "বাড়ি চল।"

পুলিশ অফিসারটি পাখির দিকে সোল্লাসে তাকাল। যেন বলতে চাইছে, কেমন? বলেছিলাম না?

"দীপ।" পাখি ধীরেসুস্থে বলে, "বাইরে চল। কথা আছে।"

প্রদীপকে নিয়ে বাইরে বেরিয়ে এল সে। যদিও বলল কথা আছে, কিন্তু তখনই কোনও আলোচনা করল না। মনে মনে কিছু বলার প্রস্তুতি নিচ্ছিল পাখি। তার আগেই প্রদীপ বলল, "তোর এসব ঝামেলায় পড়ার কী দরকার পাখি! আমি ঘটনাটা অল্পবিস্তর শুনেছি। ওই মেয়েটার সঙ্গে ছেলেটার সম্পর্ক ছিল। বহু দিন একসঙ্গে ঘুরেছে। তারপর মেয়েটা ছেলেটাকে রিফিউজ করেছে— ছেলেটা রিভেঞ্জ নিয়েছে। এটা সম্পূর্ণ দুটো লোকের ব্যক্তিগত ব্যাপার। এর মধ্যে তোর নাক গলানোর কী দরকার? যথেষ্ট হয়েছে। বাড়ি চল।"

পাখি বিস্মিত চোখ দুটো তুলে তাকাল প্রদীপের দিকে, "তুই অজয়ের এই পৈশাচিক কাণ্ডটাকে সমর্থন করছিস? ওর কাজটাকে জাস্টিফাই করছিস দীপ!"

"আমি জাস্টিফাই করছি না!" প্রদীপ উত্তেজিত হয়ে বলে, "আমার সাফকথা—তুই এসব ঝামেলার মধ্যে পড়বি না। অজয় ধরা পড়লেও বাকিরা এখনও ঘুরে বেড়াচ্ছে! তারা যদি তোর কোনও ক্ষতি করে?"

"আদেশ করছিস!" পাখির মুখ কঠিন। "কোন অধিকারে আদেশ করছিস? আমি কী করব না করব তার নির্দেশ দেওয়ার তুই কে?"

কিছুক্ষণের জন্য স্তব্ধ হয়ে গেল প্রদীপ। তারপর আস্তে আস্তে বলল, "আমি তোর হাজব্যান্ড, পাখি... তোর লাইফ পার্টনার।"

"লাইফ পার্টনার মানে বুঝিস?" তার চোখে রক্তিমাভা। চোখ ফেটে জল আসছে। তবু কাঁদল না সে। "লাইফ পার্টনার মানে কি

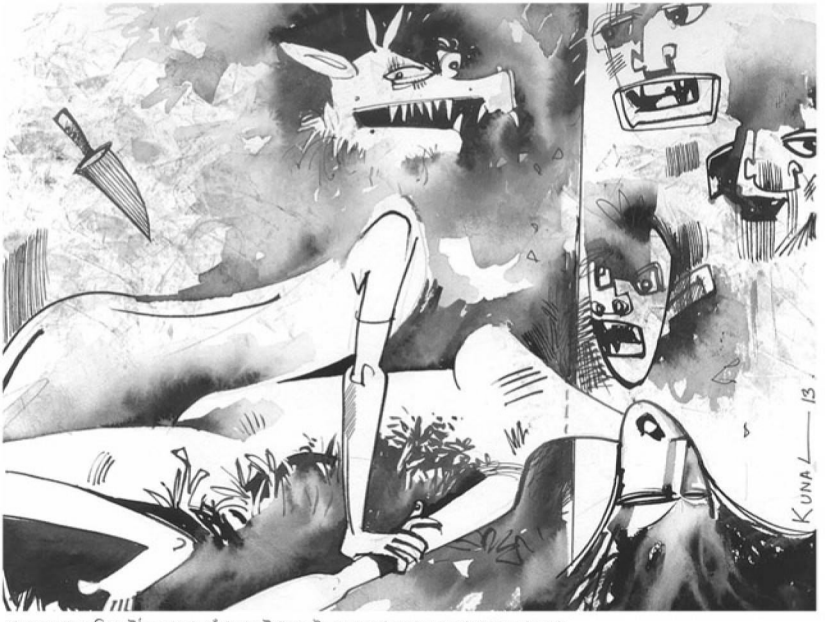

প্রচণ্ড যন্ত্রণায় ককিয়ে উঠল আলো। চেঁচানোর উপায় নেই। একজন শক্ত হাতে চেপে ধরেছে তার মুখ।

দীপ? একটা গালভরা নাম? আর কিছু না? জীবনসঙ্গী কাকে বলে? ওই শব্দটার মানে বুঝলে আজ এ কথা বলতি না। আমি তোর কাছে দামি গিফট চাইনি। তুই আমায় হিরে-জহরতে মুড়ে রাখ—এমন দাবিও করিনি। শুধু চেয়েছি, যে-লোকটা আমার সঙ্গে সারা জীবন কাটাবার অঙ্গীকার করেছে— প্রয়োজনে সে আমার জন্য লড়ুক। জীবনসঙ্গী মানে তো তাই। কে কাকে খাওয়াচ্ছে, কে কার টাকা ওড়াচ্ছে— কে কর্মঠ আর কে অকর্মণ্য, কিছুই ম্যাটার করে না!"

প্রদীপ মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে আছে। কী বলবে ভেবে পাচ্ছে না! পাখির চোখ বেয়ে একফোঁটা জল পড়ল, "আমি তোর কাছ থেকে এর বেশি কিছু এক্সপেক্টও করি না। শুধু একটা উপকার কর। লাইফ পার্টনার হয়ে আর গায়ের জোর ফলাস না। আমার লড়াইটা আমাকেই নির্বিঘ্নে লড়তে দে! আমি এখন বয়ান দেব, তারপর আলোকে দেখতে যাব। আমায় এখন বিরক্ত করিস না!"

প্রদীপ দু"মিনিট কী যেন ভাবে। পাখির প্রত্যেকটা কথা তার মাথায় এখন ধাক্কা মারছে। অনুরণন হচ্ছে প্রত্যেকটা শব্দের! পাখি, তুই তো জানিস আমি অপদার্থ! এতদিন ধরে শুধু ভেবে এসেছি তোর জীবনে আমি কোথাও নেই! শুধু মেটিরিয়ালের দিকটা দেখে এসেছি। আজ জানতে পারলাম, আমি সব সময়ই আছি! চোখে আঙুল দিয়ে তুই দেখিয়ে দিলি আমার অবস্থান! আরও আগে কেন দেখালি না পাখি!

"দাঁড়া।" প্রদীপ পাখির হাত সজোরে টেনে ধরল, "কোথাও যাবি না তুই!"

পাখি জ্বলন্ত দৃষ্টিতে তাকায়। "হাত ছেড়ে দে দীপ।"

প্রদীপ ধমকে উঠল। "কী ভেবেছিস নিজেকে? ঝাঁসির রানি! এইমাত্র লাইফ পার্টনারের উপর মস্ত বড় বক্তৃতা দিয়ে একা একা কোথায় চললি? নিজের অবস্থা দেখেছিস? জামাটা ছেঁড়া। মাথা থেকে পা অবধি ভেজা। এই অবস্থায় বেশিক্ষণ থাকলে নিউমোনিয়া অবধারিত! আর তুই বিছানায় পড়লে আদালতে সাক্ষী কে দেবে? আমি?"

পাখির কথাগুলো বুঝতে কয়েক মুহূর্ত সময় লাগল। সে হাঁ করে প্রদীপের দিকে তাকিয়ে থাকে।

"তুই প্রথমে বয়ান দিবি। তারপর স্টেট বাড়ি যাবি। এই ভিজে জামাকাপড়গুলো চেঞ্জ করে, একটু গরম কফি খেয়ে তারপর আমরা দুজনে মিলে আলোকে দেখতে যাব। রাজি?"

পাখি প্রদীপের বুকে ঝাঁপিয়ে পড়ে।

কুড়ি

ধনলক্ষ্মী জেমস অ্যান্ড জুয়েলারিতে বিধ্বংসী আগুন লেগেছে!

আশঙ্কায় কুঁকড়ে গিয়ে টি ভি-তে সেই দৃশ্যই দেখছিল স্নিগ্ধা! বার বার নিউজ় ফ্ল্যাশে সেই দৃশ্যই দেখাচ্ছে চ্যানেলগুলো। হিংস্র আনন্দে লেলিহান জিভ লকলকিয়ে আগুন সব গ্রাস করে নিচ্ছে। কালো ধোঁয়া কুণ্ডলী পাকিয়ে সাপের মতো ফুঁসে ফুঁসে উঠছে। গোটা তিনতলা বিল্ডিংটাই পুড়ে ছারখার। কয়েকশো কোটি টাকার জুয়েলারি গেছে অগ্নিগর্ভে। দুজন কর্মচারীর মৃত্যু হয়েছে। সাতজন সিরিয়াস অবস্থায় হসপিটালে! বাঁচবে কি না সন্দেহ! স্নিগ্ধা রিমোটে চাপ দিয়ে চ্যানেল বদলানোর চেষ্টা করে। কিন্তু আজ অন্য খবর বলতে পলিটিক্যাল নিউজ় ছাড়া একটি রেপের খবর। নৃশংসভাবে গণধর্ষিতা হয়েছে এক নারী। ওদের বাড়ির কাছেই কোথাও। প্রায় মৃত্যুর মুখে সে। হাসপাতালে আছে। এই খবরটাও দেখতে চায় না স্নিগ্ধা। তাই সে আগুনের খবরটাই দেখছে।

ঋতম আর স্নিগ্ধার শ্বশুর কিছুক্ষণ আগেও সেখানেই ছিলেন। প্রচণ্ড ক্ষোভের মধ্যে পড়তে হয়েছে তাঁদের। তার উপর মিডিয়ার দোষারোপ। একেই এত বড় ক্ষতি— তার উপর আবার নাকি তদন্ত

হবে। ফায়ার ব্রিগেডের 'নো অবজেকশন' সার্টিফিকেট ছিল কি না তাও খতিয়ে দেখা হবে। এমনিতেই জুয়েলারির কাজে এসব ঝুঁকি থাকেই। ম্যানুফ্যাকচারিং-এর কাজে আগুন লাগে। ধাতু গলানোর প্রসেসও রিস্কি। কিন্তু যারা কাজ করে তারা সবাই এসব কাজে দক্ষ। বহু বছর ধরে এই কাজই করে আসছে। এত দিন তো এসব কিছু হয়নি! তবে এখন কেন?

একটু আগেই কারণটা ঋতম বলে গেছে। বিধ্বস্ত, অপ্রকৃতিস্থ, ক্রুদ্ধ ঋতম বার বার আঙুল তুলেছে স্নিগ্ধার দিকে। "তোমার জেদের জন্যই এই সর্বনাশ! আগেই যদি আমাদের কথামতো রাক্ষসীটাকে মেরে ফেলতে তাহলে এই দিন দেখতে হত না। এখন তো সে উপায়ও নেই! জন্মালে আরও কী কী খাবে রাক্ষসী কে জানে! সব দোষ তোমার! আমার ইচ্ছে করছে..." ঘুষি পাকিয়ে স্নিগ্ধার দিকে তেড়ে গিয়েছিল সে। যেন এখনই তার পেটে আঘাত করে মেরে ফেলবে অনাগত শিশুকে!

স্নিগ্ধা ভয় পেয়ে চেঁচিয়ে উঠেছিল। তার চিৎকারে থেমে গিয়েছিল ঋতম। উদ্যত ঘুষিটাকে নিষ্ফল আক্রোশে নামিয়ে নিয়ে দাঁত কিড়মিড় করতে করতে চলে গিয়েছিল সে। এখন নিজের ঘরেই একলা বসেছিল স্নিগ্ধা। আজ সকালে থেকেই তার পেটে অল্প অল্প ব্যথা হচ্ছে। আস্তে আস্তে ব্যথাটা কোমর থেকে পায়ের দিকে ছড়িয়ে পড়ছে। কিছু দিন আগেই ন"মাস কমপ্লিট হয়েছে তার। ডঃ সুরালকে ফোন করতেই তিনি বললেন, "মোস্ট প্রব্যাবলি লেবার পেন। এক্ষুনি নার্সিংহোমে চলে এসো। তোমার হাজব্যান্ডকেও নিয়ে এসো। বাড়ির লোক থাকা জরুরি।"

আর হাজব্যান্ড! ভয়ের চোটে এই ব্যথার কথা কাউকেই এখনও জানায়নি স্নিগ্ধা। শাশুড়ি বোধহয় কিছু সন্দেহ করেছেন। কিন্তু মুখে কিছু বলেননি। তাঁকেও স্নিগ্ধা কিছু বলেনি। বিশ্বাস নেই... কাউকে বিশ্বাস নেই...! জানতে পারলেই এরা তাকে ডঃ সিন্‌হার নার্সিংহোমে ভর্তি করে দেবে। নন্দিনী জন্ম নেবে ঠিকই— কিন্তু এরা তাকে হয়তো গলা টিপেই মারবে। যে রকম মুডে আছে তাতে আছাড় মেরেও শেষ করে দিতে পারে। সব কিছু পারে এরা! এই পরিস্থিতিতে কী করবে স্নিগ্ধা! তলপেটের ব্যথা ক্রমাগতই বাড়ছে। সে আর বসে থাকতে পারছিল না। আস্তে আস্তে শুয়ে পড়েছে বিছানার উপরে! শুয়ে চোখের জল ফেলছিল সে! আর দু'টো স্প্যাসমের মধ্যেকার সময়ে বারবার মোবাইলে আলোকে টাই করছিল। আলোর ফোন বন্ধ। আলো... আলো! কোথায় তুই? আমার পাশে একমাত্র তুই ছিলি! আজ কোথায়? সেদিন আসবি বলেও এলি না.... তিনদিন হয়ে গেল, জানতেও চাইলি না কেমন আছি!

স্নিগ্ধা অসহায় ভাবে ভাবছিল, কী করবে! ঠিক তখনই তাকে চমকে দিয়ে ল্যান্ডফোনটা বেজে উঠেছে।

"হ্যালো?"

"খুব ব্যথা করছে মা?"

স্নিগ্ধার কান্না পেয়ে গেল। নন্দিন... তার নন্দিন ফোন করছে। কী জবাব দেবে তাকে? কী করে বলবে, "আমি আর পারলাম না মা!"

"সময় হয়েছে। আমি আসছি মা। কেঁদো না!"

"এরা তোকে আসতে দেবে না নন্দিন!" স্নিগ্ধা হাহাকার করে ওঠে। "ডঃ সিনহার নার্সিংহোমে তোকে এরা বাঁচতে দেবে না! আলোকেও পাচ্ছি না। একা একা ডঃ সুরালের কাছে যাব কী করে? কী হবে? আমি কী করব?"

"তুমি এখনই সবাইকে জানাবে যে, তোমার ব্যথা হচ্ছে।" নন্দিনীর কচি কণ্ঠে অদ্ভুত দৃঢ়তা। "কোন নার্সিংহোমে তুমি যাবে সেটা বড় কথা নয়। ডেলিভারি একগাদা লোকের সামনে হয়। সেখানে ডঃ সিন্‌হা কিছু করতে পারবে না। আর ডেলিভারি হয়ে যাওয়ার পরের কাজ ডঃ সিন্‌হার নয়— শিশু বিশেষজ্ঞের।"

"কাউকে বিশ্বাস নেই... কাউকে বিশ্বাস নেই...।"

স্নিগ্ধার কষ্ট হচ্ছিল। জোরে জোরে শ্বাস টানতে টানতে বলল সে, "টাকায় সব কেনা যায়!"

"আমাকে বিশ্বাস করো?" কৌতুকময়ী জানতে চায়।

"করি।"

"তাহলে এখনই সবাইকে জানাও যে, তোমার ব্যথা হচ্ছে। বিশ্বাস রাখো মা! আমি আসব...আমি আসছি!"

বিক্রমদার মুখ গম্ভীর। পাখি আর প্রদীপ কাতর দৃষ্টিতে তাঁর দিকে তাকিয়েছিল। এইমাত্রই আলোকে দেখে এসেছেন তিনি। পাখি আর প্রদীপকে আইসিইউ-র ভিতরে ঢুকতে দেওয়া হচ্ছে না! তারা বাইরে থেকেই দেখেছে কোমায় আচ্ছন্ন আলোকে। সারা মুখ যেন যন্ত্রণায় নীল! চোখে কালসিটে! সারা গায়ে অসংখ্য নল! মুখে অক্সিজেন মাস্ক!

"অবস্থা খুব ভাল বলতে পারছি না!" বিক্রমদা ধরা গলায় বললেন, "তলপেটে মাল্টিপল স্ট্যাবিং-এর জন্য ওভারি অ্যাফেক্টেড হয়েছে। গ্যাংগ্রিন হওয়ার সম্ভাবনা ছিল, তাই ওভারি কেটে বাদ দিতে হয়েছে। বুকে বেশ কয়েকটা হাড় ভেঙেছে। একটা হাড় দুটুকরো হয়ে ফুসফুসে বিঁধে আছে। ফুসফুস থেকে মাইল্ড ব্লিডিংও হচ্ছে। হাতে পায়ে অগুনতি ফ্র্যাকচার! কিন্তু সেটা খুব বড় কথা নয়। আমি চিন্তিত ইন্টারনাল ব্লিডিংটা নিয়ে। ইন্টারনাল ব্লিডিংটা যতক্ষণ না থামানো যাচ্ছে, ততক্ষণ দুশ্চিন্তা থাকছেই।"

"তাহলে কী হবে বিক্রমদা?" পাখির কাতর প্রশ্নটা বুকে বিঁধল বিক্রমদার। আড়চোখে তিনি আলোর মায়ের দিকে তাকালেন। ভদ্রমহিলা তিনদিন হল জলটুকুও মুখে দেননি। এখানেই দিনরাত ঠায় বসে আছেন। বাড়িতে বাবাকে আলোর দিদি সামলাচ্ছে। তিনি এখনও গোটা ঘটনার কিছুই জানেন না। জানলে হয়তো অন্তিম হার্ট-অ্যাটাকটাও হয়ে যাবে। আলোর মা নীরব দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন এদিকেই। মুখে রাত্রি জাগরণের ছাপ স্পষ্ট। তাঁর নীরব দৃষ্টিতে যেন আশঙ্কা ফুটে উঠেছে—মেয়েটা বাঁচবে তো!

বিক্রমদার চশমার পিছনের চোখদুটো বাষ্পাচ্ছন্ন হয়ে এল। তবু দৃঢ় গলায় বললেন, "যতখানি চেষ্টা করা যায়, ডাক্তাররা করছেন। ভরসা রাখো। আমি আলোকে চিনি। লড়াকু মেয়ে। জীবনের যুদ্ধে কখনও হার মানেনি। শেষ পর্যন্ত লড়েছে। এবারও লড়বে। আমরাও লড়ব! শেষ পর্যন্ত...!"

পাখি সজল চোখে আইসিইউ-র জানলার দিকে তাকায়। আলো বাঁচবে না, এমন কথা সে ভাবতেই পারে না। জীবনকে সে বড় ভালবাসত। আইসিইউ-র কাচে মুখ ঠেকিয়ে সে বিড়বিড় করে বলে, "ফিরে আয় আলো! মৃত্যুকে মাত দিয়ে ফিরে আয়! ওই নপুংসকগুলোর চোখে ত্রাস দেখার জন্য ফিরে আয়। গোটা নারীজাতির জন্য, যাদের চিরকালই সেকেন্ড জেন্ডার, দুর্বল জাতি বলে ট্যাগ করে দিয়েছে সমাজ, তাদের শক্তির প্রমাণ দিতে ফিরে আয়! ফিরে আসতে তোকে হবেই... তুই ফিরবি... আমি জানি... আমি জানি!"

সময়ের সঙ্গে-সঙ্গে স্নিগ্ধার ব্যথা প্রবল থেকে প্রবলতর হয়েছিল! ঋতমকে অতিকষ্টে বলতে পেরেছিল সে। ততক্ষণে তার লেবার পেন শুরু হয়ে গেছে। সঙ্গে সঙ্গেই তাকে নিয়ে আসা হয়েছে ডঃ সিনহার নার্সিংহোমে। লেবার পেন আরও বাড়ানোর জন্য ড্রিপ দেওয়া হচ্ছিল। কিন্তু প্রচণ্ড যন্ত্রণা সত্ত্বেও ডেলিভারি হয়নি। ডঃ সিনহা বলেছিলেন, "বেবির সাইজ অনুযায়ী স্পেস পাচ্ছে না। সিজার করতে হবে।"

কেমন যেন একটা ঘোরের মধ্যে আস্তে আস্তে চলে যাচ্ছিল স্নিগ্ধা! চোখের সামনে কতগুলো জোরালো আলোর উপস্থিতি শুধু টের পেয়েছিল। অনেকগুলো সাদা মাস্ক পরা লোক তাকে ঘিরে দাঁড়িয়ে রয়েছে। এরা কারা! হাতে গ্লাভস পরা! ছুরি, কাঁচি চালাচ্ছে! নন্দিনী কি আসছে? ওই ছুরি কাঁচি দিয়ে তার কচি গলাটা কেটে ফেলবে না তো ওরা!

"ইয়েস, হিয়ার ইউ আর!"

ডঃ সিনহার গম্ভীর গলাটা শুনতে পেয়েছিল সে। পরক্ষণেই একটা কচি, শানানো গলার চিৎকার! কাঁদছে! এসেছে... নন্দিনী এসেছে!

"কনগ্র্যাটস!" একজন জুনিয়র লেডি ডাক্তার হেসে বলেছিল, "খুব সুন্দরী একটা মেয়ে হয়েছে। এই দেখুন... এই দেখুন আপনার মেয়ে!"

অতিকষ্টে চোখ মেলে তাকাল স্নিগ্ধা। হ্যাঁ— এই তো তার নন্দিনী! রক্তাক্ত, কিন্তু সুন্দর। রেশমের মতো একমাথা চুল। সেই সুন্দর মুখ আস্তে আস্তে ঝাপসা হয়ে এল। অজানা একটা ঘোরে ডুবে গেল সে! বলা ভাল, আচ্ছন্ন হয়ে পড়ল!

কতক্ষণ অমন ঘোরের মধ্যে পড়েছিল খেয়াল নেই। নিঃশ্বাস নিতে একটু কষ্ট হচ্ছিল বলে কেউ হয়তো একটা অক্সিজেন মাস্ক নাকের উপরে চাপিয়ে দিয়ে গিয়েছে। পুরোপুরি চেতনায় ফিরতেই অক্সিজেন মাস্কটাকে অসহ্য ঠেকছিল ওর। মাথাটা জগদ্দল ভারী। কোনওমতে মাথাটা এক পাশে সরাতেই তার বুকের ভিতরটা ধক্ করে ওঠে। কই? তার সদ্যোজাত সন্তান কোথায়? এখানেই তো থাকার কথা ছিল। কিন্তু নেই! কোথায় তার নন্দিনী!

সে একটান মেরে অক্সিজেন মাস্ক খুলে ফেলে। শরীরে শক্তি নেই, তবু টলোমলো পায়ে বিছানা থেকে নামার প্রাণপণ প্রচেষ্টা চালাচ্ছে। সিস্টার এসে তাকে ধরে ফেলল, "আরে... আরে... কী করছেন!"

"আমার মেয়ে... আমার মেয়ে কোথায়? কোথায় রেখেছেন তাকে? কোথায়...?"

উন্মত্তের মতো শ্বাস টানতে টানতে বলল স্নিগ্ধা! তার বুকে কেউ যেন হাতুড়ি পিটছে। মেরে ফেলেছে! ওরা কি ওকে মেরে ফেলেছে!

"আপনার বেবি ঠিক আছে।" সিস্টার তাকে শান্ত করার চেষ্টা করে। "বাচ্চার ব্রিদিং প্রবলেম হচ্ছিল বলে ডক্টর ওকে ইনকিউবেটরে রেখেছেন।"

"আমি ওসব কিছু জানি না!" সিস্টারের ইউনিফর্মের কলার চেপে ধরল স্নিগ্ধা। হিংস্রভাবে বলল, "আমি কিচ্ছু জানি না...এক্ষুনি ওকে আমি দেখব...এক্ষুনি আমি আমার মেয়েকে চাই।"

মুহূর্তের মধ্যে তার চারপাশে একটা ছোটখাট ভিড় জমে গেল। ডাক্তার, নার্স—কেউ তাকে বুঝিয়ে পারছে না! লাল লাল অপ্রকৃতিস্থ চোখ মেলে স্নিগ্ধা ভীষণ আক্রোশে চতুর্দিকে দেখছে। কাউকে বিশ্বাস নেই— সবই ওদের কেনা! সবাই শত্রু।

"শুনুন!" ডাক্তার তাকে বোঝানোর চেষ্টা করেন, "বেবির ফুসফুসটা পুরোপুরি খোলেনি। তাই ওর শ্বাস নিতে সমস্যা হচ্ছে। এখন ইনকিউবেটর থেকে বের করলে লাইফ রিস্ক আছে। অনেক কেসেই এমন হয়।"

"আমি আমার মেয়েকে চাই!" সে জন্তুর মতো ডাক্তারদের আঁচড়ে কামড়ে একসা করছে... ডাক্তাররা প্রাণপণে তাকে বেডে ধরে রাখার চেষ্টা করেন। কিন্তু সে বেডে থাকতে চায় না... এক্ষুনি মেয়েকে দেখবে! সিস্টারকে এক ধাক্কা মেরে সরিয়ে দিল... জুনিয়র ডাক্তাররা বুঝিয়ে পারছে না। স্নিগ্ধা এখনই তার মেয়েকে দেখবে! তার নন্দিনীকে দেখবে!

হাতের চামড়ায় একটা পিন ফোটার মতো যন্ত্রণা! ইঞ্জেকশন দিল! ওরা তাকে ইঞ্জেকশন দিয়ে দিল! ঘুম পাড়িয়ে রাখবে! তাকে ঘুম পাড়িয়ে নন্দিনীকে... ফাঁদে পড়া জন্তুর মতো শেষ শক্তিটুকু দিয়ে যুদ্ধ করে যাচ্ছিল সে। চোখ বনবন করে ঘুরছে! মুখে ফেনা ভাঙছে। উন্মত্তের মতো গলার শিরা ফুলিয়ে অসহ্য চিৎকার করছে হতভাগিনী মা, "আমি আমার মেয়েকে চাই... আমার মেয়েকে এনে দাও... আমি আমার মেয়েকে দেখতে চাই-ই! আমি নন্দিনীকে দেখতে চাই-ই-ই-ই! নন্দিনীকে চাই-ই-ই-ই-ই-ই!"

ঋতম আর তার বাবা শিশুদের আইসিইউ-র সামনে চুপ করে দাঁড়িয়েছিল। আইসিইউ-র ভিতরে দু"তিনটে কাচের ইনকিউবেটরে ছোট ছোট বাচ্চারা ঘুমিয়ে আছে। সবাই দেখতে একই রকম! লাল লাল দেখতে! ছোট ছোট নাক, অস্পষ্ট চোখ! সদ্যোজাত বাচ্চাদের মোটামুটি সবাইকেই বোধহয় যমজ ভাই বোন বলে চালিয়ে দেওয়া যায়! শুধু একজনই ব্যতিক্রম! এখান থেকেই তাকে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। গোলাপি পুতুলের মতো! মুখটা দারুণ প্রমিনেন্ট। শোওয়ার ভঙ্গিটা রাজকীয়! ঋতমের মনে হল— শোয়ার ভঙ্গিটা উদ্ধত! যেন বলতে চায়, দ্যাখ কেমন লাগে! চেষ্টা তো কম করলি না! ঠেকাতে পারলি আমাকে! এই কাল্পনিক ঔদ্ধত্য অসহ্য লাগে ঋতমের। তার চোয়াল শক্ত হয়ে ওঠে। সব সর্বনাশের গোড়া ওই বাচ্চাটা! বিষবৃক্ষের মূল! সবে অঙ্কুরিত হয়েছে। এর পর আস্তে আস্তে বড় হবে। ডালপালা ছড়াবে। শিকড় চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়বে! রায়চৌধুরী পরিবারের কাল! ওকে বড় হতে দেওয়া যাবে না! এখনই কেটে ফেলা দরকার!

একটু আগেই ডঃ সিন্‌হা অবশ্য বাবাকে জানিয়েছেন, "আমি এসবের মধ্যে নেই। আপনার পুত্রবধূ আমাকে দেখলেই যেরকম চিৎকার চেঁচামেচি করছেন তাতে রিস্ক নিতে পারছি না। টাকার চেয়েও আমার রেপুটেশন বড়। সরি! আপনাদের যা খুশি তাই করুন। কিন্তু আমাকে ইনভলভ করবেন না।"

"ওই নলটা দেখেছ?" বাবা ঋতমকে অঙ্গুলিনির্দেশে একটা নল দেখালেন, "ওই নলটা দিয়েই ইনকিউবেটরের ভিতরে অক্সিজেন যাচ্ছে। ডঃ সিনহা বলছিলেন, বাচ্চাটার ফুসফুস পুরোপুরি খোলেনি। কিন্তু কয়েক দিন ইনকিউবেটরে রাখলেই ঠিক হয়ে যাবে। যত দিন ইনকিউবেটরে থাকে তত দিনই সুযোগ। ঠিক হয়ে গেলে বাচ্চাকে মায়ের কাছে দিয়ে দেওয়া হবে! তারপর কিন্তু স্নিগ্ধা যক্ষের মতো পাহারা দেবে মেয়েকে!"

"আর যদি অক্সিজেনের ডেফিশিয়েন্সির দরুণ ইনকিউবেটরেই মারা যায়?"

ঋতমের কথায় তার বাবা হাসলেন। নলের সঙ্গে অ্যাটাচড রেগুলেটরের নবটা তাঁরও চোখে পড়েছে। সম্ভবত ওই নলটা ঘুরিয়ে দিলেই ভিতরের অক্সিজেন সাপ্লাই বন্ধ হয়ে যাবে! এই মুহূর্তে আইসিইউ-র ভিতরে কেউ নেই। শুভস্য শীঘ্রম।

দুজনেই নিঃশব্দ পায়ে আইসিইউ-তে ঢুকে পড়ল। ঋতম এখন স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে নিজের আত্মজাকে। কিন্তু দুর্বল হয়ে পড়ার প্রশ্নই ওঠে না! একের পর এক দুর্ঘটনা ঘটেই চলেছে তাদের পরিবারে। অত বড় একটা শোরুম চোখের সামনে পুড়ে ছারখার হয়ে গেল! সব অমঙ্গলের কারণ এই মেয়ে! ঋতম নিশ্চিত— এই কন্যাসন্তানই অশুভ! আর অশুভের অন্ত হওয়া জরুরি!

বাবা পিছন দিকে সতর্ক চোখে দেখছেন। যে কেউ এসে পড়তে পারে। নার্সরা তো সব সময়ই আনাগোনা করছে। একটু আগেই একজন সিস্টার পাহারায় ছিল। সম্ভবত এখন তার ডিউটি শেষ হয়েছে। আর একজন এখনও এসে পৌঁছয়নি। এই সুযোগ।

"তাড়াতাড়ি করো ঋতম!" বাবা চাপা গলায় বললেন, "হারি আপ।"

ঋতমের বুকের ভিতরটা দুরু দুরু করে। সে টের পেল তার হাত কাঁপছে। নিঃশ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে। তবু হাত বাড়িয়ে দিল ইনকিউবেটরের রেগুলেটরের দিকে...! তার আঙুল স্পর্শ করেছে নবটা! এবার একটু ঘুরিয়ে দিলেই...!

আচমকা পিছনে দরজা খোলার শব্দ। ঋতম বিদ্যুৎগতিতে পিছনে ফিরল! তার হৃৎপিণ্ডটা আর একটু হলেই লাফ মেরে বাইরে চলে আসত! বাবাও স্তম্ভিত হয়ে পিছনে তাকিয়েছেন! কে এল! কোনও সিস্টার?

না! সিস্টার নয়! দরজা খুলে ভিতরে ঢুকলেন স্নিগ্ধার শাশুড়ি, ঋতমের মা।

"ও তুমি!" বাবা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন। "আমি ভাবলাম...!"

ঋতম ঠান্ডার মধ্যেও ঘামছিল। সে মায়ের দিকে তাকায়। মাকে কেমন যেন অন্যরকম লাগছে! সচরাচর তাঁর মুখে একটা নির্লিপ্তভাবই লেগে থাকে। কিন্তু আজ উত্তেজিত! মুখে বিন্দু বিন্দু ঘাম। জোরে জোরে নিঃশ্বাস ফেলছেন!

"কী হয়েছে মা?" সে অবাক!

মা তার দিকে তাকালেন। কী অপ্রকৃতিস্থ সে চাউনি! দু চোখে যেন ফার্নেস জ্বলছে! দেবী চণ্ডীর মতো জ্বলন্ত দৃষ্টিতে তাকাচ্ছেন তিনি!

"কল্যাণী! কী হল?"

বাবা এগিয়ে যেতেই অঘটন ঘটল। এক পাশে একটা খালি অক্সিজেন সিলিন্ডার ছিল। সেটাকে তুলে নিয়ে মা বিদ্যুৎবেগে সপাটে বসিয়ে দিলেন বাবার মাথায়। ফিনকি দিয়ে রক্ত ছুটল। ঋতম অবাক হয়ে দেখল বাবা অক্সিজেন সিলিন্ডারের এক ঘায়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়েছেন! মা আবার আঘাত করতে উদ্যত...!

"আমাকে আটকাবি!" তিনি বললেন, "আমাকে আসতে দিবি না? শ-য়-তা-ন!"

ঋতমের রক্ত হিম হয়ে গেল! এ কার কণ্ঠস্বর! এ তো মায়ের গলা নয়! হতেই পারে না। কোনও পূর্ণবয়স্ক মানুষের কণ্ঠস্বর এ নয়! কোনও ছোট্ট শিশুর মতো কচি গলা। অথচ কী প্রতিহিংসা সে কণ্ঠস্বরে!

"মা!"

ঋতম মাকে আটকাতে যায়। কিন্তু তার আগেই তার মাথাতেও সপাটে এসে পড়ল এক মোক্ষম বাড়ি। মা রুদ্রাণীর মতো তেজে অক্সিজেন সিলিন্ডারটাকে ধরে আছেন। উদ্যত ত্রিশূলের মতো তাঁর হাতে ফণা তুলেছে সেই অভিনব অস্ত্র।

"মা কী করছ?" ঋতমের মুখ চোখ রক্তে ভেসে যাচ্ছে। সে কাতরোক্তি করে ওঠে, "মা!"

"তোর মা মরে গেছে!" মা শিশুর গলাতেই ধমকে উঠলেন, "জা-নো-য়া-র! আমাকে আসতে দিবি না! আমাকে আটকাবি! মেরেই ফেলব... মেরেই ফেলব...!"

তিনি অক্সিজেন সিলিন্ডার নিয়ে ধেয়ে আসেন। তাঁর চোখে কয়েক মুহূর্তের জন্য নিজেকে শমনকে দেখল ঋতম। গলগল করে তার মাথা থেকে রক্তক্ষরণ হয়ে যাচ্ছে! আর একটা মার পড়লে সে নির্ঘাৎ মারা যাবে।

হয়তো সত্যিই মারা যেত। কিন্তু শিশুদের আইসিইউ-তে হইচই শুনে ডাক্তার, সিস্টাররা ছুটে এসেছিলেন। কয়েকজন সিস্টার দৌড়ে এসে চেপে ধরল মাকে। মায়ের গায়ে তখন আসুরিক শক্তি! তিনি বার বার ছিটকে ওদের কবল থেকে বেরিয়ে আসছেন, আর বলছেন, "মেরে ফেলব... মেরে ফেলব!"

"কী করছেন ম্যাডাম!" এক যুবক ডাক্তার পিছন থেকে বেকায়দায় ধরে ফেলেছে তাঁকে। তিনি তখনও উন্মত্ত। ডাক্তারটি তাকে সামলানোর চেষ্টা করে। "শান্ত হোন... শান্ত হোন!"

"চুপ!" মা হিসহিস করে বললেন, "আমি নন্দিনী। আমি ফিরে এসেছি! এবার বিচার হবে... বিচার হবে!"

টানতে-টানতে কল্যাণী রায়চৌধুরীকে বাইরে নিয়ে যাওয়া হল। ওয়ার্ড থেকে বাইরে। তিনি তখনও শিশুর মতো গলায় বলে চলেছেন, "নন্দিনী আমি, আমি ফিরবই!"

নার্সিংহোমের এক দিকে গন্ডগোলের আঁচ পেয়ে অনেকেই এদিকে ছুটে এসেছে। তাদের মধ্যে একটি লোক ভদ্রমহিলাকে দেখে স্তম্ভিত হয়ে গেছে। মহিলা তার পূর্বপরিচিত। এই নারীটির সঙ্গেই সে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটিয়েছে শিশুর কবরখানায়। এই নারীর জীবনের ইতিহাস শোনার জন্যই সে কবরখানায় যেত। এই মানুষটিই রোজ আসতেন তাঁর শিশুকন্যার কবরে! এই মানুষটিই! এ কীভাবে কথা বলছেন তিনি? এক ওয়ার্ডবয় বলে, "স্বামী-ছেলেকে কী মার মেরেছে লেডিঞ্জটা!"

প্রদীপ আপনমনেই বিড়বিড় করে বলে, "আনবিলিভেবল! আনবিলিভেবল!"

"দী—ই—প।" প্রদীপের পিছনে এক নারী এসে দাঁড়িয়েছে। পাখি! তার চোখেমুখে উত্তেজনা। কণ্ঠস্বরে একরাশ উচ্ছ্বাস ছড়িয়ে সে বলল, "এখানে কী দেখছিস? তাড়াতাড়ি আয়। আলোর সেন্স ফিরেছে। সবাইকে চিনতে পেরেছে। কথা বলছে! ক্যান ইউ বিলিভ ইট? শিগগির চল।"

পাখির হাত ধরে প্রদীপ ফিরে চলল। ভদ্রমহিলা তখনও ফুঁসছেন। বার বার বলছেন, "আমি নন্দিনী... আমি ফিরে এসেছি... এবার বিচার হবে... বিচার হবে... বিচার হবে!"

একুশ

"কা-র কথা বলছেন?"

লোকটা এতক্ষণ চুপচাপ গল্প শুনছিল। তবে শেষের দিকে বেশ উত্তেজিত হয়ে পড়েছিল। আমি শেষ করতে না করতেই সে আমার উপর প্রায় ঝাঁপিয়ে পড়ল। দু হাত দিয়ে আমায় ঝাঁকাতে ঝাঁকাতে বলল, "কা-র গল্প বলছেন আপনি? কা-র কথা বলছেন?"

আমি শান্ত দৃষ্টিতে তাকালাম। দরজায় এক সুন্দরী নারী এসে দাঁড়িয়ে আছে আর এক অপরূপ সুন্দরী বালিকা! যেন সদ্য ফোটা বৃষ্টিস্নাত গোলাপ!

"এসো নন্দিনী!" লোকটার উৎপাত অগ্রাহ্য করে সেদিকে তাকিয়ে বলি, "তোমার বাবা আমার উপর রাগ করেছেন। তোমাদের এতক্ষণ বসিয়ে রেখেছি কি না!"

নন্দিনী মুক্তোর মতো দাঁত বের করে ঝরঝর করে হাসল। বলল, "জান মেসো, আমি মোটেও বসিনি।"

"বসনি?" আমিও হাসছি, "তাহলে এতক্ষণ কী করছিলে তুমি?"

"আমি তো আলোমাসি আর পাখিমাসিকে কুংফু শেখাচ্ছিলাম। তুমি শিখবে?"

"নিশ্চয়ই শিখব। তার আগে তোমার বাবাকে নিয়ে যাও।"

নন্দিনীর মা এগিয়ে এল লোকটার দিকে, "চলো ঋতম। তোমার খাওয়ার সময় হয়েছে!"

ঋতম সামনের নারীটির দিকে হাঁ করে তাকিয়ে আছে। কিছুক্ষণ শূন্য দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকার পর আস্তে আস্তে বলল, "স্নিগ্ধা!"

স্নিগ্ধা হাসল। আমার দিকে তাকিয়ে বলল, "আবার তো ও সব ভুলে যাবে দীপদা।"

"ভুলে যাক," আমি বলি, "আবার ওকে শুনিয়ে দেব এই গল্পটা। প্রতি সপ্তাহেই তো শোনাই! আরও কয়েকবার না হয় শোনাব।"

স্নিগ্ধা আমার দিকে একটা কৃতজ্ঞতাপূর্ণ দৃষ্টিপাত করে ঋতমকে নিয়ে চলে গেল। পিছন-পিছন নন্দিনী।

আমি জানলার সামনে এসে একটা সিগারেট ধরাই। অক্সিজেন সিলিন্ডারের আঘাতে ঋতমের মস্তিষ্ক গুরুতর আহত হয়েছিল। এখন আর সব কিছু ঠিক থাকলেও সে বেশি দিন কিছু মনে রাখতে পারে না! নিজের পরিচয়, নিজের পরিবারের সব কথা ভুলে যায়। তাই তাকে প্রতি সপ্তাহে সব মনে করিয়ে দিতে হয়!

ঋতম বাঁচলেও তার বাবা বাঁচেননি! কয়েকদিন কোমায় থেকে শেষ পর্যন্ত মারা গিয়েছিলেন। ঋতমের মা, তথা স্নিগ্ধার শাশুড়িকে গ্রেফতার করলেও তাকে শাস্তি দিতে পারেনি ভারতীয় সংবিধান। কারণ তিনি মানসিক রোগগ্রস্ত ছিলেন। মাল্টিপল পার্সোনালিটি ডিজঅর্ডারের শিকার। বর্তমানে মেন্টাল অ্যাসাইলামে আছেন। সে এক অদ্ভুত কেস! এক দিকে তিনিই স্বামী, ছেলের সঙ্গে স্নিগ্ধার বিরুদ্ধে চক্রান্ত করতেন। আবার সেই তিনিই নন্দিনী হয়ে নিজের ঘরের এক্সটেন্ডেড লাইন থেকে ফোন করে স্নিগ্ধাকে সাবধান করতেন। তাঁর একটা সত্তা যক্ষপুরীর নিয়ম-কানুনকে মেনে নিয়েছিল এবং কঠোরভাবে পালনও করত। আবার অন্য দিকে একটা ভিন্নমুখী সত্তা সমস্ত নিয়মের প্রতিবাদ করত! সমস্ত নিয়ম-কানুনকে ভাঙার জন্য মরিয়া হয়ে উঠত। তাই যখন জানা গেল স্নিগ্ধার কন্যাসন্তান হতে চলেছে— তখন ঋতম আর তার বাবার সঙ্গে তিনি স্নিগ্ধার শাশুড়ি হয়ে বাচ্চাটা অ্যাবর্ট করানোর জন্য ষড়যন্ত্র করলেন। কিন্তু তাঁর দ্বিতীয় সত্তা নন্দিনী ফের মাথাচাড়া দিয়ে উঠল! যখন তিনি নন্দিনী হয়ে যেতেন, তখন তাঁর কণ্ঠস্বর বাচ্চাদের মতো হয়ে যেত, কথাবার্তা অন্যরকম হয়ে যেত।

সাইকিয়াট্রিস্টরা এর কারণ খুঁজতে গিয়ে আবিষ্কার করলেন এক অদ্ভুত অধ্যায়। এই অধ্যায়ের একটা অংশ আমি জানতাম। যে-অংশটা জানতাম না সেটাই তিনি বললেন ডাক্তারদের—

চেকারবাবুর খুব থিয়েটারের শখ ছিল। প্রায়ই আমাদের থিয়েটার দেখাতে নিয়ে যেতেন। এক থিয়েটারের মালিক নুকুবাবু তাঁর খুব ভাল বন্ধু ছিলেন। আমাকে দেখে বললেন— 'আরে এ তো নন্দিনী!'

চেকারবাবু অবাক। 'নন্দিনী!'

'আরে!' নুকুবাবু বললেন, 'আমরা "রক্তকরবী" করার ডিসিশন নিয়েছি। কিন্তু নন্দিনী চরিত্রটা করার মতো মেয়েই পাওয়া যাচ্ছে না! তোমার মেয়েটি তো দেখছি একেবারে পাতা থেকে উঠে আসা নন্দিনী! এই মেয়েটিকে আমায় দাও ভাই! কথা দিচ্ছি, উপযুক্ত পারিশ্রমিক দেব।'

'কিন্তু ও কি অভিনয় করতে পারবে? অ্যাক্টিং করা তো অত সহজ নয়!'

'চেহারাটুকু মিলে গেছে এটাই যথেষ্ট!' তিনি বললেন, 'অভিনয় আমরা শিখিয়ে নেব।'

শুরু হয়ে গেল আমার তালিম। আমার ঠাকুরদা শখের থিয়েটারে অভিনয় করতেন। তাঁর রক্তের গুণ ছিল আমার মধ্যে। আমি একটু একটু করে পোক্ত হয়ে গেলাম। নুকুবাবু আমায় 'রক্তকরবী' পড়তে দিলেন! সেই থেকে নন্দিনী আমায় পেয়ে বসল। আমি আশ্চর্য হলাম! একটা মেয়ের কী অদ্ভুত জোর! কী আশ্চর্য ক্ষমতা! সে একাই বদলে দিল যক্ষপুরীর সব কিছু! একার জোরেই ভেঙে দিল সমস্ত তথাকথিত নিয়ম! একা নারী কি এত শক্তিশালী হতে পারে!

যখন অভিনয় করতে নামলাম তখন মনে হল, হ্যাঁ, একমাত্র একজন নারীই পারে সব বদলাতে! গর্বে আমার বুক ভরে গেল। আমিও নারী! আমিও সব পাল্টানোর মতো শক্তি রাখি! আমিই পারি! কারণ আমি যে নন্দিনী! আমিই নন্দিনী! নন্দিনীর সঙ্গে একাত্ম হয়ে গেলাম। তার প্রতিটি সংলাপে আমি নিজেকে খুঁজে পেতাম। নন্দিনীর বলা প্রতিটি কথায় বিশ্বাস করতাম! নন্দিনী ও আমি হয়ে দাঁড়ালাম এক ও অভিন্ন!

কিন্তু নুকুবাবু কয়েক বছর পরেই নন্দিনীর চরিত্র থেকে আমায় সরিয়ে নিলেন। আমার রাগ হল! কেন অন্য অভিনেত্রী আমার রোলে অভিনয় করবে? আমি তো নন্দিনী! তবে অন্য মেয়ে কেন আমার সংলাপ, আমার সত্তাকে কেড়ে নেবে! খুব রাগ হল। নতুন অভিনেত্রীর খাবারে বিষ মিশিয়ে দিলাম। কিন্তু সে কপালগুণে মরল না! খবরটা জানাজানি হল। আমার হয়তো সাজাও হত। কিন্তু নুকুবাবু অনেক টাকা খরচ করে ব্যাপারটা চাপা দিয়ে দিলেন।

এর পর আমার বিয়ে হয়ে গেল। বুঝলাম, এ সংসারে নন্দিনী হয়ে ওঠা খুব মুশকিল। কিন্তু যখন গর্ভবতী হলাম, তখন আশায় বুক বাঁধলাম! ভাবলাম আমার অভিন্ন সত্তা এবার ভিন্ন দেহে আসছে। সে এলে সব বদলে যাবে! সব নিয়ম পালটে দেবে আমার নন্দিনী। ইচ্ছে ছিল, মেয়ে হলে তার নাম রাখব নন্দিনী! নন্দিনী এল। কিন্তু কতগুলো কাপুরুষ তাকে আমার কোল থেকে ছিনিয়ে নিল! তাকে কেড়ে নিল আমার কাছ থেকে!

তারপর থেকে সংসারের আর কিছু আমাকে আকর্ষণ করল না! এমনকী নন্দিনীর সহোদর ঋতমও নয়! ঋতম আমার দায় ছিল— আমার আত্মজ হয়ে উঠতে পারেনি কখনও। কিন্তু আমি জানতাম নন্দিনী ফিরে আসবে... একদিন সে আসবেই...!"

আলো এখন ভাল আছে। অজয় আর তার সঙ্গীসাথীরা যথারীতি জেল খাটছে। তবে আলো কখনওই মা হতে পারবে না। সে এখনও ঠিকমতো হাঁটতে পারে না! হিপবোন ভেঙে যাওয়ার দরুন তার একটা পা একটু ছোট হয়ে গেছে। কিন্তু সে জীবনে কখনও হার মানেনি। বিয়ে করেনি। আজও লাঠি হাতে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে রিপোর্টারি করে যাচ্ছে। সে আর পাখি এখন এ শহরের সেরা ক্রাইম জার্নালিস্ট!

পাখিও দিব্যি আছে। খুব শিগগিরই আমাকে একটা প্রোমোশন দেবে ও। আমাকে বাবা বানানোর প্রসেস চলছে। এখন ওর সাত মাস! আর দু'মাসের অপেক্ষা! আমি জিজ্ঞাসা করেছি, "কী চাস পাখি?"

ওর সহাস্য উত্তর, "মেয়ে হলেই ভাল হয়?"

"নাম ভেবেছিস?"

"উঁ উঁ উঁ!" ও একটু ভেবে জবাব দিল, "চিত্রাঙ্গদা হলে কেমন হয়?"

সত্যি রবিঠাকুর! কী বিচিত্র মেয়েদের মন!

স্নিগ্ধা এখন স্বামীর বিজনেস দেখছে! কয়েক পুরুষে যা হয়নি, এক নারী তা করে দেখিয়েছে! ধনলক্ষ্মী জেমস অ্যান্ড জুয়েলারির এখন কলকাতা ছাড়া সারা ভারতে আরও সাতটা শাখা! আগে কলকাতায় তিনটে শাখা ছিল। অগ্নিকাণ্ডের পর ব্যবসা একদম পড়ে গিয়েছিল। স্নিগ্ধা দেখিয়ে দিল, এক নারী চাইলে কী করতে পারে। ডুবে যাওয়া ব্যবসার জাহাজকে একাই টেনে তুলল! সম্প্রতি 'বেস্ট বিজনেসওম্যান'-এর খেতাব পেয়েছে!

নন্দিনী ভারি সুন্দরী হয়েছে। এ মেয়ে ডাকসাইটে সুন্দরী হবে! সে এখন ক্লাস ফাইভে পড়ে। পড়াশোনায় ব্রিলিয়ান্ট! বিকেলে নাচ শেখে, সকালে কুংফু! আশা করা যায় যুবতী হওয়ার আগেই সে নৃত্যপটিয়সী ও ব্ল্যাকবেল্ট দুই-ই হয়ে যাবে! মাকে চোখে হারায়। বাবাকেও খুব ভালবাসে। স্বভাবটি চমৎকার হয়েছে।

আর আমি? মানে, পাখির অপদার্থ স্বামী? হ্যাঁ, আমিও ভাল আছি! লেখালেখি নিয়েই দিব্যি কেটে যায়। এখন কেউ আমায় রোগা সিটকে বলতে পারবে না! গায়ে গতরে হয়েছি। একটা সুন্দর ভুঁড়িও হয়েছে। বই থেকে মন্দ রোজগার করি না। অনেক ফ্যানও আছে। কিন্তু সবচেয়ে বড় সমালোচক একজনই। পাখি! যা-ই লিখি ওর মতে সবই 'ঝুলস্য ঝুল'! যদি এই গল্পটাও কোনওদিন লিখি, তখনও বলবে, "কী সব যা তা লিখেছিস দীপ! এসব কেউ বিশ্বাস করবে? এগুলো গল্প?"

আমি প্রায়ই এ জানলায় এসে দাঁড়াই। কারণ একটা দুর্লভ দৃশ্য প্রায়ই এই জানলা দিয়ে দেখা যায়। দুনিয়ার আর কোনও জানলায় এই দৃশ্য যায় না! আলো, পাখি ও স্নিগ্ধাকে হুঃ হাঃ ফুঃ ফাঃ করে কুংফুর ট্রেনিং দিচ্ছে নন্দিনী। শেখাচ্ছে কীভাবে পাঞ্চ মারতে হয়। তিন নারীকে লড়তে শেখাচ্ছে সে। আর তার তিন ছাত্রী খুব মনোযোগ সহকারে তালিম নিচ্ছে।

আজ তিন নারীকে শেখাচ্ছে, কাল হয়তো তিন কোটি নারীকে লড়তে শেখাবে!

আফটার অল— নন্দিনীরা তো লড়তেই শেখায়, তাই না?

অঙ্কন: কুণাল বর্মণ